সূচীপত্র

মাসিক আত-তাহরীক

‘তুমি তাদের মধ্যে আল্লাহ্র নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী ফায়ছালা করবে এবং তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করবে না। আর তাদের ব্যাপারে সতর্ক থেকো, যেন তারা তোমাকে আল্লাহ প্রেরিত কোন বিধানের ব্যাপারে বিভ্রান্তিতে না ফেলে’ *(সূরা মায়েদাহ ৫/৪৯)*।

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
www.at-tahreek.com
২৮তম বর্ষ ১০ম সংখ্যা
জুলাই ২০২৫

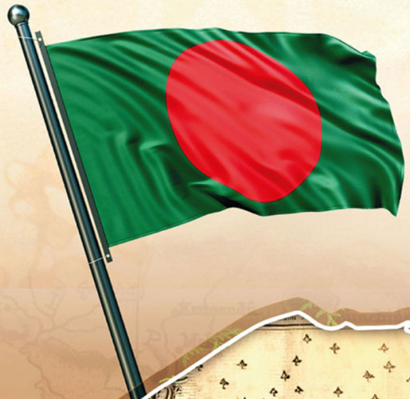

ইসলাম-ই বাংলাদেশের স্বাধীনতার মূল চেতনা

প্রকাশক : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, নওদাপাড়া, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০

"التحريك" مجلة شهريـــة علميـــة دينيـــة وأدبيـــة
المجلد : ٢٨ العدد : ١٠ محرم و صفر ١٤٤٧هـ/ يوليو ٢٠٢٥م
رئيس مجلس الإدارة : الأستاذ الدكتور/ محمد أسد الله الغالب
تصدرها : حديث فاؤنديشن بنغلاديش (مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة والنشر)

সদ্য প্রকাশিত ২টি বই

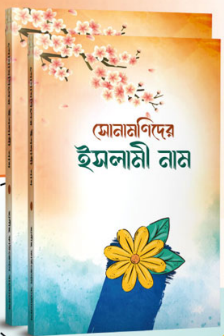

সোনামণিদের ইসলামী নাম
(প্রায় ১৮০০ ইসলামী নামের সমাহার)
গবেষণা বিভাগ
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

কাবার পথের যাত্রী
(এক আধ্যাত্মিক সফরনামা)
ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

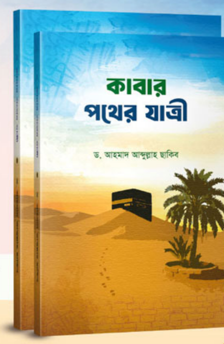

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী, মোবাইল : ০১৭৭০-৮০০৯০০

সংগঠন সিরিজ

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

অর্ডার করুন
০১৭৭০-৮০০৯০০
www.hadeethfoundationbd.com

যেসব বই সংকলিত হয়েছে

- পরিচিতি (আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ)
- আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন?
- আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ কি চায় কেন চায় ও কিভাবে চায়?
- সমাজ বিপ্লবের ধারা
- সমাজ পরিবর্তনের স্থায়ী কর্মসূচী
- দাওয়াত ও জিহাদ
- নৈতিক ভিত্তি ও প্রস্তাবনা
- উদাত্ত আহ্বান

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী, মোবাইল : ০১৭৭০-৮০০৯০০

ডা. তামান্না তাসনীম

এমবিবিএস; এম.এস (কলোরেক্টাল সার্জারী)
বৃহদান্ত্র ও পায়ুপথ রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন

বিশেষ সেবাসমূহ :

১. জটিল ফিস্টুলার আধুনিক চিকিৎসা
২. রাবার ব্যান্ড লাইগেশন ও লংগো পদ্ধতিতে ব্যথামুক্তভাবে পাইলসের চিকিৎসা
৩. স্টাপলিং পদ্ধতিতে কোলন (বৃহদান্ত্র) ও মলদ্বার ক্যান্সারের অপারেশন
৪. রেক্টাল প্রলাপস (মলদ্বার বের হয়ে আসা)-এর আধুনিক অপারেশন
৫. কলোনোস্কপির মাধ্যমে বৃহদান্ত্রের রোগ নির্ণয় ও পলিপের চিকিৎসা

ব্রেস্ট টিউমার এবং ক্যান্সারসহ মহিলাদের সব ধরনের সার্জিক্যাল সমস্যার অপারেশন মহিলা টীমের মাধ্যমে করা হয়।

চেম্বার : ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল	চেম্বার : রাজশাহী রয়্যাল হসপিটাল (প্রাঃ) লিঃ
লক্ষ্মীপুর, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৩০৪-৭১৬৫৩৬। দুপুর ২.০০-টা থেকে বিকাল ৫.০০-টা পর্যন্ত। (শনিবার, সোমবার ও বুধবার)	শেরশাহ রোড, লক্ষ্মীপুর, রাজশাহী। ফোন : ০৭২১-৭৭১২৭৭, ০১৮৬৭-৫৫২৪৮৬। বিকাল ৪.০০-টা থেকে রাত্রি ৮.০০-টা পর্যন্ত। (শনিবার থেকে বৃহস্পতিবার)

بسم الله الرحمن الرحيم

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

মাসিক
আত-তাহরীক

"التحريك" مجلة شهرية علمية دينية و أدبية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

২৮তম বর্ষ ১০ম সংখ্যা

মুহাররম-সফর ১৪৪৭ হি.
আষাঢ়-শ্রাবণ ১৪৩২ বাং
জুলাই ২০২৫ খৃ.

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সহকারী সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক, নওদাপাড়া (আমচত্বর) পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
ই-মেইল : tahreek@ymail.com

- সহকারী সম্পাদক : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪
- সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০
- হা.ফা.বা বই বিক্রয় বিভাগ : ০১৭৭০-৮০০৯০০
- হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড : ০১৭৩০-৭৫২০৫০
- হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস : ০১৮৩৫-৪২৩৪১১
- তাওহীদের ডাক : ০১৭৬৬-২০১৩৫৩
- ফৎওয়া হটলাইন : ০১৯৭৯-৩৪০৩৯০
  (বিকাল ৪.৩০ থেকে ৬.৩০ পর্যন্ত)

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ
রাজশাহী অফিস : ০১৭৯৭-৯০০১২৩
ঢাকা অফিস : ০১৭৯৫-৯৪৬৮১৩
ওয়েবসাইট : www.ahlehadeethbd.org

হাদিয়া : ৩০ টাকা মাত্র

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা

	সাধারণ ডাক	রেজিঃ ডাক
বাংলাদেশ		৪৫০/-
সার্কভুক্ত দেশসমূহ	১০৫০/-	২২৫০/-
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	১৩০০/-	২৫০০/-
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ	১৯০০/-	৩১০০/-
আমেরিকা মহাদেশ	২৩০০/-	৩৫০০/-

সূচীপত্র

- **সম্পাদকীয় :**
  - ইসলাম-ই বাংলাদেশের স্বাধীনতার মূল চেতনা ০২
- **প্রবন্ধ :**
  - ধর্মীয় জ্ঞান কতটুকু জানা ফরয? ০৩
    -মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক
  - কুরআনের বিরুদ্ধে প্রাচ্যবিদদের সংশয়সমূহ ও তার জবাব ০৮
    -ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব
  - ইসলামের দৃষ্টিতে সহশিক্ষার ভয়াবহতা ১১
    -ড. ইহসান ইলাহী যহীর
  - তাক্বওয়ার ফযীলত ও গুরুত্ব ১৪
    - মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ
  - সন্তানদের প্রতি সালাফদের উপদেশ ২১
    -আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ
- **শিক্ষাঙ্গন :**
  - আধুনিক যুগে শিক্ষকতা ২৮
    -সারওয়ার মিছবাহ
- **সন্তান পরিচর্যা :**
  - শিশুর আবেগকে অবহেলা নয় ৩৩
    -জাহিদ হাসান
- **ইতিহাস-ঐতিহ্য :**
  - দফ ইসলামী ঐতিহ্যের অংশ ৩৫
    -মুহাম্মাদ আব্দুর রঊফ
- **ছাহাবী চরিত :**
  - হুসায়েন বিন আলী (রাঃ) *(নভেম্বর'২০২৪ সংখ্যার পর)* ৩৭
    -ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম
- **গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান :**
  - উত্তম প্রতিশোধ ৪১
    - মুহসিন জব্বার
- **স্বাস্থ্যকথা :**
  - লাল চালের পুষ্টিগুণ ৪২
- **কবিতা :** ৪৩
  - শিরক ও বিদ'আতের ছায়া
  - ইলমে দ্বীনের আলো
  - দ্বীনী দাওয়াত
  - সূরা আছর
- **স্বদেশ-বিদেশ** ৪৪
- **মুসলিম জাহান** ৪৫
- **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৪৫
- **সংগঠন সংবাদ** ৪৬
- **প্রশ্নোত্তর** ৪৯

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত এবং হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

জুলাই ২০২৫

সম্পাদকীয়

২৮তম বর্ষ ১০ম সংখ্যা

ইসলাম-ই বাংলাদেশের স্বাধীনতার মূল চেতনা

বর্তমান সময়ে '৫২-এর চেতনা, '৭১-এর চেতনা, জুলাই '২৪-এর চেতনা ইত্যাদির ভিড়ে বাংলাদেশের নতুন প্রজন্ম প্রায় ভুলতেই বসেছে বাংলাদেশের স্বাধীনতার মূল চেতনা কী ছিল। আমাদেরকে সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, ১৯৪৭ সালে ভারতীয় উপমহাদেশ বিভক্ত হয়েছিল দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে (TWO NATION'S THEORY)। এই তত্ত্ব মোতাবেক ইসলাম-ই ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতার মূল চেতনা। পরবর্তীকালে সেই চেতনায় দুর্বলতা সৃষ্টি হওয়ায় অখণ্ড পাকিস্তান ভেঙে দু'ভাগ হয়ে যায় এবং স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। স্বাধীনতার এই মূল চেতনাই হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ পশ্চিমবঙ্গ থেকে বাংলাদেশকে পৃথক করেছে। যদি এই চেতনা ভঙ্গুর হয়ে যায়, তাহ'লে বাংলাদেশের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের নৈতিক ভিত্তি হারিয়ে যাবে। প্রতিবেশী ভারতের আধিপত্যবাদের পোড়ামাটি নীতি প্রতি পদে পদে আমাদেরকে শংকিত করে। ২০১৫ সালের ৩১শে আগস্ট বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ছিটমহল বিনিময় চুক্তি বাস্তবায়িত হয়। এতে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে থাকা ভারতের ১১১টি ছিটমহল (১৭,১৬০ একর) এবং ভারতের অভ্যন্তরে থাকা বাংলাদেশের ৫১টি ছিটমহল (৭,১১০ একর) বিনিময় হয়। তবে সীমান্ত এলাকার লোকজনের অভিযোগ, ভারত ঐ বিনিময়ে জমির দিক থেকে লাভবান না হওয়ায়, পরবর্তীতে বিভিন্ন অমীমাংসিত জমি দখল করে নেয়। যেলা প্রশাসন ও স্থানীয় সূত্রের তথ্যমতে, তেঁতুলিয়া উপযেলার বাংলাবান্ধা ইউনিয়ন, পঞ্চগড় সদর উপযেলার হাড়িভাষা ইউনিয়ন ও বোদা উপযেলার বড়শী ইউনিয়নে বড় অংশের জমি সহ ৬-৭শ' একর জমি ভারতের দখলে রয়েছে। সীমান্তবাসীর অভিযোগ, বিগত প্রায় দেড় যুগ ধরে সরকার ভারতের অনুকূলে নীরব ভূমিকা পালন করেছে। জমি হারালেও কার্যকর কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি। এভাবে বিগত ৫৩ বছর যাবৎ ভারতীয় চেতনার কাছে বাংলাদেশী চেতনা মার খাচ্ছে। স্বাধীন ও সাহসী নেতৃত্ব না থাকায় বাংলাদেশ তার প্রাপ্য হক থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। শংকাগ্রস্ত হচ্ছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার চেতনাকে মযবূতভাবে ধারণ করতে চাইলে আমাদেরকে কয়েকটি বিষয়ে নযর দিতে হবে। যেমন- (১) দেশের স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ন রাখার জন্য শুধু দেশপ্রেমিক নেতৃত্ব নয়, প্রয়োজন দক্ষ ও দূরদর্শী নেতৃত্ব। অন্যথায় নেতৃত্বের দুর্বলতা ও চেতনাহীনতা অনেক সময় জাতীয় দুর্যোগ ডেকে আনে। যেমন নবাব আলীবর্দী খাঁ তাঁর আপন ভগ্নিপতি মীরজাফরকে প্রধান সেনাপতি করেছিলেন এবং ভেবেছিলেন, তিনি তরুণ নবাব সিরাজুদ্দৌলার মুরব্বী হবেন ও তাকে সার্বিক সুরক্ষা দিবেন। যেভাবে জাহাঙ্গীরের প্রধান সেনাপতি বৈরম খাঁ তরুণ সম্রাট আকবরকে সুরক্ষা দিয়েছিলেন। কিন্তু হয়েছিল তার বিপরীত। একইভাবে প্রশাসনের প্রধান ৭টি পদের ৬টি পদেই তিনি হিন্দুদের বসিয়েছিলেন। ভেবেছিলেন, এর ফলে তারা কৃতজ্ঞ থাকবে। কিন্তু হয়েছিল তার বিপরীত। মূল পদগুলি নিজেদের হাতে না রেখে তথাকথিত উদারতা দেখিয়ে সিরাজুদ্দৌলা আদর্শ ও চেতনাগতভাবে ভুল করেছিলেন। এক্ষেত্রে তিনি আল্লাহ্র নির্দেশ উপেক্ষা করেছিলেন। কেননা আল্লাহ বলেছেন, 'হে মুমিনগণ! তোমাদের পূর্বে যারা কিতাব প্রাপ্ত হয়েছে, তাদের মধ্য থেকে যারা তোমাদের দ্বীনকে খেল-তামাশার বস্তু মনে করে, তাদের ও কাফেরদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক' *(মায়েদাহ ৫/৫৭)*। যার ফল ভোগ করেছেন সিরাজুদ্দৌলা এবং সাথে সাথে বাংলার মানুষ। অতএব সর্বদা বিচক্ষণ ও দূরদর্শী হ'তে হবে এবং কোন অবস্থাতেই আত্মবিস্মৃত হওয়া যাবে না।

(২) ইসলামের মূলনীতির উপর সর্বদা দৃঢ় থাকতে হবে এবং অমুসলিম নেতাদের প্রতারণার ফাঁদে পা দেওয়া যাবে না।

(৩) ব্যক্তিস্বার্থ রাজনীতিকে প্রভাবিত করে। অতএব মাল ও মর্যাদালোভী ব্যক্তিদের থেকে সাবধান থাকতে হবে। পলাশীর প্রান্তরে রবার্ট ক্লাইভের ৩৫০০ সৈন্যের কাছে নবাব সিরাজুদ্দৌলার ৫০,০০০ সৈন্যকে পরাজয় বরণ করতে হয়েছিল। যার মূল কারণ ছিল অনৈক্য এবং ক্ষমতালোভী স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর ষড়যন্ত্র। সেকারণ পলাশীর সবচেয়ে বড় শিক্ষা এই যে, ধর্মীয় ও জাতীয় স্বার্থে যেকোন মূল্যে সর্বদা সকলকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে।

সিরাজুদ্দৌলার বাংলাদেশ ও আজকের বাংলাদেশ এর মধ্যে মাটির পার্থক্য নেই। পার্থক্য রয়েছে নেতৃত্বের। সেদিন সিরাজুদ্দৌলার মধ্যে যে স্বাধীন দেশাত্মবোধ ও ধর্মীয় চেতনা ছিল, বর্তমানে বাংলাদেশী নেতাদের মধ্যে সেই চেতনা অক্ষুণ্ন থাকতে হবে। ঘাপটি মেরে থাকা মীরজাফর, জগৎশেঠ ও উমিচাঁদরা যেন স্বাধীন ও সাহসী নেতৃত্বকে পেছন থেকে টান দিয়ে থামিয়ে না দেয়।

৭১-এর স্বাধীনতার পর থেকে এদেশে সেক্যুলার নেতৃত্ব চলছে। ইসলামের নামে স্বাধীন হওয়া এ দেশের ইসলামী চেতনাকে বারবার পদদলিত করা হচ্ছে। অপরদিকে সেক্যুলার প্রভাবিত ইসলামী দলগুলিও দ্ব্যর্থহীনভাবে ইসলামী খেলাফত কায়েমে সচেষ্ট নয়। তারা বরং গণতন্ত্র কায়েমে গলদঘর্ম। যেখানে কুরআন ও সুন্নাহ্র বিধান চূড়ান্ত নয়, বরং অধিকাংশ এমপির রায়ই চূড়ান্ত। যেখানে আল্লাহ সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস নন। বরং জনগণই সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস। যেখানে ইসলামী দলগুলি ক্ষমতায় গেলে তাদের ইতিপূর্বেকার ঘোষিত নীতি হবে 'দেশে যে মাযহাবের লোক সংখ্যা অধিক, সেই মাযহাব অনুযায়ী আইন হওয়াটাই স্বাভাবিক'। অথচ হওয়া উচিৎ ছিল, পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী আইন হওয়াটাই স্বাভাবিক। এভাবে অধিকাংশের রায়ের মাধ্যমে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বিধানকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেওয়ার নীতি কোন মতেই সমর্থন যোগ্য নয়। আমরা কখনই নীরব হবো না, নিস্তব্ধ হবো না, যতদিন না পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে দেশের আইন ও সংবিধান রূপে দেখতে পাব। কারণ ইসলামই এদেশের স্বাধীনতার মূল চেতনা। এই চেতনা ধ্বংস হ'লে দেশের স্বাধীনতা ধ্বংস হবে। '৫২-এর চেতনা, '৬৯-এর চেতনা ছিল কতগুলি ঘটনা ভিত্তিক ও সাময়িক। কিন্তু ইসলামী চেতনা স্থায়ী ও সামগ্রিক। এই চেতনাই দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে অক্ষুণ্ন রাখতে পারে। নইলে চেপে বসা ভারতীয় ও পাশ্চাত্যের গোলামীর চেতনা থেকে দেশ মুক্ত হ'তে পারবে না। ১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন পলাশীর আম্রকাননে কেবল যুদ্ধে পরাজয় ঘটেনি, বরং চেতনার পরাজয় ঘটেছিল। আজও সেই পরাজিত চেতনা আমাদেরকে তাড়িত করে। আল্লাহ তুমি এদেশবাসীকে স্বাধীন ইসলামী চেতনায় উজ্জীবিত হওয়ার তাওফীক দান কর- আমীন! *(স.স.)*।

ধর্মীয় জ্ঞান কতটুকু জানা ফরয?

-মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক

এ বিশ্বের উন্নতি ও সমৃদ্ধি ইলমের বিস্তারে এবং ধ্বংস অজ্ঞতার প্রসারে। যখন কোন শহর কিংবা অঞ্চলে দ্বীনি ইলমের ব্যাপক বিস্তার ঘটে তখন তার অধিবাসীদের মাঝে অন্যায়-পাপাচার হ্রাস পায়। পক্ষান্তরে সেখানে দ্বীনি ইলম প্রচ্ছন্ন বা গৌণ হয়ে পড়লে তথাকার জনগণের মধ্যে অন্যায় অরাজকতা বাড়তে থাকে। তাদের গতি হয়ে পড়ে স্থবির। দ্বীনি কাজের নামে তারা জড়িয়ে পড়ে নানা বিদ'আত ও বিজাতীয় অপসংস্কৃতিতে। যে একথা অনুধাবনে ব্যর্থ সে ঐসব লোকের অন্তর্ভুক্ত যাদের জন্য আল্লাহ তা'আলা কোন আলো রাখেননি।

ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেছেন, ইলম যদি না থাকত তাহ'লে মানুষ পশুর মত হয়ে যেত। তিনি আরও বলেছেন, الناس مُحْتَاجُون إلى العِلْم أكثر مِن حاجتهم إلى الطعام والشراب؛ لأن الطعام والشراب يُحْتَاج إليه في اليوم مرة أو مرتين، والعِلْم يُحْتَاج إليه بعَدَد الأنفاس 'মানুষের পানাহারের চেয়ে জ্ঞানের প্রয়োজন অধিক। কারণ খাদ্য ও পানীয় দিনে একবার বা দু'বার প্রয়োজন। আর জ্ঞানের প্রয়োজন শ্বাস-প্রশ্বাসের সংখ্যা পরিমাণ'।[১]

ঈমান-আক্বীদা, ইবাদত-বন্দেগী, হালাল-হারাম, পাপ-পুণ্য, আল্লাহ্র হক, বান্দার হক, অন্যান্য মাখলূকের হক ও চারিত্রিক ভালো-মন্দের বিদ্যার্জন প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উপর ফরয। তাছাড়া দায়িত্ব ও পেশার আলোকে প্রত্যেক ব্যক্তির সঙ্গে যে দ্বীনি বিধি-বিধান বিশেষভাবে জড়িত সে জাতীয় বিদ্যা শিক্ষা তার উপর ফরয। তার প্রয়োজন নেই এমন বিদ্যা শিক্ষা করা তার উপর ফরয নয়। তবে দেশ-সমাজ-রাষ্ট্রের জন্য আবশ্যকীয় বিদ্যা শিক্ষা করা ফরযে কিফায়া বা সামষ্টিক ফরয। ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) ছিলেন সর্বাধিক সৎপথ প্রাপ্ত বিদ্বান। তাদের বিদ্যার ধুলোবালিও আমাদের আছে কি-না সন্দেহ। তথাপি তারা বিদ্যার্জনের সাথে জীবিকা সংগ্রহের কাজও করতেন। তারা চাষাবাদ, পশুপালন, ব্যবসায়-বাণিজ্য, ব্যবসা উপলক্ষে দেশ-বিদেশ সফর এবং হাটে-বাজারে বেচা-কেনা করতেন। এর মধ্যেই তারা দ্বীনি ইলম শিখতেন এবং যেখানেই থাকুন এই বিদ্যাযোগে মানুষের মাঝে জোরেশোরে ইসলাম প্রচার করতেন। মানুষের জীবনে দ্বীন এক নম্বর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কাজেই এক্ষেত্রে দ্বীনি ইলম না শিখে অন্য সকল বিদ্যা শিখব আর দ্বীনের ক্ষেত্রে এ অজুহাত সে অজুহাত পেশ করব, তা তো কোন বিজ্ঞ মানুষের কথা হ'তে পারে না। আমল শুরুর আগে দরকার তৎসম্পর্কিত ইলম। ধর্মীয়, দৈহিক, মানসিক, আর্থিক, বৈষয়িক ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে উন্নতি করতে চাইলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ইলম অর্জন একান্তই প্রয়োজন।

ইসলাম একটি জীবন ব্যবস্থার নাম। মুসলিম হিসাবে বেঁচে থাকতে এবং জীবন-যাপন করতে চাইলে ইসলাম সংক্রান্ত বিদ্যার্জন ফরয। আরবী 'ফরয' শব্দের অর্থ 'আবশ্যিক'। ফরয আবার দু'ভাগে বিভক্ত। ফরযে কিফায়া ও ফরযে আইন। ফরযে কিফায়া সমষ্টিগত ফরযকে বলে এবং ফরযে আইন ব্যক্তিগত ফরযকে বলে। ইসলামী বিধি-বিধান অনুযায়ী জীবন-জীবিকার বিষয়সমূহ, মুসলিম মিল্লাত, সমাজ, রাষ্ট্র এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিচালনার জন্য যে ইলম না জানলে এগুলো অকার্যকর হয়ে পড়বে তা জানা ফরযে কিফায়াহ। অনেকটা বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের এ ইলম। সমাজের আবশ্যকীয় পরিমাণ মানুষকে এ বিদ্যা শিখতেই হবে, প্রত্যেককে শিখতে হবে না। নানা শ্রেণীর মানুষ বিভিন্ন বৃত্তি-পেশার মাধ্যমে এ ফরয আঞ্জাম দিয়ে চলেছে। পক্ষান্তরে যে ইলম ইসলামী বিধি-বিধান অনুযায়ী প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর ব্যক্তিগত জীবন নির্বাহের জন্য আবশ্যক তা অর্জন ফরযে আইন। এ বিদ্যা মুসলিম নর-নারী মাত্রেই শিখতে হবে। এক্ষণে প্রশ্ন হচ্ছে- একজন মুসলিমের ইসলাম মেনে জীবন যাপনের জন্য কতটুকু বিদ্যার্জন ফরযে আইন? এ প্রসঙ্গে আল্লামা ইবনু আব্দিল বার্র তার 'জামিউ বায়ানিল ইলমী ওয়া ফাযলিহি' গ্রন্থে বলেছেন, قَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ مِنَ الْعِلْمِ مَا هُوَ فَرْضٌ مُتَعَيَّنٌ عَلَى كُلِّ امْرِئٍ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ وَمِنْهُ مَا هُوَ فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ إِذَا قَامَ بِهِ قَائِمٌ سَقَطَ فَرْضُهُ عَنْ أَهْلِ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ 'বিদ্বানগণ এ কথায় একমত যে, এক ধরনের ইলম রয়েছে যা ফরযে আইন, প্রত্যেক মুসলিমকে তা শিখতে হবে। আরেক ধরনের ইলম রয়েছে যা শেখা ফরযে কিফায়াহ বা সমষ্টিগত ফরয। কোন স্থানের কেউ একজন তা শিখলে ঐ স্থানের সকল বাসিন্দার উপর থেকে ঐ ফরয রহিত হয়ে যাবে।[২]

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, ফরযে আইন ইলম হ'ল- ১. ঈমানের উছূল তথা মূলনীতিগুলো জানা, ২. ইসলামী শরী'আতের ইলম। যেমন- ওযূ, ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ ইত্যাদি, ৩. ইসলামের হারাম বা নিষিদ্ধ বিষয়গুলোর জ্ঞান, ৪. মু'আমালাত ও মু'আশারাতের ইলম।[৩]

তিনি শাফেঈ মাযহাবের আল্লামা আব্দুল বাসেত্ব ইবনু মূসা আলমাভী দিমাশকীর 'আল-ইকদুত তালীদ' গ্রন্থের উদ্ধৃতি তুলে ধরে বলেছেন, 'কালিমায়ে শাহাদাহ উচ্চারণ ও তার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করার পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যা কিছু নিয়ে এসেছেন তার সত্যতা জ্ঞাপন করা এবং তার প্রতি সন্দেহমুক্ত ও দ্ব্যর্থহীনভাবে বিশ্বাস বজায় রাখাই ঈমান সংক্রান্ত আক্বীদার ক্ষেত্রে যথেষ্ট। ঈমানের ছয়টি বিষয়ের দলীল-প্রমাণ দাখিল করা এখানে যরূরী নয়। কেননা মহানবী (ছাঃ) ইসলাম গ্রহণকালে আল্লাহ্র তাওহীদ ও তাঁর নবুঅতের প্রতি শাহাদাহ বা সাক্ষ্য উচ্চারণ ছাড়া আর কিছু তলব করতেন

---

১. *মাদারিজুস সালেকীন ২/৪৭০; ই'লামুল মু'আক্কেইন ২/২৫৬।*

২. *জামেউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাযলীহী ১/৫৬।*

৩. *ফাযলুল ইলম ওয়াল উলামা (বৈরূত: আল-মাকতাবুল ইসলামী: ১ম প্রকাশ ১৪২২/২০০১ খ্রিঃ) পৃ: ৩০-৩১।*

না। এ বিষয়ে আমাদের সালাফ, ফক্বীহবৃন্দ ও অনুসন্ধানকারী আলেমগণ একমত বলে তিনি যোগ করেছেন'।[৪]

তারপর তিনি বলেছেন, একজন মুসলিমের উপর যে পরিমাণ বিদ্যার্জন ফরযে আইন তাহ'ল : তাওহীদ বা আল্লাহ তা'আলার একত্ব সংক্রান্ত ইলম। যেমন মুখে সাক্ষ্যদান ও অন্তর থেকে স্বীকৃতিদান যে, আল্লাহ এক, তাঁর কোন শরীক নেই, তাঁর সদৃশ কেউ নেই, সমতুল্য কেউ নেই। তিনি কাউকে জন্ম দেননি, কারও থেকে জন্ম নেননি এবং কেউ তাঁর সমকক্ষ নেই। তিনি সব কিছুর স্রষ্টা, তাঁর কাছেই সবাইকে ফিরে যেতে হবে। তিনি জীবিতকারী এবং মৃত্যুদানকারী, তিনি চিরজীবী, তাঁর মৃত্যু নেই। দৃশ্যমান-অদৃশ্যমান সব কিছুই তাঁর জানা, উভয়ই তাঁর কাছে সমান। আসমান-যমীনের কিছুমাত্র তার কাছে লুকায়িত নেই। তিনিই প্রথম, তিনিই শেষ, তিনিই প্রকাশ্য, তিনিই গুপ্ত। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আক্বীদা হ'ল, তিনি তাঁর গুণাবলী ও নামসমূহের সাথে অনুক্ষণ বিদ্যমান। তাঁর প্রথমত্বের যেমন সূচনা নেই তেমনি তাঁর শেষত্বের কোন অন্ত নেই।

একই সঙ্গে তাকে সাক্ষ্য দিতে হবে যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাঁর বান্দা, রাসূল এবং শেষ নবী। আরও সাক্ষ্য দিতে হবে যে, আমলের প্রতিফল দানের জন্য মৃত্যুর পর পুনরুত্থান ঘটবে এবং সেখানে সৎকর্মশীল সৌভাগ্যবান মুমিনগণ চিরস্থায়ী জান্নাতী হবে এবং কাফির দুর্ভাগা যারা আল্লাহ্র বিধান থোড়াই পরোয়াকারী তারা জাহান্নামী হবে। এ সবই হক ও সত্য।

তাকে এ সাক্ষ্য দিতে হবে যে, কুরআন আল্লাহ্র বাণী। তার মধ্যে বর্ণিত সকল কথা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আগত সত্য। তার সব কিছুর উপর ঈমান রাখা অপরিহার্য এবং তার সুস্পষ্ট বিধি-বিধান অনুযায়ী আমল করতে হবে।

তাকে এ বিশ্বাস করতে হবে যে, পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় ফরয। যেসব কিছু না হ'লে ছালাত পরিপূর্ণ হবে না সেসব বিষয় জানা ফরয। যেমন তাহারাত ও ছালাতের সকল হুকুম-আহকাম।

তাকে এ সাক্ষ্য দিতে হবে যে, রামাযানের ছিয়াম ফরয। যা না হ'লে ছিয়াম পূর্ণতা পাবে না এবং যা যা করলে ছিয়াম নষ্ট হয়ে যাবে তার সবই জানা ফরয।

অর্থশালী হ'লে তার উপর যাকাতের নিয়ম-কানূন শেখা ফরয। কখন তা ফরয হবে, কোন কোন সম্পদে ফরয হবে, কতটুকু বা কি পরিমাণ ফরয হবে, কাদের মধ্যে কিভাবে বণ্টন করতে হবে, কিভাবে নিয়ত করতে হবে ইত্যাদির ইলম তাকে অবশ্যই জানতে হবে। হজ্জ ফরয হ'লে তাকে হজ্জের নিয়ম-কানূন সংক্রান্ত ইলম শিখতে হবে।

তাকে হারাম ও মাকরূহ বিষয়াবলী সম্পর্কিত বিদ্যা জানতে হবে, যাতে সেসব থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে। যেমন যিনা-ব্যভিচার, মদ পান, শূকরের গোশত খাওয়া, মৃত প্রাণীর গোশত খাওয়া, সকল প্রকার নাজাসাত, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, সূদ ও ঘুষ খাওয়া, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া, লোকের সম্পদ অন্যায়ভাবে তার অসন্তুষ্টিক্রমে খাওয়া, যেকোন প্রকার যুলুম-নির্যাতন করা (আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা কিছু করতে নিষেধ করেছেন তা করলে যুলুম করা হবে)। মা, বোন, মেয়ে ও তাদের সাথে উল্লিখিত মহিলাদের বিবাহ করা, অন্যায়ভাবে কোন মুমিনকে হত্যা করা, এমনিতর যা কিছু কুরআন, সুন্নাহ ও উম্মাতের ইজমা মূলে হারাম কিংবা মাকরূহ সেগুলোর বিদ্যার্জন করতে হবে। এমনিভাবে ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সকল বিষয় তাকে জানতে হবে। আল্লামা ইবনু আব্দিল বার্র-এর কথা এখানেই শেষ।

ইমাম নববী (রহঃ) তার 'রওযাতুত ত্বালেবীন' গ্রন্থে বলেছেন, কিছু বিদ্যার্জন ফরযে আইন এবং কিছু বিদ্যার্জন ফরযে কিফায়াহ। দ্বীনের যে সকল বিষয় ব্যক্তির উপর ফরয সেগুলো কার্যকর করার জন্য যেসব বিদ্যা জানা প্রয়োজন সেগুলো অর্জন করাও ফরযে আইন।[৫] যেমন ওযূ, ছালাত, ছিয়াম ইত্যাদি। কেননা যিনি ছালাতের শর্তাদি ও রুকনসমূহ জানবেন না তার পক্ষে ছালাত আদায় সম্ভব হবে না। এখানে কেবলমাত্র বাহ্যিক বা দৃশ্যমান হুকুম-আহকাম জানার কথা বলা হচ্ছে। সেসব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বা খুঁটিনাটি মাসআলা-মাসায়েল নয়, যা সাধারণ মানুষের জানার দরকার পড়ে না।

যদি তার যাকাত দেওয়ার মতো সম্পদ থাকে তবে তাকে যাকাতের বাহ্যিক বিধি-বিধান জানতে হবে।

আর যিনি বেচাকেনা তথা ব্যবসায়ে জড়িত তাকে ব্যবসায়ের বিধি-বিধান জানতে হবে। এমনিভাবে যিনি যে পেশায় যুক্ত তাকে সেই পেশার মাসআলা-মাসায়েল জানতে হবে। এখানেও বাহ্যিক মাসআলা-মাসায়েল বা বিধি-বিধান জানা উদ্দেশ্য। ইমাম নববীর কথা এখানেই শেষ।[৬]

সম্মানিত লেখকগণ ঈমান-আক্বীদা, ইবাদত-বন্দেগী ও পেশাগত আমলের কথা বলেছেন। আমরা তৎসঙ্গে হাক্কুল ইবাদ তথা মানুষের অধিকার, আদব-আখলাক বা আচার-ব্যবহারগত বিদ্যা এবং হালাল-হারাম শেখা যে যরূরী সে কথাও বলতে চাই। কেননা এগুলোর সাথেও ফরযে আইন জড়িয়ে আছে।

আমাদের সমাজে ফরযে আইন পরিমাণ বিদ্যা জানার হাল-হাক্বীক্বত কেমন কী রয়েছে তা একটু সংক্ষেপে তুলে ধরা যাক।-

এ সমাজে আমাদের জন্ম, এ সমাজেই আমরা বেড়ে উঠি। সমাজের সুযোগ-সুবিধা যেমন আমরা পেয়েছি এবং পাচ্ছি, তেমনি সমাজের যা দেওয়ার ছিল কিন্তু দেয়নি তাও আমরা জানি। এমনই একটি বিষয় যা আমাদের পরিবার ও সমাজ মোটেও গ্রাহ্য করে না বা আবশ্যিক বলে মনে করে না তা হচ্ছে হাতে-কলমে ইসলাম সংক্রান্ত বিদ্যা শিক্ষাদান ও গ্রহণ।

---

৪. আব্দুল বাসেত্ব ইবনু মূসা আলমাভী দিমাশকী, আল-ইকদুত তালীদ (মাকতাবাতুছ ছিক্বাফাহ আদ-দ্বীনিয়াহ, ১ম প্রকাশ, ১৪২৪হিঃ/২০০৪খ্রিঃ), পৃঃ ৭১।

৫. আবু যাকারিয়া মহীউদ্দীন আন-নববী, রাওযাতু ত্বলেবীন ওয়া উমদাতুল মুফতীন, (বৈরূত : আল-মাকতাবুল ইসলামী, ৩য় প্রকাশ, ১৪১২হিঃ/১৯৯১ খ্রিঃ), ১০/২২৩।

৬. islamweb.net, ফৎওয়া নং ২.৪৪৯৯।

পরিবার খুব বেশী হ'লে দেখে দেখে শাব্দিক উচ্চারণে কুরআন পড়া শেখায়, আর কোন কোন সমাজ মসজিদে অনুরূপভাবে কুরআন শেখার ব্যবস্থা রাখে। বিষয়টা ঐচ্ছিক। সমাজস্থ সকল পরিবারের সদস্যগণ কুরআন পড়ছে কি-না তার খবর সমাজের নেতৃস্থানীয়রা নেন না। আরবী শব্দ উচ্চারণের বাইরে কুরআনের অর্থ যে মাতৃভাষায় শেখা যরূরী সে কথাও তারা মন থেকে একটু ভাবেন না। যে ইমাম বা মাওলানা ছাহেব মক্তবে পড়ান তিনিও কুরআনের অর্থ বুঝার প্রতি খুব একটা তাকীদ দেন না। ধনী হোক কিংবা দরিদ্র হোক স্কুল-কলেজ কিংবা মাদ্রাসায় সন্তানদের পড়ানোর প্রতি পরিবারগুলোর খেয়াল ও ঝোঁকের কোন অন্ত নেই। কিন্তু যে ফরযে আইন পরিমাণ ইসলামী শিক্ষা না হ'লে পরিবারের সদস্যদের ইসলাম অনুযায়ী জীবন যাপন সম্ভব হবে না এবং পরকালে যে তারা মহা ক্ষতি হ'তে বাঁচতে পারবে না সে বিষয়ে তাদের উদাসীনতা একেবারেই অচিন্তনীয় অভাবনীয়। কিন্তু বাস্তবে তাই হচ্ছে। মহান আল্লাহ বলেন, قُلِ اللهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي، فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ، 'বল, আমি আল্লাহ্‌র ইবাদত করি তাঁর জন্য আমার আনুগত্যকে একনিষ্ঠ করে। অতএব তোমরা তাঁকে ছেড়ে যাকে খুশী ইবাদত কর। তুমি বলে দাও নিশ্চিতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত তারাই যারা নিজেদের ও নিজেদের পরিবারবর্গের সর্বনাশ করে ক্বিয়ামতের দিন। মনে রেখ, সেটাই হ'ল সুস্পষ্ট সর্বনাশ' *(যুমার ৩৯/১৪-১৫)*।

আমরা কি বুকে হাত দিয়ে বলতে পারি, আমরা ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিকভাবে আখেরাতে শুভ ফল লাভের উদ্দেশ্যে কাজ করছি? নাকি দুনিয়া লাভই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য? আমাদের এহেন আচরণের জন্যই মহান আল্লাহ বলেছেন, بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى، 'বস্তুতঃ তোমরা দুনিয়াবী জীবনকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাক। অথচ আখেরাত হ'ল উত্তম ও চিরস্থায়ী' *(আ'লা ৮৭/১৬-১৭)*। আমরা না পারিবারিকভাবে আমাদের উপর অর্পিত ফরযে আইন পরিমাণ দায়িত্ব কি কি তার শিক্ষা পাই, না সমাজের কোন ব্যবস্থা এ সম্পর্কে আছে। ব্যক্তিগতভাবে অনেকে ইসলামী ধারায় জীবন যাপন করেন। কিন্তু কুরআন-হাদীছ অধ্যয়ন, আলোচনা, তাহারাত, ছালাত ইত্যাদি আমল পালনে তাদের জ্ঞানের স্বল্পতা ধরা পড়ে। আল্লাহই অধিক জানেন।

প্রথমেই ঈমান-আক্বীদার কথা আলোচনা করা যায়। হাদীছে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'এমন কোন মানব শিশু নেই যে ফিৎরাতের ধর্ম বা ইসলামের উপর জন্মগ্রহণ করে না। তারপর তার মাতা-পিতা তাকে ইহুদী, খ্রিষ্টান অথবা অগ্নিপূজারী করে তোলে'।[৭] এ হাদীছে সন্তানদের উপর মাতা-পিতার যে বিশাল প্রভাব রয়েছে তার প্রমাণ মেলে। পিতা-মাতা সন্তানকে যে ধর্মে চায় সে ধর্মে গড়ে তুলতে পারে। সাধারণত সবাই বাপ-দাদার ধর্মেই সন্তানদের বড় করে। হাদীছটিতে মুসলমানদের কি কোন শিক্ষা আছে? হ্যাঁ অবশ্যই আছে। হাদীছ অনুসারে মাতা-পিতা তাদের সন্তানদের যেমন ইহুদী-খ্রিষ্টান বানাতে পারে তেমনি সক্রিয় অথবা নিষ্ক্রিয় মুসলিমও বানাতে পারে। যে মুসলিম মাতা-পিতা নিজেরা সক্রিয় বা প্রাক্টিসিং মুসলিম তারা সন্তানদের প্রাক্টিসিং মুসলিম হিসাবে গড়ে তোলার চেতনা লালন করতে পারে এবং সেজন্য অবিরত চেষ্টা করতে পারে। পক্ষান্তরে ইসলামী বিধি-বিধান পালনে যারা নিষ্ক্রিয় মুসলিম তারা তাদের সন্তানদের ইসলাম সম্পর্কে নিষ্ক্রিয় রাখতে একই ধরনের ভূমিকা রাখে। কারণ অধিকাংশ মুসলিম অবচেতন মনে নিজেদের বাপ-দাদা থেকে প্রাপ্ত ইসলাম মেনে চলে, তার সাথে কুরআন ও সুন্নাহর ইসলামের মিল থাকুক কিংবা না থাকুক। তাদের এ স্বভাব সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، 'যখন তাদের বলা হয়, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তোমরা তার অনুসরণ কর, তখন তারা বলে, বরং আমরা তারই অনুসরণ করব যার উপরে আমরা আমাদের বাপ-দাদাদের পেয়েছি। যদিও তাদের বাপদাদারা কিছুই জ্ঞান রাখতো না এবং তারা সুপথপ্রাপ্ত ছিল না' *(বাক্বারাহ ২/১৭০)*।

মুসলিম হিসাবে আমাদের ঈমান জন্মসূত্রে প্রাপ্ত। এটা যে চর্চার বিষয় এবং এর উপর স্বতন্ত্রভাবে অনেক বই-পুস্তক লেখালেখি প্রয়োজন তা যেন আমরা ভুলে গিয়েছি। আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদে ঈমানের পর নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর রিসালাতের উপর ঈমান আনা দ্বিতীয় যরূরী বিষয়। তাঁর উপর ঈমান আনার অর্থ অন্তর থেকে বিশ্বাসের সাথে তাঁর আদর্শ অনুসরণকে জীবনের ব্রত বানিয়ে নেওয়া। কিন্তু নবী করীম (ছাঃ) সম্পর্কে আমরা খুব কমই জানি এবং জানতেও আমাদের তেমন কোন আগ্রহ নেই। তাঁর সম্পর্কে না জানলে, তাঁর জীবনী পাঠ না করলে, তাঁর হাদীছ না পড়লে তাঁর আদর্শ অনুসরণ তো আমাদের পক্ষে খুব একটা সম্ভব হবে না। মুসলিম নর-নারী, ছোট-বড় যে কাউকে জিজ্ঞেস করলে বেরিয়ে আসবে আমাদের রাসূল (ছাঃ)-এর জীবনী পাঠের পরিমাণ কত কম! হাদীছের বই আমরা কি পরিমাণ পড়ি! যাঁকে চিনি না জানি না তাঁর প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা থাকার এবং তাঁকে অনুসরণের দাবী করা শুধু মুখের কথা ছাড়া আর কী হ'তে পারে?

ঈমানের তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হ'ল আখেরাত। আমাদের এ জীবনই শেষ নয়, বরং মৃত্যুর সাথে সাথেই আমাদের আখেরাতের জীবন শুরু হয়ে যায়। কুরআন ও সুন্নাহ বলে দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী এবং তা সুখ-দুঃখের মিশ্রণ। এ জীবনের আক্বীদা ও আমলের হিসাব আখেরাতে কড়ায়-গণ্ডায় দিতে হবে মহান আল্লাহ্‌র দরবারে। সেখানে কেউ কাউকে সাহায্য করবে না। সবাই আত্মরক্ষার্থে ব্যতিব্যস্ত থাকবে। সেদিন যাতে সবাই মুক্তি পায় সে জন্য মুক্তির পথ দেখাতে আল্লাহ তা'আলা পাঠিয়েছেন তাঁর রাসূল এবং নাযিল

৭. *বুখারী হা/১৩৫৮, ১৩৮৫।*

করেছেন কুরআন। রাসূলের জীবনাদর্শ আছে হাদীছে, আর কুরআন তো জীবন্ত গ্রন্থ হিসাবে আমাদের মাঝে বিদ্যমান। কুরআনই বলছে, يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللهِ الْغَرُورُ ‘হে মানবজাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর এবং ভয় কর সেই দিনকে, যেদিন পিতা তার পুত্রের কোন কাজে আসবে না এবং পুত্র তার পিতার কোন কাজে আসবে না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌র ওয়াদা সত্য। অতএব পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে ধোঁকায় না ফেলে এবং শয়তান যেন তোমাদেরকে প্রতারিত না করে’ *(লুকমান ৩১/৩৩)*।

কিন্তু আমার মনে হয় দুনিয়াকেই আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য বানিয়ে নিয়েছি। চায়ের দোকান থেকে অফিস-আদালত, খেলার মাঠ থেকে বাজার-ঘাট, স্কুল-কলেজ সর্বত্রই দু’-পাঁচজন মানুষ জমায়েত হ’লে তাদের আলোচনার পুরোটাই জুড়ে থাকে দুনিয়ার কথা। কালে-ভদ্রে ধর্মের কথা, আখেরাতের কথা বলে; কিন্তু তা মনে দাগ কাটে না। মসজিদ, মাদ্রাসা ও ওয়ায-মাহফিলে আখেরাতের যৎসামান্য যে আলোচনা হয় তা দুনিয়ার আলোচনার তুলনায় নেহায়েৎ কিঞ্চিৎকর। দুনিয়াতে কে ক্ষমতাবান হ’ল, কার কী সুযোগ-সুবিধা মিলল, কার কোন বড় চাকরী মিলল, কার অর্থ-বিত্তের বাড়-বাড়ন্ত হ’ল, কে বিপদে পড়ল, কার ছেলে-মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না, ওর এত হ’ল আমার কিছুই হ’ল না, ওর ছেলে-মেয়ে পড়া লেখায় কত এগিয়ে, আমারগুলো গোবরগনেশ, কার উপরি আয় ভাল, কাকে কিভাবে জব্দ করা যায়, এ জাতীয় আলোচনা করে, আর আড্ডা দিয়ে আমরা আমাদের সময় পার করি। দুনিয়ার সুযোগ-সুবিধাকে আমরা বড় করে দেখি। আখেরাতের কথা ব্যক্তিগতভাবে, পারিবারিক ও সমষ্টিগতভাবে আমরা কমই ভাবী। দুনিয়াতে সুখে-দুখে যেভাবেই বাঁচি আমরা ক’বছর বাঁচব? অথচ আখেরাতের জীবনের কোন শেষ নেই। আখেরাতের চিরস্থায়ী সেই জীবনে নিজেকে এবং নিজের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের মহাশাস্তি থেকে রক্ষা করা এবং সবাইকে জান্নাতের লোভনীয় পুরস্কার হাছিলের জন্য ঈমান-আমলে উদ্বুদ্ধ করাই তো বুদ্ধিমান মানুষের কাজ হওয়া উচিত। কিন্তু আমরা তেমন কোন বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে পারছি না। আখেরাতে বিশ্বাস যেমন ফরযে আইন তেমনি আখেরাতের বিষয়াবলী চর্চাও ফরযে আইন।

আজ আমাদের মাঝে খুন-যখম, ব্যভিচার-ধর্ষণ, চুরি-ডাকাতি, ছিনতাই-রাহাযানি, সূদ-ঘুষ, মদ, জুয়া, ভেজাল-নকল, চোরাকারবারী, যুলুম-নির্যাতন, ক্ষমতার অপব্যবহার, অর্থ লোলুপতা, অপরের সম্পদ আত্মসাৎ, ব্যাংক থেকে কিংবা কারও থেকে ঋণ নিয়ে তা পরিশোধ না করা, মানুষের অধিকার প্রদানে কার্পণ্য, বয়স্কদের প্রতি অযত্ন দিনকে দিন যেভাবে বেড়ে চলছে তাতে আখেরাতে যে আল্লাহ্‌র সামনে আমাদের হিসাব দিতে হবে এবং এসব অন্যায়ের ক্ষমা না মিললে যে জাহান্নামে যেতে হবে সে বিশ্বাস আছে বলে আমাদের কাজে-কর্মে প্রতীয়মান হয় না। মুসলিম হয়ে এবং মুসলিম সমাজে বসবাস করে আমরা আজ ইসলামে নিষিদ্ধ অসৎকাজ কিভাবে নির্বিকারচিত্তে করে চলেছি এবং কিভাবে সৎকাজ পরিত্যাগ করে চলেছি, তা ভাববার বিষয়। ঈমানী দুর্বলতা ও নিষ্ক্রিয়তার ফলেই আমাদের আমলী দুর্বলতা ও নিষ্ক্রিয়তা তৈরি হয়েছে। মহান আল্লাহ্‌র কাছে সকাতর প্রার্থনা, তিনি যেন আমাদের এহেন অবস্থা পরিবর্তন করে ইসলামের সঠিক রূপে আমাদের ফিরিয়ে নেন। ঈমানী ও আমলী দুর্বলতা কাটাতে দৃঢ় সংকল্প নিয়ে ময়দানে নামার তাওফীক্ব দান করেন।

সমাজের দিকে তাকালে আজ দেখা যাবে ইসলামী বিধান মেনে না চলার ছড়াছড়ি। ছালাত আমাদের কাছে ঐচ্ছিক বিষয়। যার মনে চায় ছালাত আদায় করে, যার মনে চায় না আদায় করে না। যে চায় দু’এক ওয়াক্ত পড়ে, যে চায় পাঁচ ওয়াক্ত নিয়মিত আদায় করে। কিন্তু ছালাত আদায় করা লোকের থেকে না পড়া লোকের সংখ্যা দুঃখজনকভাবে বেশী। এতে মা-বাবা কিংবা পরিবারের কারও মাথাব্যথা আছে বলে দেখা যায় না। আমাদের অধিকাংশ ছালাত আদায়কারী ছালাত আদায়ের জন্য প্রয়োজনীয় সূরা এবং দো‘আ-কালাম যে তাজবীদের নিয়মে পড়ে না বা পড়তে পারে না তার সত্যতা যে কেউ খুঁজে দেখতে পারেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাহাবীদের লক্ষ্য করে বলেছিলেন, ‘তোমরা আমাকে যেভাবে ছালাত আদায় করতে দেখেছ সেভাবে ছালাত আদায় করো’।[৮] হাদীছ গ্রন্থগুলোতে তাঁর শেখানো ছালাত আদায়ের পদ্ধতি অনুপুঙ্খ বর্ণিত আছে। ছাহাবীদের থেকে আজ পর্যন্ত তাঁর দেখানো রীতিতে ছালাত আদায়ের পদ্ধতি জানেন এবং আমল করেন এমন মানুষও কম নন। তাঁর বর্ণিত নিয়মে ছালাত আদায় শেখা ফরযে আইন। কিন্তু মসজিদের অধিকাংশ মুছল্লীকে জিজ্ঞেস করলে জানা যাবে তারা এমন কোন আলেম থেকে ছালাত শেখেনি কিংবা তার ছালাত আদায় সঠিক হয় কি-না তা যাচাই করেনি। শেখার কোন গরযও তারা অনুভব করে না।

প্রতি বছর রামাযান মাসে আমরা ছিয়াম পালন করি। ছিয়াম পালন ফরয। তা সত্ত্বেও বহু সংখ্যক মুসলিম যে ছিয়াম পালন করে না, সে কথাও সত্য। ছিয়াম রাখলে কি উপকার, আর না রাখলে কি ক্ষতি সে ইলম জানা ফরযে আইন। ছিয়াম ভঙ্গের কারণ, কিভাবে ছিয়াম ভাঙলে শুধু কাযা ফরয হবে এবং কখন কাযা ও কাফফারা উভয়ই ফরয হবে তা প্রত্যেক ছিয়াম পালনকারীর জানা আবশ্যক। ছিয়াম পালনে আগ্রহী হ’তে এর ফযীলত বা পুরস্কার জানাও যরূরী। কিন্তু আমরা এক্ষেত্রে সচেতনতার তেমন পরিচয় দিতে পারিনি।

যাকাত আদায়ও আমরা খুব যে হিসাব-কিতাব করে করি এবং প্রাপকদের অধিকার হিসাবে সসম্মানে তাদের হাতে তুলে দেই এমন চিত্র যাকাত আদায়কারী ভাই-বোনদের কমজনই দাবী করতে পারেন। যাকাত ফরয হয়েছে অথচ দেন না, এমন মুসলমানের সংখ্যা যাকাতদাতাদের থেকে বেশী বৈ কম নয়। ওশর বা জমির ফসলের যে যাকাত আছে

৮. *বুখারী হা/৭২৪৬*।

তা একরকম জানিই না কিংবা ভুলে গেছি।

হজ্জ শেষে নামের সাথে আলহাজ্জ বা হাজী লেখার আগ্রহ আমাদের প্রবল। কিন্তু হজ্জের মাসআলা-মাসায়েল জেনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দেখানো পদ্ধতিতে হজ্জ হ'ল কি-না, তা জানার বিষয়ে আমাদের আগ্রহ নেই। অথচ হজ্জ সম্পর্কে তিনি বলে গেছেন, خُذُوا مَنَاسِكَكُمْ 'তোমরা আমার থেকে তোমাদের হজ্জের নিয়মাবলী শিখে নাও'।[৯]

দো'আ-দরূদ, যিকির-আযকার, তাসবীহ-তাহলীল, কুরআন তিলাওয়াত ইত্যাদি নফল ইবাদত-বন্দেগীতেও তাঁর তরীকা জানতে হবে, যাতে আমরা বিদ'আতে লিপ্ত হয়ে না পড়ি।

পেশাগত বিদ্যার দু'টি দিক রয়েছে। প্রথম দিক ঐ পেশার সাথে জড়িত হালাল-হারাম এবং শারঈ আদেশ-নিষেধ কী আছে কিংবা না আছে তা জানা। দ্বিতীয় দিক নিজ নিজ পেশা সংক্রান্ত মৌলিক-অমৌলিক বিদ্যা অর্জন, যাতে পেশাগত দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করা যায় এবং প্রশিক্ষণ ইত্যাদির মাধ্যমে তার উত্তরোত্তর উন্নতি ঘটান যায়। আমাদের সমাজের মানুষকে পেশাগত বিদ্যার দ্বিতীয় দিকটি অর্জনে যথেষ্ট তৎপর দেখা যায়। কিন্তু ঐ পেশার সাথে জড়িত ইসলামী কি কি বিধি-নিষেধ আছে তা জানতে খুব কম লোককেই আগ্রহ প্রকাশ করতে দেখা যায়। যেন তা কোন জানার বিষয় নয়।

হাক্কুল ইবাদ তথা মানুষের অধিকার সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন আমাদের জন্য আরেকটি যরূরী বিষয়। আমার নিকট কোন লোকের কি অধিকার বা পাওনা আছে তা যদি আমি জানি তাহ'লেই না আমি তা পূরণে এগিয়ে আসব। আর যদি তা কিছুই না জানি তাহ'লে তো আমার পক্ষে তাদের অধিকার যথাযথভাবে আদায় সম্ভব হবে না। কারও প্রাপ্য অধিকার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও আমি যদি পরিশোধ না করি তাহ'লে আমাকে অবশ্যই গুনাহগার হ'তে হবে। এজন্য কুরআন ও হাদীছে বর্ণিত মানবাধিকার সম্পর্কে জানা ফরযে আইন। এসব অধিকারের মধ্যে আছে দ্বীনী অধিকার, স্নেহ-শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা লাভের অধিকার, আর্থিক অধিকার, আখলাক বা আচরণিক অধিকার, খেদমতজনিত অধিকার, শিক্ষণ-শিখনের অধিকার ইত্যাদি। অধিকার যারা পাবেন তাদের মধ্যে আছেন শাসক-শাসিত, মাতা-পিতা, সন্তান, স্বামী-স্ত্রী, প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, ধনী-গরীব, পথিক, মালিক-শ্রমিক, নারী-পুরুষ, ছোট-বড়-সমবয়সী, মুসলিম-অমুসলিম, পরিচিত-অপরিচিত মানুষ ইত্যাদি। তাদের অধিকার আদায়ের কথা কুরআন ও হাদীছে বার বার বলা হয়েছে।

আদব-আখলাক বা আচরণের কথা কুরআন-হাদীছে গুরুত্বের সাথে আলোচিত হয়েছে। মূলত ইসলাম মানব জীবনের সঙ্গে জড়িত সকল দিকের বিধি-বিধানের নাম। ইসলামী আদব বা শিষ্টাচার হচ্ছে প্রকৃত মুসলিম হওয়ার জন্য একজন মুসলিমকে তার দৈনন্দিন জীবনে আবশ্যিকভাবে মেনে চলা নিয়ম-নীতি, বিধি-বিধান, দো'আ, যিকির-আযকার ইত্যাদির সমষ্টি।

একইভাবে ইসলামী আদব মানুষের বস্তুগত, মনস্তাত্ত্বিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের সকল দিক জুড়ে আছে। প্রত্যেক হাদীছ গ্রন্থে 'কিতাবুল আদাব' বা 'শিষ্টাচার' কিংবা 'কিতাবুল বিররি ওয়াছ-ছিলাহ' বা 'সদাচরণ ও সম্পর্ক তৈরি' শিরোনামে অধ্যায় রয়েছে। ইমাম বুখারী (রহঃ) তো 'আল-আদাবুল মুফরাদ' বা অনন্য শিষ্টাচার নামে হাদীছের একটি বড়সড় গ্রন্থই সংকলন করে গেছেন। আদবের উদাহরণ অনেক। যেমন আল্লাহ তা'আলার সাথে বজায় রাখা আদব, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে মেনে চলা আদব, কুরআন ও সুন্নাহ্র সাথে আদব, মাতা-পিতার সাথে আদব, স্বামী-স্ত্রীর সাথে আদব, সন্তানের সাথে আদব, প্রতিবেশীর সাথে আদব, আত্মীয়-স্বজনের সাথে আদব, জনসাধারণের সাথে আদব, গৃহে প্রবেশ ও গৃহ থেকে বের হওয়ার আদব, পানাহারের আদব, হাঁচি ও হাই তোলার আদব, ওয়াশরুম ব্যবহারের আদব, গোসলের আদব, ঘুমানো ও জাগার আদব, পোষাক-পরিচ্ছদ ও সাজসজ্জার আদব, পথের আদব, মসজিদের আদব, মজলিসের আদব, সফরের আদব, কেনা-বেচার আদব, অফিস-আদালতের আদব, শিক্ষক-ছাত্রের আদব, উপকারীর প্রতি শুকরিয়া জ্ঞাপনের আদব ইত্যাদি। এগুলোর প্রত্যেকটির সাথে অনেক আদব জড়িয়ে আছে। শিশুকাল থেকে যদি পরিবারের ছোটদের ইসলামী আদবে অভ্যস্ত করানো যায় তবে তারা বড় হয়ে ইসলামী আদবের সকল দিক আয়ত্বে এগিয়ে আসবে ইনশাআল্লাহ।

হালাল-হারামের জ্ঞান অর্জনও ফরযে আইন। আক্বীদা ও ইবাদতের ক্ষেত্রে মূলসূত্র কুরআন ও সুন্নাহ বর্ণিত আক্বীদা ও ইবাদতই কেবল হালাল। কুরআন-সুন্নাহ নিষিদ্ধ আক্বীদা ও ইবাদত হারাম। আক্বীদা ও ইবাদত ব্যতীত অন্য সকল কিছুর ক্ষেত্রে মূলসূত্র সকল বস্তু, প্রাণী, কাজকর্ম, আচরণ ইত্যাদি হালাল; তবে কুরআন ও সুন্নাহ যে সকল বস্তু, প্রাণী, কাজকর্ম ও আচরণ হারাম ঘোষণা করেছে সেগুলো কেবল হারাম। কাজেই মুসলিম মাত্রেই হালাল আক্বীদা ও ইবাদতের বিদ্যা শেখা ফরয। এ বিদ্যা জানা থাকলে হারাম আক্বীদা ও ইবাদতের থেকে সে বাঁচতে পারবে। অনুরূপভাবে কোন কোন বস্তু, প্রাণী, কাজ-কর্ম ও আচরণ হারাম তা জানা থাকলে হালাল বস্তু, প্রাণী, কাজ-কর্ম ও আচরণ নিয়ে তাকে ভাবতে হবে না। কেননা হালাল বস্তু, প্রাণী, কাজ-কর্ম ও আচরণের সংখ্যা অগণিত। পক্ষান্তরে হারাম বস্তু, প্রাণী, কাজ-কর্ম ও আচরণের সংখ্যা সীমিত। তার জ্ঞান আয়ত্ব করা জটিল নয়। যেমন আক্বীদা ও ইবাদতের জ্ঞান আয়ত্ব করা কঠিন নয়।

ইসলাম তো মুজাহাদা বা চেষ্টা-সাধনার নাম। চেষ্টা করেই ইসলাম অর্জন করতে হবে। চেষ্টা করেই ইসলামের উপর দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। যদিও মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ সূত্রে তাদের মুসলিম হওয়ার মূল্যকে অস্বীকার করা যায় না; কিন্তু ইসলাম সম্পর্কে তাদের নির্বিকার উদাসীনতাকেও উপেক্ষা করা চলে না। মুসলমানদের ইসলাম থেকে এমন বিচ্যুতি তাদের কাঁদায় বলেও মনে হয় না। সত্যি বলতে কি, আমাদের ইসলাম পালনের দুর্গতি দেখে আফসোস করার মতো আজ কেউ আছে বলে চোখে পড়ে না।

[ক্রমশঃ]

৯. আহমাদ হা/১৪৪৫৯; মুসলিম হা/১২৯৭; নাসাঈ হা/৩০৬২; ছহীহুল জামে' হা/৭৮৮২।

কুরআন সম্পর্কে প্রাচ্যবিদদের সংশয় ও তার জবাব

-ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

ইসলামের চিরন্তন সংবিধান আল-কুরআন শুধু মুসলমানদের জীবনব্যবস্থাই নয়; বরং তা একটি পূর্ণাঙ্গ আধ্যাত্মিক, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং জ্ঞানগত দিকনির্দেশনা প্রদানকারী জীবনবিধান। যুগে যুগে মুসলিম ও অমুসলিম সকল চিন্তাবিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে আল-কুরআন। অমুসলিমদের মধ্যে একদল কুরআনের গভীরতা অনুধাবনের চেষ্টা করেছেন, অপর একদল পণ্ডিত যারা প্রাচ্যবিদ হিসাবে পরিচিত, তারা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও ষড়যন্ত্রমূলকভাবে কুরআনের বিরুদ্ধে সংশয় ও বিভ্রান্তি ছড়িয়েছেন। এই প্রবন্ধে আমরা প্রাচ্যবিদদের সেসব সংশয়ের জবাব সংক্ষেপে এবং যথাযথভাবে প্রদানের চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

প্রাচ্যবিদ্যা ও প্রাচ্যবিদ :

প্রাচ্যবিদ্যা (Orientalism) পশ্চিমা বিশ্বের প্রাচ্যের সংস্কৃতি, ধর্ম ও ইতিহাস নিয়ে গবেষণার একটি শাখা। এই গবেষণার উদ্দেশ্য যত না একাডেমিক, তার চেয়ে অনেক বেশী রাজনৈতিক। এজন্য আমরা দেখি যে, প্রাচ্যবিদদের একটি বড় অংশ গবেষণার নামে ইসলাম বিরোধী প্রচার-প্রচারণায় লিপ্ত হয়েছেন। আর তারই অংশ হিসাবে তারা হাদীছকে তো বটেই, স্বয়ং কুরআনকে পর্যন্ত আল্লাহর বিধান নয়, বরং মানবরচিত সংকলন হিসাবে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন এবং এর মাধ্যমে ইসলামের প্রতি তাদের বিদ্বেষমূলক দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করেছেন। তারা কুরআনের সমালোচনা করতে গিয়ে এর ঐতিহাসিক সত্যতা, উৎস, ভাষাগত সমালোচনা ও সামাজিক বিধি-বিধানের সমালোচনার মাধ্যমে আল্লাহ অহি হিসাবে কুরআনের অবস্থানকে প্রশ্নবিদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন।

উল্লেখ্য যে, প্রাচ্যবিদ বলতে বোঝায় ঐসব পশ্চিমা চিন্তাবিদদের, যারা প্রাচ্যের ধর্ম, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা করেন। এই গবেষণাগুলো প্রায়শই নিরপেক্ষ না হয়ে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় পক্ষপাতদুষ্ট হয়। এডওয়ার্ড সাঈদ তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ Orientalism-এ দেখিয়েছেন কিভাবে পশ্চিমারা প্রাচ্যের সমাজ ও সভ্যতার বিরুদ্ধে বিশেষ করে ইসলামের বিরুদ্ধে আধিপত্যবাদী মানসিকতা নিয়ে গবেষণা চালায়। তার মতে, প্রাচ্যবাদী পাণ্ডিত্য মূলত পশ্চিমা উপনিবেশবাদ ও সাংস্কৃতিক আধিপত্যের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে।[১]

প্রাচ্যবিদদের অবস্থান অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দ্বিমুখী। তাদের কর্মকাণ্ডে পশ্চিমা কেন্দ্রিকতা (Eurocentrism) ও ধর্মীয় পক্ষপাতদুষ্টতা লক্ষণীয়। যদিও তাদের ইসলাম সংক্রান্ত গবেষণার কিছু ইতিবাচক দিকও ছিল।[২] তবে তাদের হিংসাত্মক এবং অসৎউদ্দেশ্য প্রণোদিত দিকটি খুব কদর্যপূর্ণ। জ্ঞানচর্চার পোষাকে একাডেমিক গবেষণার চেয়ে তাঁরা ঘৃণ্য রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থকেই প্রাধান্য দেন। মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতির উপর তাদের যে জ্ঞানমূলক আধিপত্যবাদী যুদ্ধের সূচনা হয়, তা الغزو الفكري বা বুদ্ধিবৃত্তিক যুদ্ধ[৩] হিসাবে পরিচিত। সেজন্য তাদের গবেষণায় সত্য উদ্ঘাটনের চেয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ, পূর্বনির্ধারিত পক্ষপাতিত্ব ও সংশয়বাদ স্পষ্টভাবেই পরিলক্ষিত হয়।[৪]

নিম্নে প্রাচ্যবিদদের কুরআন বিষয়ক মৌলিক কিছু সংশয়ের জবাব প্রদান করা হ'ল।

প্রাচ্যবিদদের মৌলিক সংশয়সমূহ ও তার জবাব :

১. কুরআনের উৎস নিয়ে সংশয় :

প্রাচ্যবিদদের একটি প্রধান বক্তব্য হ'ল, কুরআন মূলত আল্লাহর নাযিলকৃত কিতাব নয়। বরং মুহাম্মাদ (ছা.)-এর নিজস্ব রচনা। তিনি কুরআনের তথ্যসমূহ মূলতঃ বাইবেল, তাওরাত, ইহুদী-খ্রিষ্টান সাহিত্য এবং অন্যান্য ধর্ম (যেমন জরাথুস্ত্রবাদ, ছাবেই ধর্ম) থেকে ধার করে লিপিবদ্ধ করেছেন। তারা কুরআনে বর্ণিত সৃষ্টি, আদম, জান্নাত, জাহান্নাম এবং নবীদের গল্পের সাথে অন্যান্য ঐশী গ্রন্থের সাদৃশ্য দেখে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) অন্যান্য ধর্ম থেকে সবকিছু গ্রহণ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, ইবনে ওয়াররাক (Ibn Warraq) অভিযোগ করেন যে, ছালাতের শর্তাবলী ইহূদী লেখা থেকে এবং পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ছাবেইদের থেকে নেওয়া হয়েছে। তিনি জিন সম্পর্কিত ধারণা পারসিক ধর্ম থেকে গ্রহণের দাবী করেন এবং মেরি (ঈসা (আঃ)-এর মা) ও মিরিয়ামের (হারুন (আঃ)-এর বোন) মধ্যে বিভ্রান্তির অভিযোগ করেন।[৫] প্রাচ্যবিদরা আরও দাবী করেন যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) ইহূদী ও খ্রিষ্টানদের সংস্পর্শে এসে এই জ্ঞান অর্জন করেছেন, যদিও তারা স্বীকার করেন যে, সেই সময়ে এই বইগুলো আরবীতে অনূদিত ছিল না বা নবীর কাছে সহজলভ্য ছিল না।[৬]

উইলিয়াম মুইর (William Muir) তার The Life of Mahomet (১৮৫৮) গ্রন্থে কুরআনকে মুহাম্মদ (ছাঃ)-এর 'ব্যক্তিগত রচনা' বলে অভিহিত করেন। তিনি তাঁকে প্রভাব ও ক্ষমতার আকাঙ্খী, একজন ভাবকবি ও ভুতাহত বলেও

১. Edward W. Said, *Orientalism* (Newyork : Vintage books, 1979), p.36

২. যেমন–হাদীছ ডিকশনারী রচনা, প্রাচীন ইসলামী গ্রন্থাবলীর পাঠোদ্ধার প্রভৃতি (বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : ড. মুহাম্মাদ সিবাঈ, ***আল-ইসতিশরাক্ব ওয়াল মুসতাশরিকুন : মা লাহুম ওয়ামা আলাইহিম*** (কায়রো : দারুল ওয়াররাক্ব, ১ম প্রকাশ : ১৯৬৮ইং, পৃ. ৩১-৩৩।

৩. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : ড. আলী জারীশাহ ও মুহাম্মাদ শরীফ আয-যায়বাক্ব, ***আসালিবুল গুযু আল-ফিকরী***।

৪. Adil kadavath, *Orientalism: The Western Hierarchy Against Islam*, Islam on web, Aug 13, 2024, https://en.islamonweb.net/orientalism

৫. Ibn-e-Warraq, *The Origins of the Koran* (New York : Prometheus Books 59 John Glenn Drive, Amherst), p. 592.

৬. Nazar Fadli and others, *Orientalists and Their Study of the Qur'an*, The International Journal of Social Sciences, Aug 13, 2024, https://en.islamonweb.net/orientalism.

চিহ্নিত করেছেন।[৭] জন ওয়ানসব্রো (John Wansbrough) তার Quranic Studies (১৯৭৭) গ্রন্থে দাবী করেন যে, কুরআন পরবর্তীকালে সংকলিত হয়েছে। তাদের মতে, কুরআন মুহাম্মদ (ছাঃ)-এর নিজস্ব চিন্তা, বা তা খ্রিষ্টীয় ও ইহূদী ধর্মগ্রন্থ থেকে অনুপ্রাণিত।[৮]

জবাব :

প্রথমতঃ কুরআন নিজেই এই অপবাদ প্রত্যাখ্যান করে বলেছে, وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ 'আর আমরা তো জানি যে, তারা বলে, তাকে শিক্ষা দেয় জনৈক ব্যক্তি। অথচ যার দিকে তারা ইঙ্গিত করে, সে তো একজন অনারব। অথচ এই কুরআন হ'ল পরিষ্কার আরবী ভাষায় *(নাহল ১৬/১০৩)*। অর্থাৎ মক্কার কিছু ইহূদী, খৃষ্টান দাস ছিল, যাদের প্রতি ইঙ্গিত করে মক্কার কাফেররা বলত যে, অমুক দাস মুহাম্মাদকে কুরআন শিক্ষা দেয়। ফলে আল্লাহ তাদের উত্তরে বললেন, যাদের দিকে ইঙ্গিত করা হয়, তারা তো শুদ্ধ আরবীই জানে না। অতএব এই দাবী নিতান্তই অবান্তর।[৯]

আল-কুরআন যদি তাদের ধারণামত এমন বিভিন্ন ভিনদেশী উৎস থেকে গৃহীত হত, তবে তাতে বহু বিভ্রান্তি ও পরস্পরবিরোধী বক্তব্য পাওয়া যেত। এজন্য আল্লাহ নিজেই চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলেন, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا 'তারা কি কুরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে না? যদি এটা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো পক্ষ থেকে হ'ত, তবে তারা এতে অনেক ধরনের বৈপরীত্য খুঁজে পেত' *(নিসা ৪/৮২)*।

দ্বিতীয়তঃ মুহাম্মাদ (ছাঃ) ছিলেন উম্মী তথা নিরক্ষর। তিনি অন্য কোন গ্রন্থ পাঠ করবেন, পর্যালোচনা করবেন, তারপর নিজেই এমন এক অপূর্ব সাহিত্য, বিশুদ্ধ ইতিহাস ও বিজ্ঞানসম্মত কিতাব রচনা করবেন- এটা মোটেই স্বাভাবিক ব্যাপার নয়।[১০]

তৃতীয়তঃ তৎকালে বাইবেল ও তাওরাতের কোন আরবী অনুবাদ ছিল না। ফলে রাসূল (ছাঃ) অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন হ'লেও সেখান থেকে কিছু 'ধার' করার সুযোগ ছিল না।[১১]

চতুর্থতঃ পবিত্র কুরআনের সাথে বাইবেল ও তাওরাতের কিছু বিষয় যদি সাদৃশ্যপূর্ণ হয়, তবে সেটা অস্বাভাবিক নয়। কেননা আল্লাহ সকল নবীর কাছে যে বার্তা পাঠিয়েছিলেন তার মৌলিক বক্তব্য একই ছিল। সেসব গ্রন্থে যে সকল কাহিনী ছিল, তা কুরআনেও কিছু কিছু এসেছে। সবই যেহেতু একই মূল উৎস থেকে নাযিল হয়েছে, তাই তাতে সাদৃশ্য থাকা স্বাভাবিক। এতে মোটেও 'ধার' করা সাব্যস্ত হয় না, বরং কুরআনের এলাহী সত্যতাই প্রমাণ করে।[১২]

পঞ্চমতঃ পবিত্র কুরআনে সাদৃশ্যপূর্ণ বিষয় যেমন আছে, তেমনি এমন বহু বিষয় রয়েছে, যার কোন ইঙ্গিত বা অস্তিত্বই বাইবেলে নেই। যেমন বিগ ব্যাং তত্ত্ব *(আম্বিয়া ২১/৩১)*।[১৩] অন্যদিকে কুরআনে এমন অনেক বিষয় আছে যা বাইবেলের ভুল সংশোধনও করে। যেমন বাইবেল ও কুরআন উভয়ই মহাবিশ্ব ও মানব জাতি সৃষ্টির বর্ণনা দেয়, তবে উপস্থাপনায় পার্থক্য রয়েছে। বাইবেল ৬ দিনে সৃষ্টির বর্ণনা দিয়েছে এবং ৭ম দিনে বিশ্রামের কথা বলেছে *(আদিপুস্তক ২/১-২)*। অপরদিকে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, তবে কোন বিশ্রামের কথা উল্লেখ করেনি, কারণ আল্লাহ কখনোই ক্লান্ত হন না। আল্লাহ বলেন, وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ 'আর নিশ্চয়ই আমরা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং এ দু'য়ের মধ্যেকার সবকিছুকে সৃষ্টি করেছি ছয় দিনে। অথচ এতে আমাদের কোনরূপ ক্লান্তি স্পর্শ করেনি' *(ক্বাফ ৫০/৩৮)*। এই আয়াত বাইবেলের ঐ বর্ণনাকে সংশোধন করেছে, যেখানে বলা হয়েছে সৃষ্টিকর্তা বিশ্রাম নেন। এতে স্পষ্টতই বোঝা যায়, কুরআন পূর্ববর্তী কোন কিতাবের অনুকরণ নয়, বরং আল্লাহ কর্তৃক নাযিলকৃত স্বতন্ত্র কিতাব।

২. কুরআনের সংকলন প্রক্রিয়া নিয়ে সংশয়

প্রাচ্যবিদদের অভিযোগ, কুরআন বহু বছর পর সংকলিত হয়, অনেক আয়াত হারিয়ে যায়। অতঃপর ছাহাবীগণ নিজের মত করে তা রচনা ও সজ্জায়ন করেন। তাদের দলীল হ'ল খলীফা ওছমান (রাঃ) কর্তৃক কুরআনের সংকলন এবং অন্যান্য সংস্করণ ধ্বংসের নির্দেশ, যা তাদের মতে, কুরআন বিকৃতির সবচেয়ে বড় প্রমাণ। এমনকি এনসাইক্লোপেডিয়া অফ ইসলাম এবং এনসাইক্লোপেডিয়া অফ ব্রিটেনিকাতে পর্যন্ত বর্ণনা করা হয়েছে যে, কুরআনের অনেক অংশ হারিয়ে গেছে।[১৪]

তারা কুরআনের বিভিন্ন ক্বিরাআত (পঠন পদ্ধতি)-এর অস্তিত্বকে বাইবেলের বিভিন্ন সংস্করণের মতো কুরআনেরও ভিন্ন ভিন্ন সংস্করণ হিসাবে উপস্থাপন করেন।[১৫]

১৯৭২ সালে ইয়ামনের ছান'আয় আবিষ্কৃত ছান'আ পাণ্ডুলিপি (Sana'a Manuscript) প্রাচ্যবিদদের সমালোচনার একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রবিন্দু। এই পাণ্ডুলিপির নিম্ন পাঠে (lower text) ওছমানী পাঠের (upper text) থেকে অনেক ভিন্নতা

৭. William Muir, *The life of Mahomet* (London : Smith, Elder and co.), p 35-39.
৮. John Wansbrough, Quranic Studies (New york : Prometheus Books), 1977.
৯. Muhammad Mohar Ali, *The Qur'an And The Orientalists: An Examination of their Main Theories and Assumptions* (London : Jamiyat Ihyaa Minhaj Al-Sunnah), 2004, p 94.
১০. ড. মুহাম্মাদ খলীফা, *আল-ইসতিশরাক ওয়াল কুরআনিল আযীম* (কায়রো : দারুল ইতিছাম, ১৯৯৪), পৃ. ৪৩।
১১. *The Qur'an And The Orientalists*, p 109.
১২. ibid, p 217.
১৩. ibid, p 192.
১৪. ড. মুহাম্মাদ আমীন, *আল-মুসতাশরিকুন ওয়াল কুরআনিল কারীম* (জর্ডান : দারুল আমাল, ২০০৪), পৃ. ২৭১-৭২।
১৫. George sale, *The Koran* (New York : Fredrick worn & company), 1890, p.49.

এবং অধ্যায়ের ভিন্নক্রম পাওয়া যায়।[১৬] গার্ড আর. পুইন (Gerd R. Puin) এই গবেষণার ভিত্তিতে দাবী করেন যে, কুরআন একটি 'বিভিন্ন পাঠ্যের মিশ্রণ' (a kind of cocktail of texts) যা সময়ের সাথে বিকশিত হয়েছে এবং এর কিছু অংশ মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর পূর্ববর্তী হতে পারে।[১৭] সাম্প্রতিক কালে আবিষ্কৃত বার্মিংহাম/প্যারিস পাণ্ডুলিপির কার্বন ডেটিং মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর সময়ের কাছাকাছি দেখালেও প্রাচ্যবিদরা একে পরবর্তীকালের সংযোজন হিসাবে দেখেন।[১৮] এছাড়াও প্যাট্রিসিয়া ক্রোন (Patricia Crone) এবং মাইকেল কুক (Michael Cook) দাবী করেন যে, ৭ম শতাব্দীর শেষ দশকের আগে কুরআনের অস্তিত্ব সম্পর্কে কোন 'নিশ্চিত প্রমাণ' নেই।[১৯]

জবাব :

প্রথমতঃ কুরআন নিজেই স্পষ্ট করেছে যে, এটি আল্লাহ কর্তৃক সংরক্ষিত। যেমন আল্লাহ বলেন, إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ 'নিশ্চয়ই আমরা এই কুরআন নাযিল করেছি এবং আমরাই তা সংরক্ষণকারী' *(হিজর ১৫/৯)*। কুরআনের ভাষ্য মোতাবেক আল্লাহ নিজেই কুরআনকে যেকোন পরিবর্তন-পরিবর্ধন, সংযোজন-বিয়োজন থেকে রক্ষা করেছেন।

দ্বিতীয়তঃ মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায় কুরআন মুখস্থকরণ (হিফয) এবং লিখিত উভয় পদ্ধতিতেই সংরক্ষিত হয়েছিল। প্রতিটি আয়াত নাযিলের পর নবী (ছাঃ) নিজে এবং ছাহাবীগণ তা মুখস্ত করতেন এবং লিখিতভাবে সংরক্ষণ করতেন। এই উভয়বিধ পদ্ধতি কুরআনের পাঠ্য (Text)-কে শুরু থেকেই সুরক্ষিত করেছিল। কুরআনের সংকলন তিন পর্যায়ে হয়— (১) রাসূল (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায় : অহি নাযিল হওয়ার পর ছাহাবীগণ লিখে রাখতেন এবং মুখস্ত করতেন। (২) আবু বকর (রাঃ)-এর সময়কাল : ইয়ামামার যুদ্ধে অনেক কুরআনের হাফেয ছাহাবীদের মৃত্যু হ'লে কুরআনে হেফাযতের উদ্দেশ্যে একটি পূর্ণ মুছহাফ তৈরি করা হয়। প্রথম খলীফা আবুবকর (রাঃ)-এর নির্দেশে যায়েদ ইবনে ছাবিত (রাঃ) একটি সূক্ষ্ম ও সতর্ক যাচাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কুরআনের প্রথম পূর্ণাঙ্গ লিখিত সংকলন প্রস্তুত করেন। এই প্রক্রিয়ায় মৌখিক ও লিখিত উভয় প্রমাণ মিলিয়ে দেখা হয় এবং এটা নিশ্চিত করা হয় যে, প্রতিটি আয়াত বহু সূত্র থেকে প্রমাণিত।

(৩) ওছমান (রাঃ)-এর সময়কাল : ইসলাম সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লে অনারবদের সুবিধার্থে হাফছাহ (রাঃ) কর্তৃক সংরক্ষিত কুরআন ছয়টি কেন্দ্রে পাঠানো হয়। তৃতীয় খলীফা ওছমান (রাঃ)-এর এই সংকলনের উদ্দেশ্য ছিল মূলত কুরআনের ক্বিরাআতগুলোর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান এবং আঞ্চলিক ভিন্নতা দূর করে একটি সার্বজনীন ও প্রমিত পাঠ প্রতিষ্ঠা করা। এর মাধ্যমে কুরআনের সংরক্ষণ অধিকতর নিশ্চিত করা হয়েছিল, কোন বিকৃতি সাধন করা হয়নি।[২০]

তৃতীয়তঃ ছাহাবীগণ কুরআন থেকে আয়াত বাদ দিয়েছেন বা পরিবর্তন করেছেন এমন কথা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন অপবাদ। কুরআন নাযিলের পর থেকেই ছাহাবীগণ কুরআন মুখস্থ করতেন। এককভাবে কোন ছাহাবীর পক্ষে তাতে কিছু বাদ দেয়া বা পরিবর্তনের সুযোগ ছিল না। কেননা সঙ্গে সঙ্গে তা ক্রস চেক হয়ে অপরজনের কাছে ধরা পড়ে যেত। তাছাড়া কেবল মুখস্ত ই নয়, তা হাড়ে বা বিভিন্ন স্থানে লিখিতও ছিল। অতএব কুরআনের কোন অংশ হারিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। স্রেফ ধারণা ছাড়া এর পিছনে কোন ঐতিহাসিক ও দালীলিক প্রমাণ নেই।[২১]

চতুর্থতঃ কুরআনের ৭ ক্বিরাআত একটি সুবিদিত বিষয়, যা কেবল শব্দের উচ্চারণভিন্নতা বোঝায়। এতে অর্থের কোন ভিন্নতা হয় না যে একে বিকৃতি হিসাবে গণ্য করা যাবে। ক্বিরাআতগুলো কুরআনের মূল ব্যঞ্জনবর্ণের কাঠামো (الرسم) বজায় রেখে পাঠ করার একটি অনুমোদিত বৈচিত্র, যা মুহাম্মাদ (ছাঃ) নিজেই অনুমোদন করেছিলেন। এগুলি বাইবেলের মতো ভিন্ন সংস্করণ নয়, যাতে সম্পূর্ণ পাঠ ও তথ্যই ভিন্ন; বরং একই পাঠের বিভিন্ন অনুমোদিত উচ্চারণ ও ব্যাকরণগত রূপ।[২২] ছান'আ পাণ্ডুলিপির নিম্ন পাঠে যে ভিন্নতা দেখা যায় তা মূলত ক্বিরাআতের ভিন্নতা, মূল ওছমানী পাঠ্য (Text)-এর ভিন্নতা নয়। অন্যদিকে প্যারিসে পবিত্র কুরআনের সর্বপ্রাচীন যে পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে, তা বরং কুরআনের সংরক্ষিত হওয়াকেই সুপ্রমাণিত করে।

পঞ্চমতঃ প্রাচ্যবিদরা অতীতকালীন কোন কিছুর প্রাথমিক প্রমাণ হিসাবে প্রত্নতাত্ত্বিক ও লিখিত প্রমাণকেই কেবল সামনে আনেন। অথচ ইসলামের একটি বিশেষ ঐতিহ্য হ'ল হিফয বা মৌখিক ভাবে পূর্বঐতিহ্য সংরক্ষণ করা, যার কারণে বর্তমান তথ্য-প্রযুক্তির যুগে পর্যন্ত এখনও প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ কুরআনের হাফেয তৈরী হচ্ছে। যেহেতু প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণই প্রাচ্যবিদদের কাছে কেবল সুনিশ্চিত প্রমাণ, তাই কুরআনের প্রামাণিকতা নিয়ে তারা সংশয় তৈরী করেন। অথচ এর বিপরীতে ইসলামী জ্ঞানতত্ত্বে তাওয়াতুর (ধারাবাহিক বিবরণ) এবং হিফয (মুখস্থকরণ)-এর একটি দৃঢ় ঐতিহ্য রয়েছে, যা প্রত্নতাত্ত্বিক ও লিখিত প্রমাণের চেয়েও ক্ষেত্রবিশেষে অনেক বেশী শক্তিশালী। সুতরাং 'নিশ্চিত প্রমাণ' কেবল প্রত্নতাত্ত্বিক বা লিখিত নিদর্শনই হতে হবে- প্রাচ্যবিদদের এই নীতি যুক্তি ও বাস্তবতার নিরিখে এবং ইতিহাসের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণই ভিত্তিহীন। এই নীতি জ্ঞানের সংরক্ষণ করে না, বরং জ্ঞানকে ধ্বংসই করে। *(ক্রমশঃ)*

১৬. Gerd-R Puin, *Observations on Early Qur'an Manuscripts in Ṣanʿāʾ* (In Stefan Wild (ed.). The Qur'an as Text. Leiden, Netherlands: E. J. Brill, 1996), p. 107–111.
১৭. Patricia Crone , Michael A. Cook, *Hagarism: The Making of the Islamic World* (London: Cambridge University Press), 1977.
১৮. Keith E. Small, *Textual Criticism and Qur'an Manuscripts* (Lexington Books), 2011.
১৯. Elisabeth Puin, *At a glance: The first two Islamic centuries*] (in German) (1st ed.). Berlin: Verlag Hans Schiler. 2008, p. 461.

২০. *আল-ইসতিশরাক ওয়াল কুরআনিল আযীম*, পৃ. ৯২-৯৭; ড. মুহাম্মাদ আবু লায়লাহ, আল-কুরআনুল কারীম মিনাল মানযূরিল ইসতিশরাকি (কায়রো : দারুন নাশর লিল-জামিআত, ২০০২), পৃ. ১৮৫-৯০
২১. *আল-মুসতাশরিকুন ওয়াল কুরআনিল কারীম*, পৃ. ২৭৮-৮৭।
২২. *ঐ*, পৃ. ৪০২, ৪১৭-২১।

ইসলামের দৃষ্টিতে সহশিক্ষার ভয়াবহতা

*ড. ইহসান ইলাহী যহীর**

উপস্থাপনা : সুশিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। আদর্শবান শিক্ষার্থীরা দেশ ও জাতির ভবিষ্যত কর্ণধার। সেকারণ তাদেরকে অবশ্যই সৎ ও চরিত্রবান রূপে গড়ে তুলতে হবে। শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীদের সৎ ও চরিত্রবান রূপে গড়ে তোলার মহান কারিগর। আর চরিত্রবান ও আদর্শ মানুষ গড়ে তোলার ক্ষেত্র হ'ল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। শিক্ষা মানব জীবনে অপরিহার্য হ'লেও প্রচলিত এই সহশিক্ষা ব্যবস্থায় মারাত্মক নৈতিক অবক্ষয় হচ্ছে। নাস্তিকরা এটিকে 'প্রগতি' ও 'সমতা'র প্রতীক মনে করে। অথচ বাস্তবে এটি মূল্যবোধের অবক্ষয় ও নৈতিক বিপর্যয়ের প্রধানতম উৎস। আলোচ্য নিবন্ধে সহশিক্ষার কুপ্রভাব এবং ইসলামের দৃষ্টিতে আমাদের করণীয় সম্পর্কে বিধৃত হ'ল।-

সহশিক্ষা কি? Co-education বা সহশিক্ষাকে সংক্ষেপে কো-এড বলা হয়। যেখানে ছেলে ও মেয়ে একইসঙ্গে, একই ক্লাসে, একই রুমে পড়ালেখা করে।

সহশিক্ষার সূত্রপাত : ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত সহশিক্ষা পদ্ধতি ছিল না। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে সহশিক্ষা নামক বিষফোঁড়া মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়ে। বর্তমান বিশ্বে পশ্চিমা সংস্কৃতির আলোকে প্রসিদ্ধ হয়ে উঠেছে সহশিক্ষা নামক এই ভাইরাস। তবে বহু মুসলিম দেশে এখনো মুসলিম সংস্কৃতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে একক শিক্ষা পদ্ধতি প্রচলিত আছে।[১]

সহশিক্ষার কুপ্রভাব : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ :

বাংলাদেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে হাযার হাযার শিক্ষার্থী পড়ালেখা সমাপ্ত করে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সেক্টরে কর্মরত আছে। তাদের অনেকে মারাত্মক দুশ্চরিত্র ও চরম দুর্নীতিবাজ। প্রশ্ন হ'ল, উচ্চশিক্ষা লাভ করেও তারা চরিত্রহীন হ'ল কেন? যেখানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে চরিত্রবান লোক বের হওয়ার কথা ছিল, সেখান থেকে বের হচ্ছে চরিত্রহীন, লম্পট, প্রতারক। এজন্য মূলত আমাদের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থাই দায়ী। কারণ আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় সহশিক্ষা নামক আত্মঘাতি ব্যবস্থা চালু আছে। যা ছাত্রজীবন থেকেই আমাদের চরিত্র ধ্বংসে নিয়ামকের ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশের মত ৯০% মুসলিম প্রধান দেশে যা আদৌ কাম্য হ'তে পারে না। নিম্নে সহশিক্ষার কুপ্রভাব তুলে ধরা হ'ল।-

১. সহশিক্ষা সংক্রামক ব্যাধির চাইতেও ভয়াবহ : সহশিক্ষা ছাত্র-ছাত্রীদেরকে অতি অল্প বয়সে চরিত্রহীন হ'তে সহায়তা করছে। কেননা সহশিক্ষায় রয়েছে ছাত্র-ছাত্রীদের অবাধ চলাফেরার সুযোগ। যেখানে ছাত্র-ছাত্রীরা একাকার হয়ে মিলেমিশে চলাফেরা করে। এখানে ইসলামের অমোঘ বিধান পর্দাব্যবস্থা মানা হয় না। সেটাই হচ্ছে সহশিক্ষা। এই সহশিক্ষা নামক সংক্রামক ব্যাধিই শিক্ষার্থীদের চরিত্রকে চরমভাবে কলুষিত করছে।

২. ইসলামের দর্পণে সহশিক্ষা : সহশিক্ষায় ইসলামী পর্দার বিধানকে বাঁকা চোখে দেখা হয়। যারা পর্দা মেনে চলতে চায়, তাদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করা হয়। যারা যত নগ্নভাবে চলে তাদেরকে সাধুবাদ দেয়া হয়। সহশিক্ষা মানেই পর্দাহীনতা। কলেজ-ভার্সিটির সর্বত্র চলছে আজ নগ্নতা, অশ্লীলতা ও অবৈধ প্রেম-প্রীতি। প্রকৃত মেধাবী শিক্ষার্থীরা আজ মানসম্মত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। সহশিক্ষার কুপ্রভাবে বিপর্যস্ত আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা। শিক্ষার মূল লক্ষ্য হ'ল উন্নত চরিত্র গঠন করে ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তি লাভ করা। যে শিক্ষা ব্যবস্থায় চরিত্র নষ্ট হয় এবং অবাধ যৌনাচারের পথ দেখায়, সেই শিক্ষা দ্বারা আমাদের কি লাভ হচ্ছে? এ শিক্ষার মাধ্যমে জাতি শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। মানবিক মূল্যবোধ, নৈতিক উন্নয়ন ও চারিত্রিক উৎকর্ষতা অর্জনে ব্যর্থ হচ্ছে শিক্ষার্থীরা। দিন শেষে অমানবিক, অনৈতিক ও চরিত্রহীন মানুষে পরিণত হচ্ছে।

ইসলামে সহশিক্ষা নিষিদ্ধ। কেননা এটি নৈতিক অবক্ষয়ের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। এটি স্বেচ্ছাচারিতা, বেহায়াপনা ও অশ্লীলতার দিকে ধাবিত করে। অথচ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বহু স্থানে নারী ও পুরুষের একাকার হওয়াকে নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، 'নিশ্চয়ই যারা মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে, তাদের জন্য রয়েছে দুনিয়া ও আখেরাতে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি' *(নূর ২৪/১৯)*।

৩. সহশিক্ষায় চোখের যেনা : ক্লাসের ফাঁকে চোখের চোরা চাহনির লোলুপ আক্রমণে সহশিক্ষার অভিসারীরা পরস্পরে চোখের যেনায় লিপ্ত হয়। অথচ চোখের যেনা ও লজ্জাস্থানের যেনা থেকে মহান আল্লাহ মুমিনদেরকে সতর্ক করেছেন। তিনি বলেন, وَلَا تَقْرَبُوْا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا 'তোমরা ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয়ো না। নিশ্চয়ই এটা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট পথ' *(ইসরা ১৭/৩২)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই আদম সন্তানের জন্য ব্যভিচারের অংশ নির্ধারিত রয়েছে, যা সে অবশ্যই লাভ করবে। যেমন- চোখের যেনা হ'ল দেখা, জিহ্বার যেনা হ'ল কথা বলা, হাতের যেনা হ'ল ধরা, পায়ের যেনা হ'ল চলা। আর মন সেটার আকাঙ্ক্ষা করে ও কামনা করে। আর গুপ্তাঙ্গ সেটাকে সত্য অথবা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে'।[২]

৪. সহশিক্ষায় সতীত্ব হরণ : পরিণত বয়সী শিক্ষার্থীদের জন্য সহশিক্ষার ফলে সতীত্ব হরণ পর্যন্ত হয়ে থাকে। তারা ছুটির সময়ে বিভিন্ন পার্কে, রাস্তার ধারে, আড়ালে-আবডালে প্রেম বিনিময় করে। এর মাধ্যমে সতীত্ব হারানোর মরণযাত্রা শুরু হয়। অথচ রাসূল (ছাঃ) বলেন, لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثُهُمَا الشَّيْطَانَ- 'তোমাদের মধ্যে কেউ যেন কোনও

* *কোরপাই, বুড়িচং, কুমিল্লা।*

১. https://en.wikipedia.org/wiki/Mixed-sex_education

২. *মুসলিম হা/২৬৫৭; বুখারী হা/৬২৪৩; মিশকাত হা/৮৬।*

পরনারীর সঙ্গে নির্জনে একাকী না হয়, কারণ তখন তাদের তৃতীয়জন হয় শয়তান'।[৩] এমনকি হজ্জের পবিত্র সফরেও একাকী গমন করতে নিষেধ করা হয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ وَلَا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا وَخَرَجَتِ امْرَأَتِي حَاجَّةً، قَالَ : اذْهَبْ فَاحْجُجْ مَعَ امْرَأَتِكَ– 'কোন পুরুষ যেন কখনও কোন নারীর সাথে একত্রিত না হয় এবং কোন নারী যেন মাহরাম ব্যতীত একাকী ভ্রমণে বের না হয়। তখন এক ব্যক্তি বলে উঠল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! অমুক যুদ্ধে আমার নাম লেখানো হয়েছে, আর আমার স্ত্রী একাকী হজ্জের সফরে রওয়ানা হয়েছে। রাসূল বললেন, যাও তুমি তোমার স্ত্রীর সাথে হজ্জব্রত পালন কর'।[৪]

৫. বেপর্দা বেহায়াপনা ও অশ্লীলতার জন্ম দেয় : সহশিক্ষা শিক্ষার্থীদের মাঝে পারস্পরিক গোপনীয়তা ও পর্দার সীমা ধ্বংস করে দেয়। তারা একে অপরের সাথে স্বাভাবিকভাবে মেলামেশা করে, যা ইসলাম সুস্পষ্টভাবে হারাম ঘোষণা করেছে। বেহায়াপনার বিপরীতে লজ্জাশীলতাকে ইসলাম আবশ্যক গণ্য করেছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ إِذَا لَمْ تَسْتَحِي فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ– 'বিগত নবী-রাসূলগণের সর্বসম্মত বাণী সমূহ যা মানব জাতি প্রাপ্ত হয়েছে তন্মধ্যে অন্যতম হ'ল, যখন তোমার লজ্জা-শরম না থাকে, তখন তুমি যা ইচ্ছা তাই করতে পার'।[৫] অন্যদিকে আল্লাহ বলেন, وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، 'তোমরা প্রকাশ্য বা গোপন কোন প্রকার অশ্লীলতার নিকটবর্তী হয়ো না' *(আন'আম ৬/১৫১)*। অন্যত্র তিনি বলেন, قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، 'তুমি বল, নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক প্রকাশ্য ও গোপন সকল প্রকার অশ্লীলতা হারাম করেছেন এবং হারাম করেছেন সকল প্রকার পাপ ও অন্যায় বাড়াবাড়িকে' *(আ'রাফ ৭/৩৩)*।

৬. বিবাহপূর্ব অবৈধ সম্পর্ক : সহশিক্ষা থেকে বিবাহপূর্ব অবৈধ প্রেম-প্রীতি, বন্ধুত্ব, হৃদ্যতা, চ্যাটিং, ডেটিং হয়ে থাকে। বিপরীত লিঙ্গের চৌম্বিক আকর্ষণে শিক্ষার্থীরা পরস্পরের দিকে আকৃষ্ট হয়। আবার এসব অবৈধ সম্পর্ক থেকে যেনা-ব্যভিচারের পথ উন্মুক্ত হয়। অতএব জাতির পরবর্তী প্রজন্মের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে অনতিবিলম্বে সহশিক্ষা ব্যবস্থা বন্ধ করে ছেলে ও মেয়েদের পৃথক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে হবে। অন্যথা তারা নৈতিকতা বিবর্জিত এক অথর্ব জাতিতে পরিণত হবে।

৩. তিরমিযী হা/১১৭১; মিশকাত হা/৩১১৮; ছহীহুত তারগীব হা/১৯০৮।
৪. বুখারী হা/৩০০৬; মুসলিম হা/১৩৪১; মিশকাত হা/২৫১৩।
৫. বুখারী হা/৩৪৮৪; মিশকাত হা/৫০৭২।

৭. পর্দার বিধান লঙ্ঘন : প্রাপ্তবয়স্ক ছেলে-মেয়েদের একসাথে পড়াশুনা করা শরী'আত বিরোধী কাজ। এছাড়াও এটি মানুষের স্বভাবধর্মের বিরোধী এবং পারস্পরিক নীতি-নৈতিকতার জন্য চরম ক্ষতিকর। যরূরী প্রয়োজনে মহিলাদেরকে ঘর থেকে বের হ'তে হ'লে সৌন্দর্যের গোপনীয়তা বজায় রেখে বের হ'তে বলা হয়েছে। তারা আপাদমস্তক ঢেকে বের হবে। কারণ মহিলারা আবৃত থাকার জন্য আদিষ্ট। আর যখন তারা বেপর্দা হয়, তখন শয়তান তার দিকে উঁকিঝুঁকি দিতে থাকে কিভাবে তাদের দ্বারা গুনাহের কাজ করানো যায়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتِ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ– 'নারী হ'ল আবরণীয় জিনিস। যখন সে বের হয় শয়তান তাকে চোখ তুলে দেখে'।[৬] পর্দার বিধান লঙ্ঘনের কারণে সমাজে বিপর্যয় নেমে আসে। আল্লাহ্‌র রহমত, বরকত উঠে যায়। আমাদের দেশে সহশিক্ষা ও কর্মস্থলে কারণে পারিবারিক ও সামাজিক ব্যবস্থায় মারাত্মক অশান্তি সৃষ্টি হয়েছে। যার কুপ্রভাব প্রতিনিয়ত বেড়ে চলেছে বিবাহ বহির্ভূত অবৈধ সম্পর্ক এবং বিবাহ পরবর্তী পরকীয়া। যা ইসলামের শান্তিপূর্ণ পারিবারিক কাঠামোকে ধ্বংস করে দিচ্ছে।

৮. চারিত্রিক অবক্ষয় ও লজ্জাশীলতা ধ্বংস : শালীনতা ও লজ্জাশীলতাকে ধ্বংস করে দেয় সহশিক্ষা। অথচ শালীনতা ও লজ্জাশীলতা ঈমানের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। হাদীছে এসেছে, 'রাসূল (ছাঃ) একবার জনৈক আনছারী ছাহাবীর পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন এমতাবস্থায় যে, তিনি তার ভাইকে লজ্জা-শরম সম্পর্কে উপদেশ দিচ্ছিলেন। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, دَعْهُ، فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ ওকে ছাড়ো! কেননা লজ্জাশীলতা ঈমানের অংশ'।[৭] অন্যত্র তিনি বলেন, اَلْحَيَاءُ لَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ وَفِي رِوَايَةٍ : الْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ– 'লজ্জাশীলতা কেবল কল্যাণই আনায়ন করে। অপর বর্ণনায় এসেছে, 'লজ্জাশীলতার সবটুকু কেবলই মঙ্গল'।[৮] তিনি বলেন, اَلْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ وَالْإِيمَانُ فِي الْجَنَّةِ. وَالْبَذَاءُ مِنَ الْجَفَاءِ وَالْجَفَاءُ فِي النَّارِ– 'লজ্জাশীলতা ঈমানের অঙ্গ। আর ঈমানদার জান্নাতে যাবে। পক্ষান্তরে নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতা মন্দ কাজ। আর মন্দ লোক জাহান্নামে যাবে'।[৯]

৯. বিকৃত মানসিকতা ও ডিপ্রেশন : সহশিক্ষার ফলে উঠতি বয়সের ছেলে-মেয়েদের প্রেমঘটিত প্রত্যাখ্যান, প্রতারণা, ব্রেক-আপ, ছ্যাঁকা-ছলনা, মান-অভিমান থেকে আত্মহত্যা, এমনকি খুনাখুনির মতো ঘটনাও ঘটে যায়। অতএব অভিভাবকদের সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যত বিনির্মাণে সহশিক্ষার প্রতিষ্ঠান হ'তে সন্তানকে দূরে রাখা কর্তব্য।

৬. তিরমিযী হা/১১৭৩; মিশকাত হা/৩১০৯; ইরওয়া হা/২৭৩।
৭. বুখারী হা/২৪; মুসলিম হা/৩৬; মিশকাত হা/৫০৬৯।
৮. বুখারী হা/৬১; মুসলিম হা/৩৭; মিশকাত হা/৫০৭০।
৯. তিরমিযী হা/২০০৯; ইবনু মাজাহ হা/৪১৮৪; মিশকাত হা/৫০৭৬; ছহীহাহ হা/৪৯৫।

১০. ইসলামী আদব-শিষ্টাচার ভূলুণ্ঠিত : যারা ইসলামী পর্দা, আখলাক, চরিত্র, শালীনতা, লজ্জাশীলতা, সৃজনশীলতা, নম্রতা-ভদ্রতা ধরে রাখতে চায়, তারা সহশিক্ষা ব্যবস্থায় কোণঠাসা হয়ে পড়ে। সহশিক্ষা ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠানগুলিতে ইসলামী শিষ্টাচার, আদব-আখলাক চরমভাবে উপেক্ষিত। প্রতিষ্ঠান থেকে পর্দার কোন নির্দেশনা থাকে না। সচেতন অভিভাবক ও তাক্বওয়াশীল শিক্ষার্থীরা নিজস্ব উদ্যোগে যতটুকু পর্দা মেনে চলে, কেবল ততটুকুই।

ইসলামে নারী শিক্ষার বিধান :

নারীদেরকে উচ্চশিক্ষা লাভ করতে ইসলাম সব সময় উৎসাহিত করেছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর স্বর্ণযুগে পর্দা করেও নারীরা ইলম অর্জনে অগ্রগামী ছিলেন। একদা কয়েকজন নারী এসে রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে আবেদন করেন, غَلَبَنَا عَلَيْكَ الرِّجَالُ فَاجْعَلْ لَنَا يَوْمًا مِنْ نَفْسِكَ، ‘আমাদের চেয়ে পুরুষরা আপনার নিকট বেশী সময় পেয়ে থাকে। অতএব আপনি আমাদের দ্বীন শিক্ষার জন্য একটি দিন নির্ধারণ করে দিন। তখন রাসূল (ছাঃ) তাদের জন্য একটি বিশেষ দিন নির্ধারণ করে দেন। যেদিন তিনি তাদেরকে বিভিন্ন বিষয়ে উপদেশ দিতেন ও নির্দেশনা প্রদান করতেন।[১০]

ইসলামের নির্দেশনা হ’ল নারীদের আপদমস্তক আবৃত রাখা *(আহযাব ৩৩/৫৯)*। কেননা পর্দা আমাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত ও দৃষ্টিকে নত রাখতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে *(নূর ২৪/৩০-৩১)*। এখানে মুমিন নারী-পুরুষ সকলের জন্যই দৃষ্টি এবং যৌনাঙ্গের হেফাযতের মাধ্যমে পর্দার বিধান বাস্তবায়ন করা সম্ভব। ফলে যে শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলামী পর্দার বিধান উপেক্ষিত হয়, সেই শিক্ষা ব্যবস্থাকে ইসলাম সমর্থন করে না। অতএব নারী-পুরুষ পৃথক অবস্থানে থেকে পর্দা রক্ষা করে শিক্ষা অর্জন করবে, এটাই ইসলামের চিরন্তন বিধান।

সহশিক্ষার ভয়াবহতা হ’তে বাঁচতে আমাদের করণীয় : এতক্ষণ ইসলামের দৃষ্টিতে সহশিক্ষার ভয়াবহতা উপস্থাপন করা হ’ল। এক্ষণে আমরা সহশিক্ষার ভয়াবহতা হ’তে উত্তরণের পথ সম্পর্কে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।-

১. ছেলে ও মেয়েদের জন্য পৃথক শিক্ষা পরিবেশ নিশ্চিত করা : ছেলে ও মেয়েদের জন্য পৃথক শিক্ষা পরিবেশ নিশ্চিত করা অথবা একই প্রতিষ্ঠানে পৃথক শিফটিং পদ্ধতি চালু করা। এক্ষেত্রে অবশ্যই মেয়েদের জন্য নারী শিক্ষিকা ও ছেলেদের জন্য পুরুষ শিক্ষকের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

২. ইসলামী শিক্ষার পূর্ণ বিকাশ : মাদ্রাসা শিক্ষা ও সাধারণ আধুনিক শিক্ষার দ্বিমুখী ধারাকে সমন্বিত করে একক ইসলামী শিক্ষার পূর্ণ বাস্তবায়ন করতে হবে।[১১] বিগত যুগে ইসলামী শিক্ষার বরকতেই মুসলমানগণ হাযার বছর যাবৎ জ্ঞান-বিজ্ঞানে বিশ্বনেতৃত্বের আসনে সমাসীন ছিলেন। এখন সহশিক্ষা এসে সব ধ্বংস করে দিয়েছে। সেই ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা আবার ফিরিয়ে আনার জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে আমাদেরকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হ’তে হবে।

৩. সহশিক্ষার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলা : সহশিক্ষা মূলত শয়তানী ফাঁদ। এই চোরাগলিতে প্রবেশ করেই অধিকাংশ মুসলিম তাদের ঈমানী শক্তিকে শয়তানের কাছে যিম্মী করে ফেলে। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্রীয়ভাবে সহশিক্ষার বিরুদ্ধে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস চালাতে হবে।

৪. বৈষম্যমূলক শিক্ষানীতির সংস্কার করা : দেশে বিদ্যমান বৈষম্যমূলক শিক্ষানীতির সংস্কার করা সময়ের অপরিহার্য দাবী। স্কুল-কলেজে বিদ্যমান পাঠ্যবই অধ্যয়ণ করে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ঈমানহারা, ইসলাম বিদ্বেষী নাস্তিক্যবাদী ও হিন্দুত্ববাদী মানসিকতা নিয়ে বেড়ে উঠবে। বিগত ফ্যাসিবাদী আমলে জাতীয় শিক্ষাবোর্ড সহ অন্যান্য সকল বোর্ডের নিয়ন্ত্রণমূলক গুরুত্বপূর্ণ শীর্ষ পদগুলোতে মুসলমানদের বাদ দিয়ে হিন্দুদের নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। ফলে রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে বৈষম্যমূলক শিক্ষানীতির সংস্কার করা দুরূহ হয়ে পড়েছে। এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষকে ব্যবস্থা নিতে হবে।

৫. মিডিয়ায় ইসলামী দাওয়াহ ও গণসচেতনতা বৃদ্ধি করা : সহশিক্ষার কুপ্রভাব, সহশিক্ষার ভয়াবহতা শিরোণামে বক্তৃতা-বিবৃতি, লিফলেট, গণসংযোগ, সেমিনার-সিম্পোজিয়াম, আবৃত্তি, অডিও-ভিডিও কন্টেন্ট প্রচার সহ বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দাওয়াতী কাজ জোরদার ও গণসচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। সহশিক্ষার কুফল সম্পর্কে সমাজের প্রতিটি স্তরে সাধ্যমতো প্রচারণা চালাতে হবে।

৬. ইসলামী শিক্ষাকে প্রাধান্য ও পৃষ্ঠপোষকতা দেওয়া : ইসলামী শিক্ষা মানুষের সার্বিক জীবন পরিচালনার জন্য সামগ্রিক উপাদান সমৃদ্ধ একটি সমন্বিত শিক্ষার নাম। দেশের সকল স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থায় বাধ্যতামূলকভাবে ইসলামী শিক্ষাকে প্রাধান্য দিতে হবে।

৭. কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ইসলামী শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা : অহি-র জ্ঞানভিত্তিক শিক্ষাই হ’ল ইসলামী শিক্ষা। প্রাক-প্রাথমিক ও প্রথম শ্রেণী থেকে স্নাতকোত্তর শ্রেণী পর্যন্ত সকল পর্যায়ে ইসলামী শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা যরূরী। কেননা ইসলামী শিক্ষার পূর্ণ বিকাশ সাধনের মধ্যেই বাংলাদেশের উন্নতি ও অগ্রগতি নিহিত। এমনকি ইসলামী শিক্ষার মধ্যেই রয়েছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের নিশ্চিত গ্যারান্টি।

সমাপনী : সহশিক্ষা ব্যবস্থা ইসলামী পর্দা, শালীনতা ও চরিত্র গঠনের বিপরীতমুখী একটি ভঙ্গুর শিক্ষা ব্যবস্থা। এটি সমাজে যেনা-ব্যভিচার, বেহায়াপনা-বেলেল্লাপনা ও নৈতিক মূল্যবোধের চরম অবক্ষয়ের কারণ। মুসলিমপ্রধান দেশ হিসাবে আমাদের উচিত শিক্ষাব্যবস্থায় প্রকৃত ইসলামী মূল্যবোধ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা এবং সন্তানদের নিরাপদ ও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য একটি সম্পূর্ণ পৃথক ও ইসলামী শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করা। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন- আমীন!

---

১০. বুখারী হা/১০১।
১১. শিক্ষা ব্যবস্থা : প্রস্তাবনা সমূহ পৃ. ৩০।

তাক্বওয়ার ফযীলত ও গুরুত্ব

-মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদুদ*

‘তাক্বওয়া’ বা আল্লাহভীতি মুমিন জীবনের অন্যতম মহৎ গুণ। যে গুণের মাধ্যমে বান্দা দুনিয়াতে যাবতীয় পাপ কাজ থেকে বিরত থাকতে পারে। তেমনি তাক্বওয়াশীলতার জন্য পরকালে রয়েছে মহা পুরস্কার। প্রত্যেক নবী-রাসূল ও আল্লাহ্র সকল নেক বান্দা এ গুণের অধিকারী ছিলেন। বস্তুতঃ তাক্বওয়া ব্যতীত বান্দার কোন আমল আল্লাহ্র নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না। আলোচ্য প্রবন্ধে তাক্বওয়া সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

‘তাক্বওয়া’র পরিচয় : ‘তাক্বওয়া’ (التقوي) শব্দটি وقى মূল ধাতু থেকে উদ্গত একটি আরবী শব্দ। আভিধানিক অর্থ আল্লাহ্র ভয়, পরহেযগারিতা, দ্বীনদারী, ধার্মিকতা ইত্যাদি।[১] ব্যবহারিক অর্থে ‘কোন কিছুকে অন্য কিছুর দ্বারা তাড়িয়ে দেওয়া’। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘তোমরা নিজেদেরকে আগুন থেকে বাঁচাও এক টুকরা খেজুর দিয়ে হ’লেও’।[২] শরী‘আতের পরিভাষায় ‘তাক্বওয়া’ অর্থ হ’ল, ‘আল্লাহ্র ভয়ে নিষিদ্ধ বস্তু সমূহ হ’তে দূরে থেকে ইসলাম নির্দেশিত পথে চলা। অথবা যে কাজ করার কারণে মানুষকে আল্লাহ্র শাস্তির সম্মুখীন হ’তে হবে, তা থেকে নিজেকে রক্ষা করা। আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রাপ্ত করুণা, ভালবাসা, দো‘আ ও অনুগ্রহ হারানোর ভয় অন্তরে সদা জাগ্রত থাকার নাম ‘তাক্বওয়া’।[৩]

আলী ইবনু আবী ত্বালেব (রাঃ) তাক্বওয়ার পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন, التَّقْوَى هِيَ الْخَوْفُ مِنَ الْجَلِيْلِ وَالْعَمَلُ بِالتَّنْزِيْلِ وَالْقَنَاعَةُ بِالْقَلِيْلِ وَالاِسْتِعْدَادُ لِيَوْمِ الرَّحِيْلِ– ‘তাক্বওয়া’ হ’ল, মহান আল্লাহকে ভয় করে চলা, কুরআন অনুযায়ী আমল করা, অল্পে তুষ্ট থাকা এবং মৃত্যুর দিনের জন্য সদা প্রস্তুত থাকা’।[৪]

ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) একবার উবাই ইবনু কা‘ব (রাঃ)-কে বললেন, ‘আপনি তাক্বওয়া সম্পর্কে আমাকে বলুন’। জবাবে তিনি বললেন, ‘আপনি কি কখনো কাঁটা বিছানো পথে চলেছেন?’ ওমর (রাঃ) বললেন, ‘হ্যাঁ’। কা‘ব (রাঃ) বললেন, ‘সেখানে আপনি কিভাবে চলেছেন?’ ওমর (রাঃ) বললেন, ‘কাপড়-চোপড় গুটিয়ে অত্যন্ত সাবধানে চলেছি’। কা‘ব (রাঃ) বললেন, ‘ওটাই তো তাক্বওয়া’।[৫]

তাক্বওয়ার গুরুত্ব ও ফযীলত :

শরী‘আতে তাক্বওয়ার গুরুত্ব ও ফযীলত অপরিসীম। তাক্বওয়ার কারণে মানুষের আচরণ পরিশীলিত হয়, ভাষা মার্জিত হয়, কর্মকাণ্ড সুন্দর হয় এবং তার দ্বারা দেশ ও জাতি উপকৃত হয়। ফলে সে দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণ লাভ করে। তাক্বওয়ার গুরুত্বের কতিপয় দিক নিম্নে উল্লেখ করা হ’ল।-

(১) তাক্বওয়া অবলম্বন করা আল্লাহ্র নির্দেশ : তাক্বওয়া অবলম্বনের জন্য মহান আল্লাহ্র পক্ষ থেকে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলের প্রতি নির্দেশ রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللهَ ‘আর নিশ্চিতভাবে আমরা আদেশ করেছিলাম তোমাদের পূর্ববর্তী কিতাবধারীদের প্রতি এবং তোমাদের প্রতি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর’ (*নিসা ৪/১৩১*)। এ আয়াত মানবজাতির জন্য আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে পূর্বাপর সকল মানুষের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অছিয়ত। যুগে যুগে নবী-রাসূলগণ তাদের উম্মতদেরকে এ বিষয়ে অছিয়ত করেছেন’।[৬]

(২) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপদেশ হ’ল তাক্বওয়া অবলম্বন করা : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পক্ষ থেকে ছাহাবীদের প্রতি তাক্বওয়ার বিশেষ অছিয়ত ছিল। আতা ইবনে ইয়ামার (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) যখন মু‘আয (রাঃ)-কে ইয়ামানে পাঠান, তখন মু‘আয (রাঃ) বলেছিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমাকে কিছু অছিয়ত করুন। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, عليكَ بتقوى الله، ‘তোমার জন্য আবশ্যক হ’ল তাক্বওয়া অবলম্বন করা’।[৭] আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমি সফরে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেছি, অতএব আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বললেন, عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللهِ وَالتَّكْبِيرِ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ، ‘অবশ্যই তুমি আল্লাহভীতি অবলম্বন করবে এবং প্রতিটি উচ্চ জায়গায় যাওয়ার সময় তাকবীর ধ্বনি দিবে’।[৮]

এমনকি তিনি কোন সৈন্যদল প্রেরণের সময়ও তাক্বওয়া অবলম্বনের নির্দেশ দিতেন। সুলায়মান ইবনু বুরায়দা (রাঃ) হ’তে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا بَعَثَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْصَاهُ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ بِتَقْوَى اللهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا، ‘যখন কোন লোককে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কোন বাহিনীর আমীর করে পাঠাতেন তখন তাকে বিশেষ করে আল্লাহভীতির উপদেশ দিতেন এবং তার সাথের মুসলিমদের সাথে সৎ ও কল্যাণময় আচরণের নির্দেশ দিতেন’।[৯] এছাড়া ছাহাবীগণ উপদেশ চাইলেও তিনি তাক্বওয়ার উপদেশ দিতেন। ইরবায ইবনু সারিয়াহ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদিন ফজরের ছালাতের পর আমাদের দিকে ফিরে বসে

** তুলাগাঁও নোয়াপাড়া, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।*

১. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, মু‘জামুল ওয়াফী, পৃ. ৩১০।

২. বুখারী হা/১৪১৭, মুসলিম হা/১০১৬।

৩. ইসলামী বিশ্বকোষ, ১২শ খণ্ড (ঢাকা : ইফাবা ১৯৯২), পৃঃ ১০৭।

৪. শানক্বীত্বী, লাওয়ামি‘উদ দুরার, পৃঃ ১১০; কাওছারুল মা‘আনী আদ-দারারী, পৃঃ ৪০১; সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, পৃঃ ৪২১।

৫. আলাউদ্দীন আলী বিন মুহাম্মাদ আল-বাগদাদী, লুবাতুত তাবীল ফী মা‘আনিত তানযীল, ১ম খণ্ড (বৈরূত : দারুল ফিকর, ১৯৭৯ খৃঃ), পৃঃ ২৮।

৬. কুরআনুল কারীম (বঙ্গানুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর) মদীনা: বাদশাহ্ ফাহাদ কুরআন মুদ্রণ কমপ্লেক্স, ১/৪৮৯।

৭. সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩৩২০।

৮. তিরমিযী হা/৩৪৪৫; ইবনু মাজাহ হা/২৭৭১।

৯. মুসলিম হা/১৭৩১; তিরমিযী হা/১৪০৮।

মর্মস্পর্শী বক্তব্য দিলেন, যাতে (আমাদের) সকলের চোখ অশ্রুসজল হ'ল এবং অন্তর ভীত হ'ল। কোন একজন বলল, এ তো বিদায়ী নছীহত। হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আপনি আমাদেরকে আর কি উপদেশ দিচ্ছেন? তিনি বললেন, أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ 'আমি তোমাদেরকে আল্লাহকে ভয় করার এবং (নেতার আদেশ) শ্রবণ ও মান্য করার উপদেশ দিচ্ছি, যদিও সে (নেতা) হাবশী ক্রীতদাস হয়ে থাকে'।[১০]

(৩) তাক্বওয়া পূর্বসূরীদের অছিয়ত : নবী-রাসূলগণের পরে যুগে যুগে আল্লাহ্র সৎ বান্দাগণ তাক্বওয়ার অছিয়ত করতেন। আলী (রাঃ) বলেন, أوصيكم بتقوى الله في الغيب والشَّهادة، وكلمة الحقِّ في الرِّضا والغضب، والقصد في الغِنَى والفقر، والعدل في الصَّديق والعدو، والعمل في النَّشَاط والكسل، 'আমি তোমাদেরকে গোপনে ও প্রকাশ্যে আল্লাহকে ভয় করার, সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টি উভয় অবস্থায় সত্য কথা বলার, সচ্ছলতা ও অসচ্ছলতায় মধ্যপন্থা অবলম্বন করার, শত্রু-মিত্র উভয়ের প্রতি ন্যায়বিচার করার এবং উদ্যম ও অলসতা উভয় অবস্থায় কর্মনিষ্ঠ হওয়ার উপদেশ দিচ্ছি'।[১১]

আতা ইবনু আবী রাবাহ (রহঃ) বলেন, ওয়ালীদ ইবনু উবাদাহ ইবনে ছামেতকে মৃত্যুকালে তার পিতা উপদেশ দিয়ে বলেন, يا بني، أوصيك بتقوى الله، واعلم أنك لن تتقي الله عز وجل حتى تؤمن بالله، واعلم أنك لن تؤمن بالله ولن تطعم طعم حقيقة الإيمان، ولن تبلغ العلم، حتى تؤمن بالله وتؤمن بالقدر كله خيره وشره. 'হে বৎস! আমি তোমাকে আল্লাহভীতির উপদেশ দিচ্ছি। আর জেনে রাখ, তুমি ততক্ষণ পর্যন্ত তাক্বওয়া অর্জন করতে পারবে না, যতক্ষণ না আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনয়ন করবে। আর ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনতে ও ঈমানের প্রকৃত স্বাদ আস্বাদন করতে পারবে না এবং জ্ঞান অর্জন করতে পারবে না, যতক্ষণ না তুমি আল্লাহ্র প্রতি ও তাক্বদীরের ভাল-মন্দের প্রতি পূর্ণরূপে ঈমান আনবে'।[১২]

আব্বাসীয় খলীফা আবু জা'ফর আল-মানছূর স্বীয় সন্তান মাহদীকে উপদেশ দিয়ে বলেন, إِنَّ الْخَلِيفَةَ لاَ يُصْلِحُهُ إِلاَّ التَّقْوَى، وَالسُّلْطَانَ لاَ يُصْلِحُهُ إِلاَّ الطَّاعَةُ. وَالرَّعِيَّةَ لاَ يُصْلِحُهَا إِلاَّ الْعَدْلُ، وَأَوْلَى النَّاسِ بِالْعَفْوِ أَقْدَرُهُمْ عَلَى الْعُقُوبَةِ، وَأَنْقَصُ النَّاسِ عَقْلاً مَنْ ظَلَمَ مَنْ هُوَ دُونَهُ، 'তাক্বওয়া ব্যতীত খলীফা সফলতা অর্জন করতে পারে না, আনুগত্য ব্যতীত বাদশাহ সফল হয় না, ন্যায়পরায়ণতা ব্যতীত কোন কিছু জনসাধারণকে ঠিক করতে পারে না। ঐ ব্যক্তি ক্ষমা করার অধিক যোগ্য, যিনি শাস্তি দানে অধিক যোগ্য। সবচেয়ে জ্ঞানহীন ঐ ব্যক্তি, যে তার অধঃস্তনের উপর যুলুম করে'।[১৩]

আলী ইবনুল মাদীনী (রহঃ) বলেন, আমি ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ)-কে কিছু উপদেশ দিতে বললে তিনি বললেন, اجْعَلِ التَّقْوَى زَادَكَ، وانْصُبِ الآخِرَةَ أَمَامَكَ، 'তুমি তাক্বওয়াকে সম্বল হিসাবে গ্রহণ কর এবং আখেরাতকে তোমার সম্মুখে স্থাপন কর'।[১৪]

(৪) জীবনের সকল ক্ষেত্রে তাক্বওয়া অবলম্বন করা ওয়াজিব : তাক্বওয়া মানুষকে পার্থিব জীবনের নানা জটিলতা থেকে মুক্ত করে, সংকট দূর করে, জীবিকা বৃদ্ধি করে, তাই জীবনের সর্বক্ষেত্রে তাক্বওয়া অবলম্বন করা যরূরী। আবূ যার (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে বলেছেন, اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ 'তুমি যেখানেই থাক আল্লাহকে ভয় কর'।[১৫] ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, والتقوى واجبة على الخلق، وقد أمر الله بها ووصى بها في غير موضع، وذم من لا يتقي الله ومن استغنى عن تقواه، توعده، 'সৃষ্টির উপরে তাক্বওয়া অর্জন করা ওয়াজিব। যে ব্যাপারে আল্লাহ একাধিক স্থানে নির্দেশ ও উপদেশ দিয়েছেন। যে ব্যক্তি তাক্বওয়া অর্জন করে না আল্লাহ তার নিন্দা করেছেন। আর যে তাক্বওয়া অর্জন থেকে অমুখাপেক্ষী হয়, তাকে শাস্তি দেওয়া হয়'।[১৬]

(৫) মুত্তাক্বী ছাড়া আমল কবুল করা হয় না : আমল কবুলের অন্যতম শর্ত হ'ল আল্লাহকে ভয় করা ও তাঁর জন্যই আমল করা। মহান আল্লাহ আদম সন্তানদের কুরবানী সম্পর্কে বলেন, إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ মুত্তাক্বীদের নিকট থেকে কবুল করেন' *(মায়েদাহ ৫/২৭)*। আলী (রাঃ) বলেন, كونوا لقبول العمل أشد اهتماما منكم بالعمل، فإنّه لن يقلّ عمل مع التّقوى، وكيف يقلّ عمل متقبّل؟ 'তোমরা আমল করার চেয়ে আমল কবুল হওয়ার ব্যাপারে অধিক গুরুত্ব দাও। কেননা তাক্বওয়ার সাথে সম্পাদিত কোন আমল অল্প হয় না, তাহ'লে কবুলযোগ্য আমল কিভাবে অল্প হবে'?[১৭]

---

১০. *তিরমিযী হা/২৬৭৬; ইবনু মাজাহ হা/৪২।*
১১. *ছা'আলাবী, আল-ই'জায ওয়াল ঈ'জায, পৃ. ৪৩।*
১২. *ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, তাক্বওয়া, পৃ. ৪৫-৪৬; গৃহীত: লালকাঈ ই'তিক্বাদ আহলিস সুন্নাহ, ২/২১৮; ফিরইয়াবী, আল-ক্বদর, পৃঃ ৪২৫; আবুবকর মুহাম্মদ ইবনুল হাসান আল-আজরী, আশ-শরী'আহ ৪/৮৯।*
১৩. *ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১০/১২৬।*
১৪. *ইবনুল জাওযী, মানাক্বিবুল ইমাম আহমাদ, পৃঃ ২০০।*
১৫. *তিরমিযী হা/১৯৮৭; আলবানী: ছহীহ আত-তারগীব হা/২৬৫৫।*
১৬. *শরহু উমদাতুল আহকাম ৩/৬২৭ পৃ.। গৃহীত. ড. মুহাম্মদ কাবীরুল ইসলাম, তাক্বওয়া, পৃ. ৯।*
১৭. *হিলয়াতুল আওলিয়া ১/৭৫; সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ১১/২৯৯।*

(৬) তাক্বওয়া হিদায়াতের পথ দেখায় : মুমিনের অন্যতম চাওয়া-পাওয়া হচ্ছে ছিরাতে মুস্তাক্বীম তথা সরল পথ *(ফাতিহা ১/৫)*। আর তাক্বওয়া সরল পথে চলা সহজ করে দেয়। মহান আল্লাহ বলেন, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، 'অতঃপর যে ব্যক্তি দান করে ও তাক্বওয়া অবলম্বন করে এবং উত্তম বিষয়কে সত্য বলে বিশ্বাস করে, অচিরেই আমরা তাকে সরল পথের জন্য সহজ করে দেব' *(লায়েল ৯২/৫-৭)*। যায়েদ বিন আসলাম বলেন, 'সরল পথ' বলতে জান্নাতের পথকে বুঝানো হয়েছে।[১৮] আর মহাগ্রন্থ আল-কুরআন থেকে কেবল তাক্বওয়াশীলরাই হেদায়াত লাভ করতে পারে। মহান আল্লাহ বলেন, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ 'এই কিতাব, যাতে কোনই সন্দেহ নেই। যা আল্লাহভীরুদের জন্য পথ প্রদর্শক' *(বাক্বারাহ ২/২)*।

(৭) কুরআন কেবল তাক্বওয়াশীলদের জন্য উপদেশ গ্রন্থ : কুরআন উপদেশ গ্রন্থ *(ইউনুস ১০/৫৭; হিজর ১৫/৯)*। আর এই উপদেশ ঐ ব্যক্তির জন্য, যার মধ্যে অনুধাবন করার মত অন্তর রয়েছে এবং যে মনোযোগ দিয়ে কথা শোনে *(ক্বাফ ৫০/৩৭)*। আর কুরআন মুত্তাক্বীর জন্য উপদেশ গ্রন্থ। মহান আল্লাহ বলেন, وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ 'নিশ্চয়ই এটি আল্লাহভীরুদের জন্য উপদেশ গ্রন্থ' *(হাক্বাহ ৬৯/৪৮)*। ইমাম তাবারী বলেন, 'যারা ফরয আদায়ের মাধ্যমে ও পাপ থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে আল্লাহকে ভয় করে, কুরআন তাদের জন্যই উপদেশ গ্রন্থ'।[১৯]

(৮) তাক্বওয়া সকল সমস্যার সমাধান করে : আল্লাহভীতি অর্জন করলে মুত্তাক্বীর সকল সমস্যা আল্লাহ সমাধান করে দেন। মহান আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ 'বস্তুতঃ যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য উপায় বের করে দেন। আর তিনি তাকে তার ধারণাতীত উৎস থেকে রিযিক প্রদান করে থাকেন' *(তালাক ৬৫/২-৩)*।

(৯) তাক্বওয়া পাপ থেকে বাঁচিয়ে রাখে : দুনিয়ার কোন আইন, কোন প্রশাসন মানুষকে পাপ থেকে পরিপূর্ণরূপে বাঁচাতে পারে না। বরং আল্লাহ্র যথাযথ ভয়ই মানুষকে পাপ থেকে বিরত রাখতে পারে। পূর্ব যুগে পাহাড়ের গুহায় আটকে পড়া তিন যুবকের একজন তার প্রেমিকার সাথে অন্যায় কাজে লিপ্ত হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে মেয়েটি বলেছিল, يَا عَبْدَ اللهِ اتَّقِ اللهَ، 'হে আল্লাহ্র বান্দা! আল্লাহকে ভয় কর'। এই কথায় যুবকটি আল্লাহকে ভয় করে এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত হয়।[২০]

(১০) তাক্বওয়াশীলের কাজ আল্লাহ সহজ করে দেন : আল্লাভীরু ব্যক্তির জন্য দুনিয়ার সকল কিছু সহজ হয়ে যায়। মহান আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا 'যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য কর্ম সহজ করে দেন' *(তালাক ৬৫/৪)*। মানুষের মহান সফলতা জান্নাত *(আলে ইমরান ৩/১৮৫)* লাভের জন্য ছিরাতে মুস্তাক্বীম চলার পথও সহজ করে দেন। মহান আল্লাহ বলেন, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، 'অতঃপর যে ব্যক্তি দান করে ও আল্লাহভীরু হয় এবং উত্তম বিষয়কে সত্য বলে বিশ্বাস করে, অচিরেই আমরা তাকে সরল পথের জন্য সহজ করে দেব' *(লায়েল ৯২/৫-৭)*।

(১১) তাক্বওয়া কর্মসমূহকে সংশোধন করে : তাক্বওয়াশীল ব্যক্তির কর্মকাণ্ড আল্লাহ সংশোধন করে দেন। মহান আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا– 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল। তাহ'লে তিনি তোমাদের কর্মসমূহকে সংশোধন করে দিবেন ও তোমাদের পাপ সমূহ ক্ষমা করবেন' *(আহযাব ৩৩/৭০-৭১)*।

(১২) তাক্বওয়া উপকারী জ্ঞান লাভের মাধ্যম : পরহেযগার ব্যক্তিকে আল্লাহ উপকারী জ্ঞান দান করেন। মহান আল্লাহ বলেন, وَاتَّقُوا اللهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللهُ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، 'তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহ তোমাদেরকে (বিধান সমূহ) শিক্ষা দিচ্ছেন। বস্তুতঃ আল্লাহ সকল বিষয়ে অবগত' *(বাক্বারাহ ২/২৮২)*।

(১৩) তাক্বওয়াশীলকে আল্লাহ ভালবাসেন : মুত্তাক্বীকে আল্লাহ ভালবাসেন। মহান আল্লাহ বলেন, بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ 'হ্যাঁ, যে ব্যক্তি তার অঙ্গীকার পূর্ণ করে এবং আল্লাহকে ভয় করে, সে অবস্থায় আল্লাহ অবশ্যই মুত্তাক্বীদের ভালবাসেন' *(আলে ইমরান ৩/৭৬)*। অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ মুত্তাক্বীকে ভালবাসেন' *(তওবা ৯/৪, ৭)*। সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ الْغَنِيَّ الْخَفِيَّ، 'আল্লাহ তা'আলা মুত্তাক্বী, আত্মনির্ভরশীল ও লোকালয় হ'তে নির্জনে বাসকারী বান্দাকে ভালোবাসেন'।[২১]

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেছেন, جمع النبى بَين تقوى الله وَحسن الْخلق لِأَن تقوى الله يصلح مَا بَين العَبْد وَبَين ربه وَحسن الْخلق يصلح مَا بَينه وَبَين خلقه فتقوى الله توجب

---

১৮. *তাফসীরে ইবনে কাছীর, সূরা লায়েল ৭ নং আয়াতের তাফসীর দ্র.।*
১৯. *তাফসীরে ত্বাবারী ২৩/৫৯৫, হাক্কাহ ৪৮ আয়াতের ব্যাখ্যা দ্র:।*
২০. *বুখারী হা/২৩৩৩, ৩৪৬৫।*

২১. *মুসলিম হা/২৯৬৫।*

لَهُ محبَّة الله وَحسن الْخلق يَدْعُو إِلَى محبته، ‘নবী করীম (ছাঃ) আল্লাহভীতি ও উত্তম চরিত্রের মাঝে সমন্বয় করেছেন। কেননা তাক্বওয়া বান্দা ও তার রবের মাঝে সম্পর্ক দৃঢ় করে। আর উত্তম চরিত্র বান্দা ও সৃষ্টিকুলের মাঝে সম্পর্কের বন্ধন মযবূত করে। ফলে তাক্বওয়ার মাধ্যমে আল্লাহ্র ভালবাসা অর্জিত হয়। আর উত্তম চরিত্র তাকে সৃষ্টির ভালবাসার দিকে টেনে নিয়ে যায়’।[22]

(১৪) আল্লাহ তাক্বওয়াশীলদের সাথে থাকেন : আল্লাহ মুত্তাক্বীদের সাথে থাকেন বলে কুরআনের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখিত হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ‘আর জেনে রেখ যে, আল্লাহ মুত্তাক্বীদের সঙ্গে আছেন’ *(বাক্বারাহ ২/১৯৪; তওবা ৯/১২৩)*। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, إِنَّ اللهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ، ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের সঙ্গে থাকেন যারা আল্লাহভীরুতা অবলম্বন করে এবং যারা সৎকর্মপরায়ণ’ *(নাহল ১৬/১২৮)*।

আল্লাহ সাথে থাকার অর্থ হ’ল, আল্লাহ বান্দাদের সাথে তাদের সাহায্য, সমর্থন, সহযোগিতা, তাওফীক্ব ও হিদায়াত দানের মাধ্যমে থাকেন। যেমন হাদীছে কুদসীতে আল্লাহ বলেন, وَلاَيَزَالُ عَبْدِىْ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِىْ يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِىْ يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِى يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِى يَمْشِى بِهَا، ‘বান্দা সর্বদা নফল ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ্র নৈকট্য অর্জন করতে থাকলে অবশেষে আমি তাকে ভালবেসে ফেলি। তখন আমি তার কান হয়ে যাই, যার মাধ্যমে সে শুনে। তার চোখ হয়ে যাই, যার মাধ্যমে সে দেখে। তার হাত হয়ে যাই, যার মাধ্যমে সে ধারণ করে। তার পা হয়ে যাই যার মাধ্যমে সে হাটে’।[23] সাথে থাকা বলতে সত্তাগতভাবে সাথে থাকা নয়। যেমন আমরা অনেকে বলে থাকি, তুমি এ কাজ কর আমি তোমার সাথে আছি। এখানে সাথে থাকা অর্থ হ’ল সমর্থন করা, সাহায্য ও সহযোগিতা করা ইত্যাদি।

এছাড়া আরবরা বলে থাকে اَلْقَمَرُ مَعَنَا ‘চন্দ্র আমাদের সাথে’। অথচ চন্দ্র থাকে আকাশে আর মানুষ থাকে যমীনে। আমরা সফরের দো‘আয় বলে থাকি, اَللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِى الْأَهْلِ، ‘হে আল্লাহ আপনি আমাদের সফরের সাথী ও পরিবারের প্রতিনিধি’।[24]

(১৫) তাক্বওয়া বান্দার পাপ মোচন করে : তাক্বওয়া বা আল্লাহকে ভয় করা একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত এবং বান্দার পাপ মোচনের অন্যতম মাধ্যম। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، ‘বস্তুতঃ যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার পাপসমূহ মোচন করেন ও তাকে মহা পুরস্কারে ভূষিত করেন’ *(তালাক ৬৫/৫)*। অন্যত্র তিনি বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، ‘হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা আল্লাহভীরু হও, তাহ’লে তিনি তোমাদেরকে ‘ফুরক্বান’ তথা সত্য-মিথ্যা পার্থক্য করার শক্তি দান করবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ মোচন করবেন ও তোমাদের ক্ষমা করে দিবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল’ *(আনফাল ৮/২৯)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، ‘যদি আহলে কিতাবগণ ঈমান আনতো ও আল্লাহভীতি অবলম্বন করত, তাহ’লে আমরা অবশ্যই তাদের সকল পাপ মোচন করে দিতাম এবং তাদেরকে নে‘মতপূর্ণ জান্নাতে প্রবেশ করাতাম’ *(মায়েদাহ ৫/৬৫)*। এছাড়া আল্লাহ সূরা আহযাবের ৩৫নং আয়াতে আট শ্রেণীর লোককে ক্ষমা করার ঘোষণা দিয়েছেন তাদের একজন হ’ল আল্লাহভীরু পুরুষ ও নারী।

(১৬) তাক্বওয়া বরকত লাভের মাধ্যম : প্রত্যেক কল্যাণ ও বরকত আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে। তিনি কতক স্থানে, কতক সময়ে, কতক বস্তুতে ও কতক কাজে বরকত রেখেছেন। তাক্বওয়া বরকত লাভের অন্যতম মাধ্যম। মহান আল্লাহ বলেন, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ‘অথচ জনপদের অধিবাসীরা যদি বিশ্বাস স্থাপন করত ও আল্লাহভীরু হ’ত, তাহ’লে আমরা তাদের উপর আকাশ ও পৃথিবীর বরকতের দুয়ারসমূহ খুলে দিতাম’ *(আ‘রাফ ৭/৯৬)*।

(১৭) আল্লাহ্র রহমত লাভ : বান্দা আল্লাহ্র রহমতের মুখাপেক্ষী। আল্লাহ্র রহমত প্রত্যেক বস্তুকে পরিব্যাপ্ত করে রেখেছে *(আ‘রাফ ৭/১৫৬)*। আর তাঁর রহমত তাঁর গযব অপেক্ষা অগ্রগামী।[25] আল্লাহ্র রহমত পাওয়ার অন্যতম মাধ্যম হ’ল তাক্বওয়া। মহান আল্লাহ বলেন, وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، ‘আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও’ *(হুজুরাত ৪৯/১০)*।

(১৮) শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে মুক্তি : শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু *(আ‘রাফ ৭/২২; ফাতির /৬)*। শয়তান মানুষের মনে বিভিন্নভাবে কুমন্ত্রণা দিয়ে থাকে। আর কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচার অন্যতম পথ হ’ল তাক্বওয়া। মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوْا فَإِذَا هُمْ

---

২২. ইবনুল ক্বাইয়িম, আল-ফাওয়াইদ, পৃ. ৫৪।
২৩. বুখারী, হা/৬৫০২; মিশকাত হা/২২৬৬।
২৪. মুসলিম, রিয়াযুছ ছালেহীন হা/৯৭২।
২৫. বুখারী হা/৭৮০৪; মুসলিম হা/৭১৪৫।

সূচীপত্র

مُبْصِرُوْنَ، ‘নিশ্চয়ই যারা আল্লাহকে ভয় করে, শয়তানের কুমন্ত্রণা স্পর্শ করার সাথে সাথে তারা সচেতন হয়ে যায় এবং তাদের জ্ঞানচক্ষু খুলে যায়’ *(আ‘রাফ ৭/২০১)*।

(১৯) আল্লাহ্র সাহায্য লাভ : আল্লাহ্র সাহায্য লাভের অন্যতম মাধ্যম হ’ল তাক্বওয়া। বদর যুদ্ধের অবস্থা বর্ণনা করে মহান আল্লাহ বলেন, بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ، ‘হ্যাঁ, যদি তোমরা ধৈর্যধারণ কর ও আল্লাহভীরু হও এবং প্রতিপক্ষ তোমাদের উপর হঠাৎ আপতিত হয়, তাহ’লে তোমাদের পালনকর্তা পাঁচ হাযার চিহ্নিত ফেরেশতা দিয়ে তোমাদের সাহায্য করবেন’ *(আলে ইমরান ৩/১২৫)*।

(২০) তাক্বওয়াশীলরাই সম্মানী : আল্লাহভীতি দুনিয়া ও আখেরাতে সম্মানিত হওয়ার মাধ্যম। যে ব্যক্তি যতবেশী আল্লাহভীরু তিনি আল্লাহ্র নিকটে তত বেশী সম্মানিত। মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ ‘নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্র নিকট সর্বাধিক সম্মানিত ঐ ব্যক্তি, যে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক আল্লাহভীরু’ *(হুজুরাত ৪৯/১৩)*। উকবাহ্ ইবনু আমের (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘তোমাদের বংশ পরিচয় এমন জিনিস নয় যে, তোমরা এর কারণে অন্যকে মন্দ বলবে। তোমরা সবাই এক আদমের সন্তান। পাল্লার দু’দিক সমান। কোন একদিক পূর্ণ করে নিতে পারো না। দ্বীন ও আল্লাহভীতি ছাড়া তোমাদের কারো ওপর কারো মর্যাদা নেই।[২৬] আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ قَالَ أَتْقَاهُمْ، ‘হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! মানুষের মাঝে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি কে? তিনি বললেন, তাদের মধ্যে যে সবচেয়ে অধিক মুত্তাক্বী’।[২৭] বিদায় হজ্জের ভাষণেও এই মর্মে বর্ণিত হয়েছে, জাবের বিন আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আইয়ামে তাশরীক্বের মধ্যবর্তী দিনে আমাদের উদ্দেশ্যে বিদায়ী ভাষণ দিয়ে বলেন, يا أَيُّها الناسُ إنَّ رَبَّكمْ واحِدٌ ألا لا فضلَ لِعربِيٍّ على عجَمِيٍّ ولا لِعجَمِيٍّ على عربِيٍّ ولا لأحمَرَ على أسْوَدَ ولا لأسودَ على أحمَرَ إلَّا بالتَّقوَى إنَّ أكرَمكمْ عند اللهِ أتْقاكُمْ، ‘হে জনগণ! নিশ্চয়ই তোমাদের পালনকর্তা মাত্র একজন। তোমাদের পিতাও মাত্র একজন। মনে রেখ! আরবের উপর অনারবের, অনারবের উপর আরবের, লালের উপর কালোর এবং কালোর উপর লালের কোনরূপ প্রাধান্য নেই তাক্বওয়া ব্যতীত। নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্র নিকটে সর্বাধিক সম্মানিত সেই ব্যক্তি, যে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক তাক্বওয়াশীল’।[২৮] সামুরাহ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত অন্য হাদীছে নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, الْحَسَبُ الْمَالُ وَالْكَرَمُ التَّقْوَى، ‘ধন-সম্পদ হ’ল আভিজাত্যের প্রতীক এবং তাক্বওয়া হ’ল সম্মান ও মর্যাদার প্রতীক।[২৯]

আবুবকর ছিদ্দীক্ব (রাঃ) বলেন, وجدنا الكرم في التقوى والغنى في اليقين والشرف في التواضع، ‘আমরা সম্মান পেয়েছি তাক্বওয়ার মাঝে, স্বচ্ছলতা পেয়েছি দৃঢ় ঈমানের মাঝে এবং মর্যাদা পেয়েছি বিনয়ের মাঝে’।[৩০] ইবরাহীম বিন শায়বান (রহঃ) বলেন, الشَّرْفُ فِي التَّوَاضُعِ وَالْعِزُّ فِي التَّقْوَى وَالْحُرِّيَّةُ فِي الْقَنَاعَةِ، ‘মর্যাদা রয়েছে বিনয়ের মধ্যে, সম্মান রয়েছে তাক্বওয়ার মধ্যে এবং স্বাধীনতা রয়েছে অল্পে তুষ্টির মধ্যে’।[৩১]

(২১) তাক্বওয়াশীলরা রাসূল (ছাঃ)-এর বন্ধু ও নিকটতর : আল্লাহভীরু ব্যক্তিরা যেমন আল্লাহ্র কাছে সম্মানিত, মানুষের কাছে নন্দিত বরিত তেমনি তারা রাসূল (ছাঃ)-এরও নিকটতর লোক। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِيَ الْمُتَّقُونَ، مَنْ كانُوا وحيْثُ كانُوا، ‘আমার সবচেয়ে কাছের লোক তারাই যারা তাক্বওয়াশীল, তারা যেই হোক না কেন এবং যেখানেই থাকুক না কেন’।[৩২] আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إنَّ أوليائي يومَ القيامةِ المتقونَ وإن كان نَسَبٌ أقربَ من نَسَبٍ، ‘আমার বন্ধু হবে ক্বিয়ামতের দিন কেবল মুত্তাক্বীগণ। যদিও এক বংশ অন্য বংশের চাইতে নিকটবর্তী হবে’।[৩৩]

(২২) তাক্বওয়াশীলকে সত্য-মিথ্যার প্রার্থক্য করার ক্ষমতা দিবেন : কুরআন সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী *(বাক্বারাহ ২/১৮৫)* যা ন্যায়-অন্যায়, হালাল-হারামের মধ্যে পার্থক্য করে। আর তাক্বওয়াশীলকে আল্লাহ তা‘আলা এই পার্থক্যকারী শক্তি দান করেন। মহান আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، ‘হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা আল্লাহভীরু হও, তাহ’লে তিনি তোমাদের সত্য-মিথ্যা পার্থক্য করার শক্তি দান করবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ মোচন করবেন ও তোমাদের ক্ষমা করে দিবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল’ *(আনফাল ৮/২৯)*।

---

২৬. আহমাদ ৪/১৪৫; ‘বায়হাক্বী, শু‘আবুল ঈমান ৫১৪৬; ছহীহাহ ১০৩৮; মিশকাত হা/৪৯১০।
২৭. বুখারী হা/৩৩৫৩।
২৮. বায়হাক্বী, শু‘আবুল ঈমান হা/৫১৩৭; ছহীহাহ হা/২৭০০।
২৯. তিরমিযী হা/৩২৭১; ইবনু মাজাহ হা/৪২১৯; ইরওয়া হা/১৮৭০।
৩০. গাযালী, ইহইয়াউ ‘উলূমিদ্দীন ৩/৩৪৩।
৩১. ইবনুল ক্বাইয়িম, মাদারিজুস সালেকীন ২/৩৩০।
৩২. আহমাদ হা/২২০৫২; ছহীহুল জামে হা/২০১২।
৩৩. আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৮৯৭; ত্বাবরাণী কাবীর হা/৪৫৪৪।

(২৩) তাক্বওয়া সকল কল্যাণের মূল : পার্থিব জীবনে যাবতীয় কল্যাণের চাবিকাঠি হচ্ছে তাক্বওয়া অর্জন করা। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, এক লোক তার নিকট এসে বলল, আমাকে উপদেশ দিন। তখন তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে এ বিষয়ে তোমার পূর্বে বলেছিলাম। তখন তিনি বললেন, হে আবু সাঈদ! أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللهِ فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ شَيْءٍ، 'আমি তোমাকে আল্লাহভীরুতার উপদেশ দিচ্ছি। নিশ্চয়ই তাক্বওয়াই হচ্ছে সব কিছুর মূল'।[৩৪]

(২৪) তাক্বওয়াশীলরাই বন্ধু হওয়ার যোগ্য : বন্ধুর চরিত্রেই মানুষ প্রভাবিত হয়ে উঠে।[৩৫] তাই তাক্বওয়াশীলরাই বন্ধু হওয়ার যোগ্য। নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, لَا تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا، وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ، 'তুমি মুমিন ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারো সঙ্গী হবে না এবং তোমার খাদ্য যেন তাক্বওয়াশীল লোক ব্যতীত কেউ না খায়'।[৩৬]

ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) এক ব্যক্তিকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন, لَا تَعْتَرِضْ لِمَا لَا يَعْنِيكَ وَاعْتَزِلْ عَدُوَّكَ وَاحْذَرْ صَدِيقَكَ إِلَّا الْأَمِينَ مِنَ الْأَقْوَامِ، وَلَا أَمِينٌ إِلَّا مَنْ خَشِيَ اللهَ، وَلَا تَصْحَبْ الْفَاجِرَ فَيُعَلِّمْكَ مِنْ فُجُورِهِ، وَلَا تُطْلِعْهُ عَلَى سِرِّكَ وَاسْتَشِرْ فِي أَمْرِكَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ اللهَ، 'তুমি অনর্থক কোন কিছুতে জড়াবে না। তোমার শত্রুকে এড়িয়ে চলবে। বিশ্বস্ত ব্যক্তি ছাড়া কাউকে বন্ধু বানানোর ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করবে। আর তাক্বওয়াশীল ছাড়া কেউই বিশ্বস্ত নয়। তুমি পাপিষ্ঠ ব্যক্তির সাথে চলাফেরা করবে না। অন্যথা সে তোমাকে পাপের বিষয় শিক্ষা দিবে এবং তাকে তোমার গোপনীয় বিষয় জানাবে না। আর যারা আল্লাহকে ভয় করে তাদের সাথে তোমার বিষয়ে পরামর্শ করবে'।[৩৭]

(২৫) তাক্বওয়ার কাজে সহযোগিতা করা আল্লাহ্র নির্দেশ : তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতির কাজে সহযোগিতা করার জন্য মহান আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ 'তোমরা সৎকর্ম ও আল্লাহভীতির কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা কর এবং পাপ ও সীমালংঘনের কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো না। আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠোর শাস্তি দানকারী' *(মায়েদাহ ৫/২)*।

(২৬) তাক্বওয়ার পোষাকই সর্বোত্তম : মানুষের লজ্জাস্থান ঢেকে রেখে তাদের ইয্যত-আব্রু রক্ষা করার জন্য মহান আল্লাহ পোষাক নাযিল করেন। তবে তিনি তাক্বওয়ার পোষাককে উত্তম বলেছেন। মহান আল্লাহ বলেন, يَابَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، 'হে আদম সন্তান! আমরা তোমাদের উপর পোষাক অবতীর্ণ করেছি, যা তোমাদের লজ্জাস্থান সমূহকে আবৃত করে এবং অবতীর্ণ করেছি বেশভূষার উপকরণ সমূহ। তবে আল্লাহভীতির পোষাকই সর্বোত্তম। এটি আল্লাহ্র নিদর্শন সমূহের অন্যতম। যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে' *(আ'রাফ ৭/২৬)*। ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন, خير الدنيا والآخرة في خمس خصال غنى النفس وكف الأذى وكسب الحلال ولباس التقوى والثقة بالله عز وجل على كل حال- 'দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ পাঁচটি বিষয়ে নিহিত থাকে। (১) মনের প্রাচুর্য (২) কাউকে কষ্ট না দেওয়া (৩) হালাল উপার্জন (৪) তাক্বওয়ার পোষাক এবং (৫) সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র উপর ভরসা করা'।[৩৮]

(২৭) তাক্বওয়া বান্দার সর্বোত্তম পাথেয় : হজ্জের সফরের জন্য পাথেয় সঙ্গে নেওয়ার নির্দেশ দানের পর তাক্বওয়ার পাথেয় নেওয়ার নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، 'আর তোমরা পাথেয় সঙ্গে নাও। নিশ্চয়ই সর্বোত্তম পাথেয় হ'ল তাক্বওয়া' *(বাক্বারাহ ২/১৯৭)*। আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ)-এর কাছে এক লোক এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমি সফরে যাওয়ার ইচ্ছা করেছি। সুতরাং আপনি আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বললেন, زَوَّدَكَ اللهُ التَّقْوَى 'আল্লাহ তা'আলা তোমাকে তাক্বওয়ার পাথেয় দান করুন'। সে বলল, আরো বেশী দিন। তিনি বললেন, তোমার গুনাহ আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করুন। সে বলল, আমার মাতা-পিতা আপনার প্রতি উৎসর্গ হোক! আমাকে আরো বেশী দান করুন। তিনি বললেন, তিনি তোমার জন্য মঙ্গলকে সহজতর করুন, তুমি যেখানেই থাক'।[৩৯]

(২৮) তাক্বওয়াশীলরা আল্লাহ্র বন্ধু : মানুষ আল্লাহ্র সৃষ্টি। মহান আল্লাহ স্রষ্টা হয়েও মানুষের মধ্যে মুত্তাক্বীদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেন। আল্লাহ বলেন, وَاللهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ 'আর আল্লাহ হ'লেন মুত্তাক্বীদের বন্ধু' *(জাছিয়া ৪৫/১৯)*। আল্লাহ্র বন্ধুদের পরকালীন জীবনে ভীতিহীন ও চিন্তামুক্ত অবস্থানের বিবরণ দিয়ে তিনি বলেন, أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، 'মনে রেখ (আখেরাতে) আল্লাহ্র বন্ধুদের কোন ভয় নেই এবং তারা

৩৪. আহমাদ হা/১১৭৭৪; ছহীহাহ হা/৫৫৫; ছহীহুল জামে' হা/২৫৪৩।
৩৫. বুখারী হা/২১০১, মুসলিম হা/২৬২৮।
৩৬. তিরমিযী হা/২৩৯৫; আবূদাঊদ হা/৪৮৩২; ছহীহুত তারগীব হা/৩০৩৬।
৩৭. মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/৩৪৪৫০, সনদ হাসান, তাহক্বীক্ব : আব্দুস সালাম বিন মুহসিন।
৩৮. ইমাম নববী, বুস্তানুল 'আরেফীন, পৃ. ৩১।
৩৯. তিরমিযী হা/৩৪৪৪; ইবনু খুযাইমা হা/২৫৩২।

চিন্তান্বিত হবে না। যারা ঈমান আনে ও সর্বদা আল্লাহকে ভয় করে' *(ইউনুস ১০/৬২-৬৩)*।

(২৯) তাক্বওয়াশীলরা সর্বোত্তম : যারা আল্লাহকে ভয় করে তারা নম্র-ভদ্র, সুন্দর ভাষা ব্যবহারকারী হয়। তারা কোন মানুষের উপরে যুলুম করে না। কারো সম্পদ আত্মসাৎ করে না। মোটকথা তারা হয় সর্বোত্তম মানুষ। আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলা হ'ল, কোন ব্যক্তি সর্বোত্তম? তিনি বলেন, كُلُّ مَخْمُومِ الْقَلْبِ صَدُوقِ اللِّسَانِ. قَالُوا صَدُوقُ اللِّسَانِ نَعْرِفُهُ فَمَا مَخْمُومُ الْقَلْبِ قَالَ هُوَ التَّقِيُّ النَّقِيُّ لاَ إِثْمَ فِيهِ وَلاَ بَغْىَ وَلاَ غِلَّ وَلاَ حَسَدَ، 'প্রত্যেক বিশুদ্ধ অন্তরের অধিকারী সত্যভাষী ব্যক্তি। তারা বলেন, সত্যভাষীকে তো আমরা চিনি, কিন্তু বিশুদ্ধ অন্তরের ব্যক্তি কে? তিনি বলেন, সে হ'ল তাক্বওয়াশীল, পূত-পবিত্র নিষ্কলুষ চরিত্রের মানুষ যার কোন গুনাহ নেই, নেই কোন দুশমনি, হিংসা-বিদ্বেষ, আত্মহমিকা ও কপটতা'।[৪০]

(৩০) ক্ষমতা লাভের জন্য তাক্বওয়ার প্রয়োজন : দুনিয়াতে আল্লাহ মুমিন ও নেক আমলকারীদেরকে যেমন খিলাফত দান করবেন *(নূর ২৪/৫৫)* তেমনি তাক্বওয়াশীলকেও প্রতিষ্ঠা দান করবেন। মহান আল্লাহ বলেন, وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ 'তাদের পরে আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে দেশে প্রতিষ্ঠিত করব। এটা তাদের জন্য যারা আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়াকে এবং আমার শাস্তিকে ভয় পায়' *(ইব্রাহীম ১৪/১৪)*। মূসা (আঃ) তার কওমের লোকদের বলল, তোমরা আল্লাহ্র নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর ও ধৈর্যধারণ কর। এই পৃথিবীর মালিকানা আল্লাহ্র। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে চান এর উত্তরাধিকারী করেন। আর শুভ পরিণাম কেবল তাক্বওয়াশীলদের জন্যই'.. শ্রীঘ্রই তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের শত্রুকে ধ্বংস করবেন এবং জনপদে তোমাদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন' *(আ'রাফ ৭/১২৮-১২৯)*।

(৩১) তাক্বওয়া শত্রুদের চক্রান্ত থেকে রক্ষা করে : মহান আল্লাহ মুত্তাক্বীদেরকে শত্রুদের শত্রুতা ও দুশমনের দুশমনি হ'তে রক্ষা করেন। আল্লাহ বলেন, وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، 'কিন্তু যদি তোমরা ধৈর্যধারণ কর ও আল্লাহভীরু হও, তাহ'লে ওদের চক্রান্ত তোমাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। নিশ্চয়ই তারা যা কিছু করে, সবই আল্লাহ বেষ্টন করে আছেন' *(আলে ইমরান ৩/১২০)*।

(৩২) তাক্বওয়া আল্লাহ্র আযাব থেকে রক্ষা করে : দুনিয়াতে আল্লাহ বান্দাকে অনেক কারণে আযাব দিয়ে থাকেন। আর তাক্বওয়া দুনিয়ার আযাব থেকে রক্ষা করে। মহান আল্লাহ বলেন, وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ 'আর যারা ঈমান এনেছিল ও আল্লাহভীরুতা অবলম্বন করেছিল, তাদেরকে আমরা রক্ষা করেছিলাম' *(নামল ২৭/৫৩)*। ছালেহ (আঃ)-কে ধ্বংস থেকে রক্ষা প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন, وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، 'আর আমরা রক্ষা করলাম তাদেরকে যারা ঈমান এনেছিল এবং আল্লাহভীরুতা অবলম্বন করেছিল' *(হা-মীম-সাজদাহ ৪১/১৮)*।

[ক্রমশঃ]

৪০. ইবনু মাজাহ হা/৪২১৬; ছহীহাহ হা/৯৪৮।

ATAB MEMBER
Biman BANGLADESH AIRLINES

ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস

ট্রাভেল এজেন্সী নিবন্ধন সনদ নং ০০১৩৫৯৬, ATAB রেজিঃ নং ১৭১৪২

আসসালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহ

সম্মানিত হজ্জ ও ওমরাহ গমনেচ্ছু ভাই ও বোনেরা! ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস (সাবেক **ক্বাযী হজ্জ কাফেলা**) বিগত কয়েক বছর যাবৎ রাসূল (ছাঃ)-এর শেখানো পদ্ধতি মোতাবেক পবিত্র হজ্জ ও ওমরাহ পালনকারীদের খিদমত করে আসছে। আগামী বছরগুলিতেও এ ট্রাভেলস আপনাদের খিদমতে নিয়োজিত থাকবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সকলকে বিশুদ্ধ নিয়তে ও সুন্নাতসম্মত পদ্ধতিতে হজ্জব্রত পালনের তাওফীক দান করুন-আমীন!

আমাদের বৈশিষ্ট্য সমূহ :

- পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মোতাবেক হজ্জ ও ওমরাহ্র সকল কার্যাবলী সম্পন্ন করার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা।
- একাধিক প্যাকেজ মোতাবেক উভয় হারামের সম্ভবপর নিকটবর্তী স্থানে আবাসনের ব্যবস্থা।
- দেশী বাবুর্চী দ্বারা রান্না করা খাবারের ব্যবস্থা।
- ঢাকা বিমানবন্দর হ'তে শুরু করে ফেরত আসা পর্যন্ত সার্বক্ষণিক গাইডের ব্যবস্থা।
- হজ্জ ও ওমরাহ্র যাবতীয় কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সমাধা করার জন্য নিয়মিত তা'লীমের ব্যবস্থা।

বিঃ দ্রঃ

- **সব সময় হজ্জের প্রাক-নিবন্ধন চালু আছে।**
- **প্রতিমাসে ওমরাহ্র প্যাকেজ চালু থাকবে (যাত্রী হওয়া সাপেক্ষে)। সেক্ষেত্রে কমপক্ষে ২ (দুই) মাস আগে যোগাযোগ করতে হবে।**

ঢাকা অফিস : ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস, আল-আমীন কমপ্লেক্স, ২৬২, ফকিরের পুল (৪র্থ তলা, স্যুট নং ৪০৩), মতিঝিল, ঢাকা- ১০০০। মোবাইল নং ০১৭১১-৭৮৮২৩৫, ০১৭১৩-৩৮০২৩৩। ই-মেইল : quaziharuntravels1967@gmail.com

রাজশাহী অফিস : ক্বাযী হারূণুর রশীদ, ইসলামিক কমপ্লেক্স মার্কেট, নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭১১-৭৮৮২৩৫।

সন্তানদের প্রতি সালাফদের উপদেশ

*-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ**

সন্তান প্রতিটি পিতা-মাতার হৃদয়ের টুকরো, ভবিষ্যতের উত্তরসূরী এবং সমাজ ও উম্মাহ্র গুরুত্বপূর্ণ নির্মাতা। একজন মুসলিম অভিভাবক শুধু সন্তানকে দুনিয়াবী সফলতা নয়; বরং আখেরাতের মুক্তির পথেও পরিচালিত করতে চায়। আর এ উদ্দেশ্যে সন্তানকে সঠিক উপদেশ প্রদান ও চারিত্রিক গঠনে দিকনির্দেশনা দেওয়া অন্যতম দায়িত্ব। ইতিহাসের পাতায় সালাফে ছালেহীনদের জীবনচিত্রে আমরা দেখি- তারা সন্তানদের প্রতি কতটা গভীর ভালোবাসা, প্রজ্ঞা ও দ্বীনদার মনোভাব নিয়ে উপদেশ দিতেন। তাদের প্রতিটি বাক্যে থাকত ঈমানী দরদ, দুনিয়া ও আখেরাতের ভারসাম্য এবং পূর্ণাঙ্গ মানুষ গঠনের প্রয়াস। পবিত্র কুরআনের সূরা লোকমানে বর্ণিত সন্তানের প্রতি লোকমান হাকীমের প্রদত্ত উপদেশমালা তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বক্ষ্যমাণ নিবন্ধে আমরা সালাফদের হৃদয়স্পর্শী ও দূরদর্শী উপদেশাবলী থেকে কিছু নির্বাচিত অংশ তুলে ধরার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।-

সালাফগণ সন্তানদের উপদেশের জন্য একে অপরকে বলতেন :

সালাফে ছালেহীন পরস্পর স্বীয় সন্তানদের ব্যাপারে দায়িত্বশীল হওয়ার উপদেশ দিতেন। ওছমান খাতেবী (রহঃ) বলেন, أَدِّبِ ابْنَكَ، فَإِنَّكَ مَسْئُولٌ عَنْ وَلَدِكَ، مَاذَا أَدَّبْتَهُ؟ وَمَاذَا عَلَّمْتَهُ؟ وَأَنَّهُ مَسْئُولٌ عَنْ بِرِّكَ وَطَوَاعِيَتِهِ لَكَ، 'তোমার সন্তানকে আদব শিক্ষা দাও। কারণ তুমি তোমার সন্তানের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে- তুমি তাকে কিভাবে আদব শিখিয়েছ? তাকে কি কি জ্ঞান দান করেছ? আর সে-ও জিজ্ঞাসিত হবে- সে তোমার প্রতি কেমন সম্মান ও আনুগত্য প্রদর্শন করেছে'।[১] মুক্বাতিল বিন মুহাম্মাদ বিন বুনান (রহ.) বলেন, একবার আমি আমার পিতা ও ভাইয়ের সাথে আবু ইসহাকের (ইব্রাহীম আল-হারবী) কাছে গিয়েছিলাম। ইব্রাহীম আমার পিতাকে দেখে বললেন, এরা তোমার ছেলে? পিতা বললেন, 'হ্যাঁ'। তিনি বললেন, সাবধান থাকবে, তারা যেন তোমাকে আল্লাহ্র অবাধ্যতা করতে না দেখে। তাহ'লে তাদের চোখে তুমি তুচ্ছ হয়ে যাবে'।[২] হাফেয ইবনু রজব হাম্বলী (রহঃ) বলেন, মানুষদেরকে অর্থ-কড়ি দান করা বা খাবার খাওয়ানোর মাধ্যমে সাহায্য করার চাইতে তাদের সাথে সুন্দর কথার মাধ্যমে উত্তম আচরণ করা বেশী পসন্দনীয়। লোকমান যেমন তার ছেলেকে বলেছিলেন, ছেলে! তোমার কথা যেন সুন্দর হয়, মুখ যেন হাস্যোজ্জ্বল থাকে। তাহ'লে যারা লোকদেরকে সোনা-রূপা দান করে, তাদের চাইতে তুমি অধিক জনপ্রিয় হবে।[৩]

ইবনু কুদামা (রহঃ) বলেন, পিতার করণীয় হ'ল নিজ সন্তানকে অশ্লীল বাক্য বলা থেকে বিরত রাখায় অভ্যস্ত করে তোলা এবং যারা এমন কাজে লিপ্ত হয় তাদের সাথে মেলামেশা করতে না দেওয়া। কারণ বাচ্চাদের রক্ষণাবেক্ষণের মূল জায়গাটা হ'ল তাদেরকে অসৎসঙ্গ থেকে রক্ষা করা। এছাড়াও পিতার করণীয় হ'ল তাকে বেশী কথা না বলা এবং মনোযোগ দিয়ে শুনতে অভ্যস্ত করে তোলা। বিশেষত যদি তার চাইতে মর্যাদাবান কেউ কথা বলে।[৪]

ইবনুল জাওযী (রহঃ) বলেন, মেয়ের পিতা-মাতা এবং পরিবারের উচিৎ তারা যেন কখনো মেয়েকে তার স্বামীর উপর নিজেকে প্রাধান্য দিতে না বলে। মেয়ের পিতা-মাতার উচিত তাকে স্বামীর অধিকারসমূহ শিখিয়ে দেওয়া; বিশেষ করে মায়ের উচিত (এ ব্যাপারে) তাকে অধিক পরিমাণে উপদেশ দেওয়া।[৫]

সন্তানদের প্রতি সালাফদের উপদেশ

(১) ঈমানের উপদেশ :

একদা ওবাদাহ ইবনু ছামিত (রাঃ) তার ছেলেকে বললেন, يَا بُنَيَّ، إِنَّكَ لَنْ تَجِدَ طَعْمَ حَقِيقَةِ الْإِيمَانِ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، 'হে আমার বৎস! তুমি ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানের প্রকৃত স্বাদ আস্বাদন করতে পারবে না, যতক্ষণ না তুমি জানবে যে, যা তোমার উপর ঘটেছে তা ভুলেও এড়িয়ে যাওয়ার ছিল না। আবার যা এড়িয়ে গেছে তা তোমার উপর ভুলেও ঘটবার ছিল না। আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ الْقَلَمَ، فَقَالَ لَهُ: اكْتُبْ، قَالَ: رَبِّ وَمَاذَا أَكْتُبُ؟ قَالَ: اكْتُبْ مَقَادِيرَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ، 'মহান আল্লাহ সর্বপ্রথম যে বস্তু সৃষ্টি করেছেন তা হচ্ছে কলম। অতঃপর তিনি তাকে বললেন, লেখ! কলম বলল, হে আমার রব! কি লিখব? তিনি বললেন, ক্বিয়ামত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেক বস্তুর তাক্বদীর লেখ'। ওবাদাহ (রাঃ) বলেন, হে আমার প্রিয় পুত্র! আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, مَنْ مَاتَ عَلَى غَيْرِ هَذَا فَلَيْسَ مِنِّي 'যে ব্যক্তি এরূপ বিশ্বাস ছাড়া মারা যায় সে আমার (উম্মতের) অন্তর্ভুক্ত নয়'।[৬]

(২) পাপ পরিত্যাগের উপদেশ :

ইবনে মুজাহিদ বলেন, আমি আত্বা ইবনে আবী রাবাহ (রহ.)-এর কাছে ছিলাম। এমন সময় তাঁর পুত্র ইয়াকূব এসে বলল, 'আব্বাজান! আমাদের কিছু সাথী দাবী করে যে, তাদের ঈমান জিবরীল (আ.)-এর ঈমানের মতই'। তখন আত্বা

*. শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী; এম.ফিল গবেষক, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১. বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা ৩/১২০।
২. ইবনু আসাকির, তারীখু বাগদাদ ৬/৫২২।
৩. মাজমুউর রাসাইল ১/১০০।
৪. ইবনু কুদামা, মুখতাসারু মিনহাজিল কাসিদীন ২০।
৫. ইবনুল জাওযী, আহকামুন নিসা পৃ. ১০১।
৬. আবূদাঊদ হা/৪৭০০; তিরমিযী হা/৩৩১৯; সনদ ছহীহ।

(রহ.) বললেন, يَا بُنَيَّ، لَيْسَ إِيمَانُ مَنْ أَطَاعَ اللهَ كَإِيمَانِ مَنْ عَصَى اللهَ، 'বৎস আমার! আল্লাহ্‌র আনুগত্যকারী ও তাঁর অবাধ্যতাকারী বা পাপী ব্যক্তির ঈমান তো একরকম হ'তে পারে না'।[৭]

এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় হ'ল- আমাদের যুগের সন্তানরা সাধারণত পিতা-মাতার কাছে বস্তুবাদী কোন কিছু দাবী করে। বলে, অমুক তার সন্তানকে এটা কিনে দিয়েছে আমাকেও দিতে হবে। অথচ সালাফদের সন্তানরা এমন পরিবেশে বেড়ে উঠেছিলেন যে, তাদের কথাবার্তা, চলাফেরা সবকিছুতে ইসলাম ও ঈমানের প্রভাব বিদ্যমান ছিল। মূলত এখানে আত্বা বিন আবী রাবাহ (রহঃ) স্বীয় সন্তানকে ঈমান শিক্ষা দিয়েছেন যে, ঈমান শুধু মুখে দাবী করার বিষয় নয়; বরং সেটা কর্মে বাস্তবায়নের নাম। আর যারা সর্বদা আল্লাহ্‌র অবাধ্যতা ও পাপে নিমজ্জিত থাকে, তাদের ঈমান পূর্ণাঙ্গ থাকে না। এখানে তিনি মেহমানের সামনে সন্তানের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনে সন্তানকে সাইকোলোজিক্যালী সাপোর্ট করেছেন এবং উত্তরে খুবই সূক্ষ্মভাবে আদরের সন্তানকে আল্লাহ্‌র আনুগত্যের প্রতি এবং পাপ বর্জনের প্রতি উৎসাহিত করেছেন। এখানে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় যে, তিনি সন্তানকে এমন বন্ধুদের সাথে মিশতে দিয়েছেন, যারা খেলাধুলার মাঝে একে অপরের সাথে ঈমান-আমল নিয়ে কথা বলে, গল্প করে। *সুবহানাল্লাহ।*

(৩) মৃত্যুর প্রস্তুতি নেওয়ার উপদেশ :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চাচা আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্ত্বালিব (রাঃ)-এর মৃত্যুর সময় যখন ঘনিয়ে এল, তখন তিনি তাঁর পুত্র আব্দুল্লাহকে [রঈসুল মুফাসসিরীন আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)]-কে বললেন, 'হে আমার প্রিয় পুত্র আব্দুল্লাহ! আমি তোমাকে অছিয়ত করে যাচ্ছি যে, তুমি আল্লাহকে ভালোবাসবে, তাঁর আনুগত্যকে ভালোবাসবে, তাঁকে ভয় করে চলবে এবং তাঁর অবাধ্যতাকে ভয় করবে। যদি তুমি এরকম করতে পার, তবে মৃত্যু যখনই আসুক না কেন, সেই মৃত্যুকে তুমি কখনো অপসন্দ করবে না'।[৮] সাঈদ ইবনে যুবায়ের (রাঃ) একদিন তার সন্তানের দিকে মায়াভরা দৃষ্টি দিয়ে বললেন, 'বৎস! আমি জানি তোমার মাঝে একটা বৈশিষ্ট্য আছে? ছেলে জিজ্ঞেস করে, 'সেটা কী বাবা!' তিনি উত্তরে বলেন, 'আমি জানি, তুমি একদিন মৃত্যুবরণ করবে'।[৯]

(৪) ছালাতের উপদেশ :

মু'আয ইবনে জাবাল (রাঃ) স্বীয় সন্তানকে বলেন, يَا بُنَيَّ إِذَا صَلَّيْتَ صَلَاةً فَصَلِّ صَلَاةَ مُوَدِّعٍ؛ لَا تَظُنُّ أَنَّكَ تَعُودُ إِلَيْهَا أَبَدًا، وَاعْلَمْ يَا بُنَيَّ أَنَّ الْمُؤْمِنَ يَمُوتُ بَيْنَ حَسَنَتَيْنِ: حَسَنَةٍ قَدَّمَهَا، وَحَسَنَةٍ أَخَّرَهَا، 'হে আমার প্রিয় বৎস! যখন তুমি ছালাত আদায় করবে, তখন এমনভাবে আদয় করবে যেন এটি তোমার জীবনের শেষ ছালাত। এমনটা মনে করবে না যে, তুমি পুনরায় ছালাত আদায় করতে পারবে'। আর জেনে রেখো! হে আমার সন্তান! একজন মুমিন মারা যায় দুই কল্যাণের মাঝখানে- একটি কল্যাণ যা সে আগেই করে রেখেছে, আর আরেকটি কল্যাণ যার নিয়ত সে করে রেখেছে'।[১০]

(৫) অল্পেতুষ্টির উপদেশ :

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) তাঁর পিতা ওমর (রাঃ)-এর কাছে এসে বললেন, আব্বা! আমাকে একটি চাদর কিনে দিন। তখন ওমর (রাঃ) বললেন, يَا بُنَيَّ نَكِّسْ إِزَارَكَ وَإِيَّاكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَا رَزَقَهُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي بُطُونِهِمْ وَعَلَى ظُهُورِهِمْ، 'হে বৎস! তুমি তোমার কাপড় উল্টিয়ে পরিধান কর। আর তুমি ঐসকল লোকের মতো হয়ো না, যারা আল্লাহ্‌র দেওয়া রিযিক পেটেও ব্যবহার করে, পিঠেও ব্যবহার করে'।[১১] জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত ছাহাবী সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ) তার ছেলেকে উপদেশ দিয়ে বলেন, يا بني! إذا طلبت الغنى فاطلبه بالقناعة، فإنها مال لا يَنْفَدُ؛ وإياك والطمَع فإنه فقر حاضر؛ وعليك باليأس، فإنك لم تيأس من شيء قطُّ إلا أغناك الله عنه، 'হে বৎস! যদি তুমি প্রাচুর্য চাও, তাহ'লে অল্পে তুষ্টির মাধ্যমে সেটা অন্বেষণ কর। কেননা অল্পে তুষ্টি এমন সম্পদ, যা কখনো নিঃশেষ হয় না। আর তুমি লোভ-লালসা থেকে বেঁচে থাক। কেননা লোভ একটি চাক্ষুষ নিঃস্বতা। আর তুমি অপরের সম্পদ থেকে বিমুখ থাক। কেননা যখনই তুমি কোন কিছু (পার্থিব জৌলুস) থেকে নিবৃত্ত থাকবে, আল্লাহ তোমাকে এর থেকে মুখাপেক্ষীহীন করে দিবেন'।[১২]

(৬) আল্লাহওয়ালা আলেমদের মাধ্যমে উপদেশ :

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহঃ)-এর ছেলে ছালেহ (রহঃ) বলেন, كَانَ أَبِي يَبْعَثُ خَلْفِي إِذَا جَاءَهُ رَجُلٌ زَاهِدٌ أَوْ مُتَقَشِّفٌ لِأَنْظُرَ إِلَيْهِ، يُحِبُّ أَنْ أَكُونَ مِثْلَهُ، 'আমার আব্বার কাছে যখন কোন দুনিয়াবিমুখ-অনাড়ম্বর ব্যক্তি আগমন করতেন, তখন তিনি আমাকে ডেকে পাঠাতেন; যেন আমি মানুষটাকে দেখে শিখতে পারি। তিনি চাইতেন আমি যেন তার মতো হই'।[১৩]

---

৭. *হেবাতুল্লাহ লালকাঈ, শারহু উছূলি ই'তিক্বাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামা'আত ৫/১০২৮।*

৮. *বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান ২/১৫।*

৯. *মুহিউদ্দীন নববী, বুস্তানুল আরেফীন, পৃ. ৫৫।*

১০. *আহমাদ ইবনে হাম্বল, কিতাবুয যুহদ, পৃ. ১৪৮।*

১১. *আহমাদ ইবনে হাম্বল, কিতাবুয যুহদ, পৃ. ১৫৮।*

১২. *ইবনু আসাকির, তারীখু দিমাশক্ব ২/৩৬৩।*

১৩. *শামসুদ্দীন যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১২/৫৩০।*

(৭) সৎ সঙ্গ গ্রহণ ও অসৎ সঙ্গ বর্জনের উপদেশ :

জা'ফর ইবনে মুহাম্মাদ স্বীয় পুত্র মূসাকে উপদেশ দিয়ে বলেন, يا بني: إذا زرت فزر الأخيار، ولا تزر الفجار، فإنهم صخرة لا يتفجر ماؤها، وشجرة لا يخضر ورقها، وأرض لا يظهر عشبها، 'হে বৎস! যদি কারো সাথে সাক্ষাত করতেই হয়, তবে ভালো লোকের সাথে সাক্ষাত কর। পাপী লোকদের সাথে সাক্ষাত করো না। কেননা তারা এমন পাথর, যার পানি প্রবাহিত হয় না, এমন গাছ, যার পাতাগুলো সবুজ হয় না এবং এমন ভূমি, যাতে ঘাস উদ্গত হয় না (অর্থাৎ পাপী লোকের সাথে উঠাবসা করা নিরাপদ নয়)'।[১৪] একজন সালাফ (নেক পূর্বসূরি) তাঁর ছেলেকে উপদেশ দিয়ে বলেছিলেন, يا بني لا تصحب من الناس إلّا من إنْ افترقت قرب منك، وإذا استغنيت لم يطمع فيك، وإنْ علت مرتبته لم يرتفع عليك، إنْ تذللت له صانك، وإنْ احتجت له مانك، 'হে বৎস! তুমি মানুষের মধ্যে কেবল তারই সাথে সঙ্গ রাখ- যার সাথে বিচ্ছেদ হ'লেও সে তোমার সান্নিধ্যে আসার চেষ্টা করে, যখন তুমি স্বনির্ভর হয়ে যাও তখন সে তোমার প্রতি লোভী হয় না, যদি তার মর্যাদা উঁচু হয় তবুও সে তোমার ওপর অহংকার দেখায় না। তুমি তার কাছে নিজেকে ছোট করে ধরলেও সে তোমার মর্যাদা রক্ষা করে। আর তুমি যদি তার কাছে কোন প্রয়োজন প্রকাশ করো, তবে সে তোমাকে অপমান করে না'।[১৫]

আলী ইবনুল হাসান (রহঃ) তাঁর পুত্রকে বলেন, يَا بُنَيَّ، لَا تَصْحَبْ فَاسِقًا، فَإِنَّهُ يَبِيعُكَ بِأَكْلَةٍ وَأَقَلَّ مِنْهَا، يَطْمَعُ فِيهَا ثُمَّ لَا يَنَالُهَا، وَلَا بَخِيلًا؛ فَإِنَّهُ يَخْذُلُكَ فِي مَالِهِ أَحْوَجَ مَا تَكُونُ إِلَيْهِ، وَلَا كَذَّابًا؛ فَإِنَّهُ كَالسَّرَابِ يُقَرِّبُ مِنْكَ الْبَعِيدَ وَيُبَاعِدُ عَنْكَ الْقَرِيبَ، وَلَا أَحْمَقَ؛ فَإِنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَنْفَعَكَ فَيَضُرُّكَ، وَلَا قَاطِعَ رَحِمٍ، فَإِنَّهُ مَلْعُونٌ فِي كِتَابِ اللهِ، 'হে বৎস! পাপী লোকের সাথে বন্ধুত্ব করো না; সে তোমাকে এক বেলার খাবারের বিনিময়ে বা তার চেয়েও কম মূল্যে বিক্রি করে দেবে। সে এমন কিছুর লোভ করবে যা সে আদৌ পাবে না। আর তুমি কৃপণ ব্যক্তির সঙ্গেও মিশবে না; কারণ যখন তোমার (বিপদাপদে) অর্থ-কড়ির খুব প্রয়োজন হবে, তখন সে তোমাকে নিরাশ করবে। আর তুমি মিথ্যাবাদীর সঙ্গেও থেকো না; সে মরীচিকার মতো দূরের জিনিসকে তোমার কাছে নিয়ে আসবে, আর নিকটবর্তী জিনিস থেকে তোমাকে দূরে ঠেলে দিবে। তুমি মূর্খের সঙ্গেও থেকো না; কেননা সে তোমাকে উপকার করতে চাইবে, কিন্তু শেষমেশ তোমারই ক্ষতি করে বসবে। অতঃপর আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীর সঙ্গেও মিশবে না; কেননা সে আল্লাহ্র কিতাবে অভিশপ্ত'।[১৬]

খাত্তাব ইবনে মু'আল্লা আল-মাখযূমী (রহঃ) স্বীয় পুত্রকে বলেন, إِيَّاكَ وَإِخْوَانَ السُّوْءِ فَإِنَّهُمْ يَخُونُونَ مَنْ رَافَقَهُمْ وَيَخْرُفُونَ مَنْ صَادَقَهُمْ وَقُرْبُهُمْ أَعْدَى مِنَ الْجَرَبِ وَرَفْضُهُمْ مِنِ اسْتِكْمَالِ الْأَدَبِ وَالْمَرْءُ يُعْرَفُ بِقَرِينِهِ. قَالَ: وَالْإِخْوَانُ اثْنَانِ فَمُحَافِظٌ عَلَيْكَ عِنْدَ الْبَلَاءِ وَصَدِيقٌ لَكَ فِي الرَّخَاءِ فَاحْفَظْ صَدِيقَ الْبَلْبَلَةِ وَتَجَنَّبْ صَدِيقَ الْعَافِيَةِ فَإِنَّهُمْ أَعْدَى الْأَعْدَاءِ، 'খারাপ বন্ধুদের থেকে সতর্ক থাক, কারণ এরা তাদের বন্ধুদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে। যারা এদের সাথে মেশে তার সর্বনাশ করে ছাড়ে। তাদের সান্নিধ্য চর্মরোগের চেয়েও ভয়ানক। তাদের বর্জন করাই প্রকৃত ভদ্রতা ও শিষ্টাচারের পূর্ণতা। আর মানুষকে তার সঙ্গীর মাধ্যমেই চেনা যায়। এরপর তিনি বলেন, বন্ধু দুই ধরনের হয়ে থাকে- একজন হ'ল সেই, যে বিপদ-আপদে তোমার পাশে দাঁড়ায়। আরেকজন হ'ল তোমার সুখের সময়ের বন্ধু। সুতরাং তুমি দুঃসময়ের বন্ধুকে আঁকড়ে থাক এবং সুসময়ের বন্ধু থেকে দূরে থাকো। কেননা সুসময়ের বন্ধুরা সবচেয়ে বড় শত্রু'।[১৭]

লোকমান (আঃ) তাঁর ছেলেকে বলেছিলেন, يَا بُنَيَّ ثَلَاثَةٌ لَا يُعْرَفُونَ إِلَّا فِي ثَلَاثَةِ مَوَاطِنَ، لَا يُعْرَفُ الْحَلِيمُ إِلَّا عِنْدَ الْغَضَبِ، وَلَا الشُّجَاعُ إِلَّا عِنْدَ الْحَرْبِ، وَلَا الْأَخُ إِلَّا عِنْدَ الْحَاجَةِ، 'হে বৎস! তিনটি জিনিস কেবল তিনটি পরিস্থিতিতেই চেনা যায়: (১) সংযমশীল (ধৈর্যশীল) ব্যক্তিকে কেবল রাগের সময়েই চেনা যায়, (২) সাহসী ব্যক্তিকে চেনা যায় কেবল যুদ্ধক্ষেত্রে, আর (৩) প্রকৃত ভাই বা বন্ধুকে কেবল প্রয়োজনের সময়েই চেনা যায়'।[১৮]

তিনি আরো বলেন, يَا بُنَيَّ، إِذَا أَتَيْتَ نَادِيَ قَوْمٍ فَارْمِهِمْ بِسَهْمِ الْإِسْلَامِ، يَعْنِي السَّلَامَ، ثُمَّ اجْلِسْ فِي نَاحِيَتِهِمْ، فَلَا تَنْطِقْ حَتَّى تَرَاهُمْ قَدْ نَطَقُوا، فَإِنْ أَفَاضُوا فِي ذِكْرِ اللهِ فَأَجِلْ سَهْمَكَ مَعَهُمْ، وَإِنْ أَفَاضُوا فِي غَيْرِ ذَلِكَ فَتَحَوَّلْ عَنْهُمْ إِلَى غَيْرِهِمْ، 'হে বৎস! যখন কোন কওমের বৈঠকে যাবে, তখন প্রথমেই ইসলামের তীর ছুড়ে দাও, অর্থাৎ তাদেরকে সালাম দাও। তারপর তাদের পাশে এক কোণে চুপচাপ বসে পড়ো। কথা বল না যতক্ষণ না- তারা নিজেরা কথা শুরু করে। যদি তারা আল্লাহ্র যিকিরের মাধ্যমে আলোচনা শুরু করে, তাহ'লে তুমিও তাদের আলোচনায় অংশগ্রহণ কর। আর যদি তারা

---

১৪. হাফেয মিয্যী, তাহযীবুল কামাল ৫/৯০।
১৫. কূতুল কুলূব ফী মু'আমালাতিল মাহবূব ২/১৮৭।
১৬. ইবনু কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ১২/৪৮৫।
১৭. খাত্তাবী, আল-উযলাহ, পৃ. ৫০।
১৮. ইবনু মুফলিহ, আল-আদাবুশ শারঈয়াহ ৩/৫৬২।

অনর্থক বা অন্য কোন বিষয়ে মশগূল হয়ে পড়ে, তবে তুমি সেই বৈঠক ছেড়ে অন্য কোথাও সরে যাও'।[১৯]

(৮) শুকরিয়া আদায়ের উপদেশ :

ছালেহ ইবনু জানাহ দিমাশক্বী (রহঃ) তার সন্তানকে উপদেশ দিয়ে বলেন, يا بني إذا مر بك يوم وليلة قد سلم فيها دينك وجسمك ومالك وعيالك فأكثر الشكر لله تعالى فكم من مسلوب دينه ومتروع ملكه ومهتوك ستره ومقصوم ظهره في ذلك اليوم وأنت في عافية، 'হে বৎস! যদি তোমার একটি দিন ও একটি রাত এমনভাবে অতিবাহি হয় যাতে তোমার দ্বীন সুরক্ষিত থাকে, তোমার শরীর সুস্থ থাকে এবং তোমার সম্পদ ও পরিবার নিরাপদে থাকে, তাহ'লে তুমি বেশী বেশী আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায় কর। ভেবে দেখ, এমন কত মানুষ আছে, এক দিনে যার দ্বীন লুণ্ঠিত হয়েছে, তার সক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে, তার গোপন দোষ-ক্রটি প্রকাশ করে দেওয়া হয়েছে এবং তার পৃষ্ঠদেশ ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে। অথচ (আল্লাহ্র দয়ায়) তুমি তখনও সুস্থ ও নিরাপদে আছ'।[২০]

খলীফা মানছূর তার পুত্র মাহদীকে উপদেশ দিয়ে বলেন, يا أبا عبد الله، استدم النعمة بالشكر، والقدرة بالعفو، والطاعة بالتألف والنصر بالتواضع، ولا تنس مع نصيبك من الدنيا نصيبك من رحمة الله، 'হে আবু অব্দুল্লাহ! কৃতজ্ঞতার মাধ্যমে নে'মতকে স্থায়ী কর, ক্ষমার মাধ্যমে ক্ষমতা বজায় রাখ, সৌহার্দ্য ও ভালোবাসার মাধ্যমে আনুগত্য লাভ কর, নম্রতার মাধ্যমে বিজয় অর্জন কর; আর দুনিয়ার অংশ লাভ করতে গিয়ে যেন আল্লাহ্র দয়া থেকে তোমার অংশ ভুলে যেও না'।[২১]

(৯) অপচয় রোধের উপদেশ :

একবার ওমর ফারূক্ব (রাঃ) তাঁর ছেলে আব্দুল্লাহ (রাঃ)-এর ঘরে ঢুকলেন এবং দেখলেন, তার সামনে গোশত রাখা আছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'এটা কিসের গোশত?' আব্দুল্লাহ বললেন, 'আমার খেতে ইচ্ছে করেছিল, তাই এনেছি'। তখন ওমর (রাঃ) বিস্ময়মাখা কণ্ঠে বললেন, 'কিছু খেতে মন চাইলেই কি তোমার সেটা খেতে হবে? মনে রেখ, كفى بالمرء سَرَفاً أن يأكل كل ما اشتهاه، 'মানুষের অপচয়কারী সাব্যস্ত হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, তার মন যা চাইবে সে তা-ই খাবে'।[২২]

(১০) কথার গোপনীয়তা রক্ষার উপদেশ :

আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছ থেকে বের হয়ে আমার বাড়ীর দিকে যাচ্ছিলাম। পথে কিছু বাচ্চা খেলছিল, তাদের খেলা দেখে ভালো লাগায় আমি দাঁড়িয়ে গেলাম। এমন সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সেখানে এসে উপস্থিত হয়ে শিশুদেরকে সালাম দিলেন এবং আমাকে একটি প্রয়োজনীয় কাজে পাঠালেন। ফলে আমি বাসায় ফিরতে দেরি করে ফেললাম। আমার মা জিজ্ঞেস করলেন, 'বাবা! আজ ফিরতে দেরি হ'ল কেন? আমি বললাম, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে একটি কাজে পাঠিয়েছিলেন'। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'কোন কাজে?' আমি বললাম, 'মা! এটি একটি গোপন বিষয়'। তখন মা বললেন, يَا بُنَيَّ احْفَظْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِرَّهُ، 'বৎস! রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর গোপন কথা গোপন রাখ'। পরে ছাবিত (রহ.) আনাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কি এখনো সে কথা মনে রেখেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আল্লাহ্র কসম! আমি তা আজও মনে রেখেছি। আর যদি কাউকে বলতাম, তবে তোমাকেই বলতাম, হে ছাবিত![২৩]

(১১) ইলম অর্জনের প্রতি উৎসাহিত করা :

খলীফা মানছূর তার সন্তানকে বলেছিলেন, يَا بَنِيَّ لَا تَجْلِسْ مَجْلِسًا إِلَّا وَعِنْدَكَ من أهل الحديث مَنْ يُحَدِّثُكَ، 'হে আমার সন্তান! তুমি এমন কোন বৈঠকে বসো না, যেখানে তোমাকে হাদীছ শুনানোর জন্য তোমার পাশে আহলেহাদীছ থাকবে না'।[২৪]

ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রহ.) বলেন, আমার পিতা আমাকে বলতেন, يَا بُنَيَّ، اطْلُبِ الْحَدِيثَ، فَكُلَّمَا سَمِعْتَ حَدِيثًا، وَحَفِظْتَهُ، فَلَكَ دِرْهَمٌ فَطَلَبْتُ الْحَدِيثَ عَلَى هَذَا، 'হে আমার সন্তান! তুমি হাদীছ অন্বেষণ করো বা হাদীছ শিক্ষা করো। যখনই তুমি একটি হাদীছ শুনবে এবং তা মুখস্থ করবে, তখন (আমার পক্ষ থেকে) তোমার জন্য একটি করে দিরহাম উপহার থাকবে'। এভাবে উৎসাহ পেয়ে আমি হাদীছ অন্বেষণ শুরু করি'।[২৫]

সুফিয়ান ছাওরীর মা স্বীয় সন্তানকে বলেন, يا بَني اطلب العلم وأنا أكفيك من مغزلي يا بَني إِذَا كتبت عشرة أحاديث فانظر هل ترى فِي نفسك زيادة فِي مشيتك وحلمك ووقارك فَإِن لَمْ تر ذَلِكَ فاعلم أَنَّهُ لا يضرك ولا ينفعك، 'ছেলে আমার!, তুমি ইলম অর্জন কর; তোমার খরচ আমি

---

১৯. *তাফসীরে ইবনে কাছীর ৬/৩৪০।*
২০. *ইবনু আসাকির, তারীখু দিমাশক্ব ২৩/৩২৫; যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৩/২২২।*
২১. *তাবারী, তারীখুর রুসুল ওয়াল মুলূক (তারীখুত তাবারী), ৮/৭১।*
২২. *মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন উওয়াইযাহ, ফাছলুল খেতাব ফিয যুহদি ওয়ার রাক্বায়েক্ব ওয়াল আদাব ১/৪৬২।*
২৩. *মুসনাদে আহমাদ হা/ ১৩৩৮০; সনদ ছহীহ।*
২৪. *ইবনু কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ১০/১৩৪।*
২৫. *খতীব বাগদাদী, শারফু আছহাবিল হাদীছ, পৃ. ৬৭।*

চরকায় সুতা কেটে বহন করব। বাছাধন! তুমি যখন দশটা হাদীছ লেখ, তখন দেখবে- তোমার চালচলনে, সহিষ্ণুতায় এবং ব্যক্তিত্বে সেটা কোন কিছু বৃদ্ধি করতে পেরেছে কি-না? তুমি যদি এমন কিছু না পাও তাহ'লে বুঝে নিবে, এই ইলম তোমার কোন ক্ষতি বা উপকারে আসবে না'।[২৬]

প্রখ্যাত ছাহাবী সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ)-এর নাতি ইসমাঈল ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে সা'দ (রহঃ) বলেন, كَانَ أَبِي يُعَلِّمُنَا مَغَازِيَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَعُدُّهَا عَلَيْنَا، وَسَرَايَاهُ وَيَقُولُ: يَا بَنِيَّ هَذِهِ مَآثِرُ آبَائِكُمْ فَلَا تُضَيِّعُوا ذِكْرَهَا، 'আমাদের পিতা আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রতিটা যুদ্ধাভিযানের বিবরণ (মাগাযী) শেখাতেন। তারপর বলতেন, ছেলেরা! এগুলো তোমাদের পূর্বপুরুষের কীর্তিগাঁথা। তাই এগুলো স্মরণ করতে ভুলে যাবে না'।[২৭]

(১২) বিদ'আতীদের কথা না শোনার উপদেশ :

তাউস (রহঃ) একদিন বসেছিলেন এবং তাঁর ছেলে তাঁর পাশেই ছিল। এমন সময় মু'তাযিলা ফের্কার এক লোক এসে কিছু কথা বলা শুরু করল। তখন তাউস (রহঃ) তাঁর নিজের দুই কানে আঙুল ঢুকিয়ে দিলেন এবং ছেলেকে বললেন, يا بني أدخل أصبعك فِي أذنيك حتى لا تسمع من قوله شيئا فَإِن هَذَا القلب ضعيف ثم قَالَ أي بني أسدد فما زال يَقُول أسدد حتى قَامَ الآخر، 'হে আমার বৎস! তুমিও তোমার দুই কানে আঙুল প্রবেশ করাও, যেন তুমি তার কথার কিছুই শুনতে না পাও। কারণ হৃদয় খুবই দুর্বল (ভ্রান্ত আক্বীদায় আক্রান্ত হ'তে সময় লাগে না)। এরপর তিনি ছেলেকে বললেন, 'হে বৎস! (তোমার কানে) চেপে ধর! সেই বিদ'আতী ব্যক্তি উঠে চলে যাওয়ার আগ পর্যন্ত বলতেই থাকলেন- কান চেপে ধর! কান চেপে ধর![২৮]

এই ঘটনাটি একজন সৎ ও আল্লাহভীরু আলেমের আক্বীদা সংরক্ষণের প্রতি সতর্কতা এবং এর কুপ্রভাব থেকে সন্তানকেও বাঁচিয়ে রাখার এক অনন্য দৃষ্টান্ত। সুতরাং বাতিল চিন্তা বা বিভ্রান্তিকর বক্তব্য থেকে দূরে থাকা এবং দুর্বল অন্তরকে তার আক্রমণ থেকে রক্ষা করা প্রত্যেক মুসলিমের ঈমানী দায়িত্ব।

(১৩) আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকারের উপদেশ :

উমায়ের ইবনে হাবীব মৃত্যু শয্যায় তাঁর ছেলেদের উপদেশ দিয়ে বলেন, 'হে আমার সন্তানরা! মূর্খদের সঙ্গে মেশার ক্ষেত্রে সাবধান থাক। কারণ তাদের সঙ্গে ওঠাবসা করা এক ধরনের রোগ। যে ব্যক্তি মূর্খের কটুক্তির প্রতি ধৈর্য ধারণ করে, সে সুখে থাকে। আর যে তাকে জবাব দেয়, সে অনুতপ্ত হয়। যে ব্যক্তি মূর্খের ছোটখাটো অপমান সহ্য করতে পারে না, সে শেষমেশ বড় অপমানও মেনে নিতে বাধ্য হয়। আর তোমাদের কেউ যখন সৎকাজের আদেশ দিতে যাবে বা অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখতে চাইবে, তবে সে যেন আগে থেকেই কষ্ট সহ্য করার মানসিক প্রস্তুতি নেয় এবং নিশ্চিত থাকে যে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তার জন্য পুরস্কার রয়েছে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র কাছে পাওয়ার দৃঢ় বিশ্বাস রাখে, সে মানুষের কষ্টকে তেমনভাবে অনুভব করে না'।[২৯]

(১৪) সচ্চরিত্র গঠনের উপদেশ :

সাঈদ ইবনুল আছ (রহঃ) স্বীয় পুত্রকে উপদেশ দিয়ে বলেন, يَا بُنَيَّ، إِنَّ الْمَكَارِمَ لَوْ كَانَتْ سَهْلَةً يَسِيرَةً لَسَابَقَكُمْ إِلَيْهَا اللِّئَامُ، وَلَكِنَّهَا كَرِيهَةٌ مُرَّةٌ لَا يَصْبِرُ عَلَيْهَا إِلَّا مَنْ عَرَفَ فَضْلَهَا، وَرَجَا ثَوَابَهَا، 'হে আমার বৎস! মহৎ গুণাবলী বা সচ্চরিত্র যদি সহজলভ্য হ'ত, তাহ'লে অপদার্থ ও নীচ লোকেরা তোমাদের আগেই তা অর্জন করে ফেলত। কিন্তু এই গুণাবলী কঠিন ও তিক্ত; এগুলো শুধু সেই ব্যক্তি-ই ধারণ করতে পারে, যে এগুলোর মর্যাদা বুঝে এবং এর বিনিময়ে প্রতিদান লাভের প্রত্যাশা করে'।[৩০]

আহনাফ ইবনে ক্বায়েস (রহঃ) স্বীয় সন্তান শা'বীকে উপদেশ দিয়ে বলেন, 'হে শা'বী! এমন আট শ্রেণীর মানুষ আছে, তারা যদি অপমানিত-অপদস্থ হয়, তবে যেন নিজেদের ছাড়া অন্য কাউকে দোষ না দেয়। এই আট শ্রেণীর লোক হ'ল-

১. যে ব্যক্তি এমন কোন ভোজসভায় (দাওয়াতে) চলে যায়, যেখানে তাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি।

২. যে ব্যক্তি দুইজন লোকের ব্যক্তিগত আলাপে জোর করে ঢুকে পড়ে, অথচ তারা তাকে আলাপে যুক্ত করেনি।

৩. যে নিজের স্বার্থে কারো ঘরে বসেই সেই গৃহস্বামীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়।

৪. যে ব্যক্তি নিজের প্রভাব খাটিয়ে শাসকের নিকট নিজেকে জোর করে উপস্থাপন করে।

৫. যে ব্যক্তি এমন কোন আসনে বসে, যার সে যোগ্য নয়, অথচ নিজেকে উপযুক্ত ভাবতে থাকে।

৬. যে এমন কাউকে কথা শোনাতে চায়, যে তার কথা শুনতেও চায় না, শুনলেও মূল্য দেয় না।

৭. যে ব্যক্তি কৃপণের দান-উপকারের আশা করে, যার হৃদয়ে উদারতার লেশমাত্র নেই।

৮. আর যে তার দরকারের কথা এমন শত্রুর কাছে প্রকাশ করে, যে তার বিপদেই আনন্দ পায়'।[৩১]

---

২৬. *হামযাহ আস-সাহমী, তারীখু জুরজান, পৃ. ৪৯২।*
২৭. *খতীব বাগদাদী, আল-জামে' লি আখলাক্বির রাবী ওয়া আদাবুস সামি', ২/১৯৫।*
২৮. *ইবনুল জাওযী, তালবীসু ইবলীস, পৃ. ১৪।*
২৯. *আহমাদ যাকী সাফওয়াত, যামহাতু খুতাবিল আরাব ১/১৭১।*
৩০. *ইবনু আবিদ্দুনয়া, মাকারিমুল আখলাক্ব, পৃ. ৩০।*
৩১. *ইবনুল জাওযী, আল-মুন্তাযাম ফী তারীখিল উমাম ৬/৯৪-৯৫।*

সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ) স্বীয় সন্তানকে উপদেশ দিয়ে বলেন, يَا بُنَيَّ، لَا تُمَازِحِ الشَّرِيفَ فَيَحْقِدَ عَلَيْكَ، وَلَا تُمَازِحِ الدَّنِيءَ فَيَجْتَرِئَ عَلَيْكَ 'হে আমার বৎস! সম্মানিত ব্যক্তির সঙ্গে ঠাট্টা-তামাশা করো না, কারণ সে তোমার ওপর রাগ পুষে রাখতে পারে। আর নীচু স্বভাবের মানুষের সঙ্গে রসিকতা করো না, কারণ সে তোমার প্রতি দুঃসাহস দেখিয়ে (তোমার সম্মানহানি করে) ফেলতে পারে'।[৩২] সন্তানকে শিষ্টাচার শেখানোর কি চমৎকার উপদেশ।

(১৫) ঋণ না করার উপদেশ :

ওক্ববা ইবনে আমের (রাঃ) মৃত্যুর প্রাক্কালে স্বীয় পুত্রদের ওছিয়ত করে বলেন, يَا بَنِيَّ، إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ثَلَاثٍ فَاحْتَفِظُوا بِهَا: لَا تَقْبَلُوا الْحَدِيثَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مِنْ ثِقَةٍ، وَلَا تَدَيَّنُوا وَإِنْ لَبِسْتُمُ الْعَبَاءَ، وَلَا تَكْتُبُوا شِعْرًا تُشْغِلُوا بِهِ قُلُوبَكُمْ عَنِ الْقُرْآنِ 'হে আমার পুত্ররা! আমি তোমাদের তিনটি বিষয়ে নিষেধ করছি, সেগুলো মনেপ্রাণে ধারণ করে রাখবে- (১) তোমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাদীছ নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির নিকট থেকে ছাড়া গ্রহণ করবে না। (২) আবা (এক ধরনের ঢিলে-ঢালা অতি সাধারণ পোষাক) পরিধান করে থাকবে, তবুও কখনো ঋণ করবে না। (৩) আর এমন কবিতা লেখা নিয়ে পড়ে থাকবে না, যা তোমাদের হৃদয়কে কুরআন থেকে দূরে সরিয়ে দেয়'।[৩৩]

(১৬) সুধারণা পোষণের উপদেশ :

ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহঃ)-এর ছেলে বলেন, আমার আব্বা আমাকে উপদেশ দিয়ে বলতেন, يَا بُنَيَّ إِذَا سَمِعْتَ كَلِمَةً مِنَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، فَلَا تَحْمِلْهَا عَلَى شَيْءٍ مِنَ الشَّرِّ مَا وَجَدْتَ لَهَا مَحْمَلًا مِنَ الْخَيْرِ 'হে বৎস! যখন তুমি কোন মুসলিমের কোন কথা শুনবে, তবে সেটা ভালো অর্থে ব্যাখ্যা করার সুযোগ থাকলে কখনোই সেটা খারাপ অর্থে নিও না'।[৩৪]

(১৭) পরিস্থিতি মোক্বাবেলা করার উপদেশ :

আব্বাসী খলীফা মানছূর স্বীয় পুত্র মাহদীকে উপদেশ দিয়ে বলেন, يَا بُنَيَّ لَيْسَ الْعَاقِلُ مَنْ يَحْتَالُ لِلْأَمْرِ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ حَتَّى يَخْرُجَ منه، ولكن العاقل الَّذِي يَحْتَالُ لِلْأَمْرِ الَّذِي غَشِيَهُ حَتَّى لَا يقع فيه، 'হে আমার বৎস! সে ব্যক্তি প্রকৃত বুদ্ধিমান নয়, যে বিপদে পড়ে যাওয়ার পর সেখান থেকে বেরিয়ে আসার পথ খোঁজে; বরং সত্যিকারের বুদ্ধিমান ঐ ব্যক্তি, যে বিপদ আসার আগেই কৌশল অবলম্বন করে- যাতে সে ঐ বিপদে না পড়ে'।[৩৫]

(১৮) সমাজ সংস্কারের উপদেশ :

আব্বাসী খলীফা আব্দুল্লাহ মানছূর (৯৫-১৫৮হি.) স্বীয় পুত্র ও পরবর্তী খলীফা মুহাম্মাদ মাহদী (১২৭-১৬৯হি.)-কে উপদেশ দিয়ে বলেন, يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ! إِنَّ الْخَلِيفَةَ لا يُصْلِحُهُ إِلا التَّقْوَى، وَالسُّلْطَانَ لا يُصْلِحُهُ إِلا الطَّاعَةُ، وَالرَّعِيَّةَ لا يُصْلِحُهَا إِلا الْعَدْلُ، وَأَوْلَى النَّاسِ بِالْعَدْلِ أَقْدَرُهُمْ عَلَى الْعُقُوبَةِ، وَأَنْقَصُ النَّاسِ عَقْلًا مَنْ ظَلَمَ مَنْ هُوَ دُونَهُ، 'হে আবু আব্দুল্লাহ! শুধুমাত্র তাক্বওয়ার মাধ্যমেই খলীফাকে সংশোধন করা যায় এবং সুলতানকে/সালতানাতকে সংস্কার করা যায় আনুগত্যের মাধ্যমে। প্রজাদেরকে সংশোধন করা যায় ন্যায়বিচারের মাধ্যমেই। ন্যায়বিচারের যোগ্য ব্যক্তি শাস্তি প্রদানে সর্বাধিক সক্ষম। আর বুদ্ধিমত্তার দিক দিয়ে সবচেয়ে নীচু প্রকৃতির মানুষে সেই ব্যক্তি, যে তার অধিনস্তদের প্রতি যুলুম করে'।[৩৬]

(১৯) মুসলিম শাসকের অনুগত্য করার উপদেশ :

আমর ইবনে আছ (রাঃ) তাঁর ছেলেকে উপদেশ দিয়ে বলেন, يا بنيّ! احفظ عني ما أوصيك به، إمام عدل خير من مطر وبل، وأسدٌ حطوم خيرٌ من إمام ظلوم، وإمام ظلوم غشوم خير من فتنة تدوم، 'হে আমার বৎস! আমি তোমাকে যা উপদেশ দিচ্ছি, তা মনে রেখো- ন্যায়পরায়ণ শাসক বৃষ্টির চেয়েও উত্তম। একটা হিংস্র সিংহ একজন যালেম শাসকের চেয়েও ভালো। আর একজন যালেম শাসক দীর্ঘস্থায়ী ফিৎনা (অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা)-র চেয়ে উত্তম'।[৩৭]

(২০) নেতৃস্থানীয় সন্তানকে ন্যায়পরায়ণতার উপদেশ :

উমাইয়া খলীফা মারওয়ান ইবনে হাকাম যখন তাঁর পুত্র আব্দুল আযীযকে মিসরের গভর্নর নিযুক্ত করলেন, তখন তিনি উপদেশ দিয়ে বলেছিলেন, 'হে আমার পুত্র! তোমার প্রহরীকে আদেশ দাও যেন সে প্রতিদিন তোমার দরজায় কে এসেছে তা তোমাকে জানায়, তাহ'লে তুমি নিজেই কাকে অনুমতি দেবে আর কাকে ফিরিয়ে দেবে, তা নির্ধারণ করতে পারবে। যে তোমার কাছে আসে, তাকে হৃদ্যতা ও আলাপচারিতার মাধ্যমে আপন করে নাও, যাতে সে তোমার প্রতি ভালোবাসা ও স্বস্তি অনুভব করে। আর যদি কোন বিষয় স্পষ্ট না হয়, তাহ'লে শাস্তি দিতে তাড়াহুড়ো করো না- কারণ শাস্তি দেওয়া তোমার পক্ষে সহজ হ'লেও, তা ফিরিয়ে নেওয়া তোমার পক্ষে কঠিন'।[৩৮]

---

৩২. *ইবনু আবিদ্দুনয়া, আছ-ছামতু ওয়া আদাবুল লিসান, পৃ. ২১১।*
৩৩. *তাবারাণী, আল-মু'জামুল কাবীর হা/৭৩৭; ১৭/২৬৮।*
৩৪. *আবূ নু'আইম, হিলয়াতুল আওলিয়া ৫/২৭৮।*
৩৫. *ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১০/১৩৪।*
৩৬. *আহমাদ ইবনু মারওয়ান আদ্দীনওয়ারী, আল-মাজালাসা ওয়া জাওয়াহিরুল ইলম, ৫/৩৯২।*
৩৭. *ইবনু আব্দিল বার্র, বাহজাতুল মাজালিস, পৃ. ৭১।*
৩৮. *শামসুদ্দীন ইবনে মুফলিহ, আল-আদাবুশ শার'ইয়াহ ১/৩৯৫।*

একদিন খলীফা আল-মানছূর তাঁর পুত্র মাহদীকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কাছে কতগুলো বাহন আছে?’ মাহদী বলল, ‘আমি জানি না’। খলীফা বললেন, এটা তো দায়িত্বে গাফেল হওয়ার লক্ষণ। যদি নিজের বাহনের হিসাবই না রাখো, তবে খেলাফতের মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে তুমি আরও বেশী অবহেলা করবে। তাই হে আমার প্রিয় পুত্র! আল্লাহকে ভয় কর’।[৩৯]

(২১) সব বিষয়ে নিয়ত সৎ রাখার উপদেশ :

আব্দুল্লাহ ইবনে আহমাদ বলেন, একদিন আমি আমার পিতাকে (ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলকে) বললাম, ‘আব্বা! আমাকে কিছু উপদেশ দিন’। তিনি বললেন, ‘হে বৎস! সর্বদা কল্যাণের নিয়ত করবে। কেননা যতক্ষণ তুমি কল্যাণের নিয়ত করবে, ততক্ষণ তুমি কল্যাণের মধ্যেই থাকবে’।[৪০]

(২২) আল্লাহ্র যিকিরের উপদেশ :

ইমাম ইবনুল জাওযী (রহঃ) তাঁর পুত্রকে একটা উপদেশমূলক চিঠি লিখেন, সেখানে তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর এই হাদীছ উল্লেখ করেন, مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ غُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ فِي الْجَنَّةِ، ‘যে ব্যক্তি বলবে, ‘সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি’, তার জন্য জান্নাতে একটি খেজুর গাছ রোপণ করা হবে’। অতঃপর বলেন, ‘দেখো বৎস! যে ব্যক্তি জীবনের সময়গুলোকে অবহেলায় নষ্ট করে দেয়, সে জান্নাতের কত গাছ রোপণের সুযোগ হারাচ্ছে!’[৪১]

(২৩) যুলুম থেকে সতর্ক করা :

খলীফা হারূণের মন্ত্রী খালেদ ইবনু বারমাক যখন তার ছেলেসহ বন্দী হ’লেন, তখন ছেলে তাকে বলল, ‘আব্বা! এত শান-শওকত, সম্মান-মর্যাদা পাওয়ার পর আজ আমাদেরকে বন্দিত্ব বরণ করতে হ’ল?’ খালেদ উত্তর দিলেন, يا بني! دعوة مظلوم سرت بليل غفلنا عنها ولم يغفل الله عنها، ‘ছেলে আমার! রাতের অন্ধকারে কোন এক মযলূম হয়ত দো‘আ করেছিল, যেটার ব্যাপারে আমরা গাফেল ছিলাম। কিন্তু আল্লাহ গাফেল ছিলেন না’।[৪২]

উপসংহার :

সন্তানদের প্রতি সালাফদের উপদেশাবলী কেবল আবেগের বহিঃপ্রকাশ ছিল না; বরং তা ছিল এক মহান দায়িত্ববোধ ও আখেরাতমুখী দূরদৃষ্টির প্রতিফলন। তারা সন্তানকে কেবল দুনিয়ায় সফল মানুষ নয়; বরং আল্লাহভীরু, আমানতদার ও দ্বীনের খেদমতে নিবেদিত মুমিন গড়তে সচেষ্ট ছিলেন। আজকের সমাজে যখন মূল্যবোধের অবক্ষয়, পারিবারিক বন্ধনের শৈথিল্য ও তরুণদের চারিত্রিক স্খলনের ধারা ক্রমবর্ধমান, তখন সালাফদের উপদেশ ও তাদের পারিবারিক নীতিমালা থেকে শিক্ষা নেওয়া অত্যন্ত যরূরী। সন্তানকে সৎ, দায়িত্ববান ও দ্বীনদার মানুষ হিসাবে গড়ে তুলতে হ’লে অভিভাবকদের উচিত সালাফদের পথকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করা। তাহ’লেই আমরা একটি সুন্দর পরিবার, আদর্শ সমাজ এবং আলোকিত সমাজ গড়ে তুলতে পারব ইনশাআল্লাহ। মহান আল্লাহ আমাদের তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

---

৩৯. *ইবনু কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ১০/১৩৪।*
৪০. *ইবনুল জাওযী, মানকিবুল ইমাম আহমদ, পৃ. ২৭৪।*
৪১. *ফাতাওয়া আশ-শাবাকা আল-ইসলামিইয়াহ ৬/৫৩৪।*
৪২. *খত্বীব বাগদাদী, তারীখু বাগদাদ ১৪/১৩৬।*

দেশের যেকোন প্রান্ত থেকে পাইকারী ও খুচরা ক্রয়ের জন্য
যোগাযোগ করুন : ০১৭৫১-১০৩৯০৪

Bangla Food BD
আস্থা রাখুন শতভাগ খাঁটি পণ্য পাবেন ইনশাআল্লাহ।

আমাদের পণ্য সমূহ

- আম (মৌসুমি)
- লিচু (মৌসুমি)
- সকল প্রকার খেজুর
- মরিচের গুঁড়া
- হলুদের গুঁড়া
- আখের গুড় (মৌসুমি)
- খেজুরের গুড় (মৌসুমি)
- খাঁটি মধু
- খাঁটি গাওয়া ঘি
- খাঁটি নারিকেল তৈল(এক্সট্রা ভার্জিন)
- খাঁটি সরিষার তৈল
- খাঁটি জয়তুনের তৈল
- খাঁটি নারিকেল তৈল
- খাঁটি কালো জিরার তৈল
- নাটোরের কাঁচাগোল্লা ও বগুড়ার দই

যোগাযোগ
facebook.com/banglafoodbd
E-mail : abirrahmanarif@gmail.com
Whatsapp & Imo : 01751-103904
www.banglafoodbd.com
SCAN ME

আল-ইখলাছ হজ্জ কাফেলা
(বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে হজ্জ ও ওমরাহ পালনের একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান)
পরিচালনায় : **মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মান্নান** (এম.এম, এম.এ)।
সার্বিক ব্যবস্থাপনায় :
স্মার্ট ট্যুরস এ্যান্ড ট্রাভেলস
সরকার অনুমোদিত ট্রাভেলস ও হজ্জ ওমরাহ এজেন্ট। লাইসেন্স নং ৫২৫।
বিশেষ দ্রষ্টব্য : প্রতি মাসে ওমরাহ গ্রুপ চলমান। ১,৩০,০০০-১,৪০,০০০ টাকার মধ্যে উন্নতমানের খাবার ও আবাসন সহ ছহীহ সুন্নাহ পদ্ধতিতে ওমরাহ পালনের সুযোগ রয়েছে।
সাতক্ষীরা অফিস : কামালনগর ঈদগাহ সংলগ্ন, সাতক্ষীরা
মোবাইল : ০১৭১১-৩৬৫৩৩৭, ০১৯৭৮-১০৭৮০৫

আধুনিক যুগে শিক্ষকতা

*-সারওয়ার মিছবাহ**

এককালে কর্মক্ষেত্র কম ছিল। মানুষ যে কোন একটি পেশায় সীমাবদ্ধ থেকেছে। তবে আজ কর্মক্ষেত্র অনেক বেশী। তাই মানুষেরও একাধিক পেশা হয়েছে। একজন মানুষের কয়েকটি পেশা থাকতেই পারে। তবে এর মধ্যে একটি পেশা হয় মূল। যে পেশার মাধ্যমে তিনি অপরের কাছে পরিচিত হন। সেই মৌলিক পেশাটি যদি কারো শিক্ষকতা হয় তবে আজকের এই আলোচনা তার জন্য বিশেষিত। আমরা আজ শিক্ষকতার গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো নিয়ে আলোচনা করব। ধাপে ধাপে ঐসকল কথাগুলো বলার চেষ্টা করব, যা একজন শিক্ষকের অত্যন্ত জীবন ঘনিষ্ট।

শুরুতেই আমরা একজন শিক্ষকের সহপেশা নিয়ে বলব। আমরা জানি, শিক্ষকতায় রোযগারে সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তাই বাড়তি সচ্ছলতার আশায় আমরা একইসাথে কয়েকটি পেশাতে থাকি। শিক্ষকতার পাশাপাশি কি করা যায়! এই চিন্তা মাথায় নিয়ে দিগ্বিদিক ছুটাছুটি করি। কেউ ব্যবসা শুরু করি। কেউ ক্ষেত খামারে যাই। লক্ষ্য একটাই, অনেক পয়সা উপার্জন করতে হবে। তবে পয়সা উপার্জনের দিকে পূর্ণ মনোনিবেশ করার কারণে আমরা নিজেদের খেই হারিয়ে ফেলি। শিক্ষকতার মহান পেশায় থেকেও জাতির তেমন একটা উপকারে আসতে পারি না। এর অনেকগুলো কারণ আছে। ধারাবাহিকভাবে আমরা সেগুলো উপস্থাপন করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

দেখুন! পয়সাই জীবনের লক্ষ্য হ'তে পারে না। শিক্ষক হয়ে যদি আপনি গরুর ব্যবসা না করেন, তবে অনেকেই আছে যারা গরুর ব্যবসা করবে। কিন্তু শিক্ষক হয়ে যদি আপনি শিক্ষাবিদ না হন তবে আর কে হবে! সুতরাং একটি মূলনীতি সর্বদা মাথায় রাখবেন, 'সব পেশা সবার জন্য নয়'। কারণ পেশা পেশাকে খেয়ে ফেলে। আবার পেশা পেশাকে উন্নত করে। যদি একই ব্যক্তির মাঝে দ্বিমুখী দুইটি পেশা একত্রিত হয়, তবে তুলনামূলক শক্তিশালী পেশা অপরটিকে খেয়ে ফেলে। আবার দুইটি পেশা যদি একটি অপরটির সহযোগী হয় তবে দু'টোই উন্নতির দিকে যায়।

মনে করুন, একজন ডাক্তার রয়েছেন। তিনি রোগীদের সেবা করার পাশাপাশি বাড়তি উপার্জনের আশায় মাছের ব্যাপারী হয়েছেন। এখন যদি তার মাছের ব্যবসা শক্তিশালী হয় তবে অল্পদিনেই তার রোগী দেখা চেম্বার বন্ধ হবে। আর তিনি যদি ভাল ডাক্তার হন তবে অল্পদিনেই তার মাছের ব্যবসা লাটে উঠবে। কারণ এই দুইটি দ্বিমুখী পেশা। এজন্য শিক্ষক হিসাবে সব পেশায় যাওয়া সমীচীন নয়। আপনাকে দুনিয়ায় ধনী হ'তেই হবে? জমি কিনে আলিশান বাড়ি করতেই হবে? এমন চিন্তাধারা কেন? ছোট্ট একটি জীবন। যদি তা মানবসেবায় বিলীন হয় তবে হোক না! শিক্ষকদের যদি এই চেতনা না থাকে তবে জাতিকে স্বার্থপরতা থেকে উত্তরণ করবে কে? সুতরাং 'খাই-খাই' টাইপের মানসিকতা পরিবর্তন করা আবশ্যক।

দেখুন! একজন ডাক্তার যদি সাইড প্রফেশন হিসাবে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ হন। মেডিসিন নিয়ে গবেষণা করেন। তবে তার একটি পেশা অপরটিকে স্টাবলিশ (Establish) করবে। ঠিক তেমনই একজন শিক্ষক শিক্ষকতার পাশাপাশি যে পেশায় যাবেন সেখানেও কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তিনি চাইলেই আদার ব্যাপারী হ'তে পারেন না। তিনি লেখক হ'তে পারেন। গবেষক হ'তে পারেন। শিক্ষাবিদ হ'তে পারেন। এই বিস্তর অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে তিনি 'স্কিল ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট' দাঁড় করাতে পারেন। তিনি 'স্টুডেন্ট কাউন্সেলিং সেন্টার' তৈরি করতে পারেন। তিনি পেইড সিস্টেমে ভাষা শিক্ষা ক্লাব, পাঠচক্র ইত্যাদি সেবামূলক কাজ করতে পারেন। তিনি কেন আদা বেচবেন! এই সহজ চিন্তাটি আমরা মাথায় নেওয়ার চেষ্টা করি না। কারণ একটাই। টাকার আধিক্য এবং স্বল্পতা। এখন আমরা কিছু বিষয় পরামর্শ করব। যার মাধ্যমে আপনি নিজের শিক্ষকতা পেশাকে একটি নান্দনিক স্থানে নিয়ে যেতে পারবেন ইনশাআল্লাহ।

শিক্ষকতায় জামেদ ও মাছদার : যারা আরবী শিক্ষক তারা 'জামেদ' ও 'মাছদার' বোঝেন। তবে আমি এখানে 'জামেদ' বলতে ঐসকল শিক্ষকদের বুঝাচ্ছি, যারা দাওরায়ে হাদীছ পর্যন্ত যা পড়েছেন, দশ বছর পরে এসেও ততটুকুর মাঝেই সীমাবদ্ধ রয়েছেন। তারা শিক্ষকতার প্রথম বছর যে কিতাব যেভাবে পড়িয়েছেন, আজও সেই কিতাব সেভাবেই পড়িয়ে যাচ্ছেন। একই বিষয়ের আর দশটা কিতাব মুতালাআ' করার মাধ্যমে তাদের ইলমে কোন ইযাফাহ বা সংযোজন হয়নি। তাদের পাঠদানে বিশেষ কোন নতুনত্ব আসেনি। পার্থক্য শুধু একটাই। শুরুর দিকে পড়াগুলো দেখে আসতে হ'ত। তবে এখন আর দেখে আসা লাগে না। এঁরা 'জামেদ'। এঁরা জড়। এঁরা অনেকটা রোবটিক সিস্টেমের মত একই নিয়মে যুগ যুগ ধরে চলছেন।

অপরদিকে 'মাছদার' বলতে ঠিক এর উল্টো। তারা শিক্ষকতা শুরুর দশ বছর পরে আর সেখানে নেই। তিনি যে বিষয়গুলো পড়ান, এই দশ বছরে সেগুলোর ওপরে দেশী-বিদেশী অনেক কিতাব ঘেঁটে তিনি একরকম বিশেষজ্ঞ হয়ে গেছেন। যতই দিন যাচ্ছে তিনি ততই বোদ্ধা হয়ে উঠছেন। তার দারসে ছাত্ররা বসতে আগ্রহী হচ্ছে। কারণ তার ক্লাসে সর্বদা নতুন কিছু শেখা যায়। এমন কিছু তার মুখে শোনা যায় যা বইয়ে লেখা নেই। তার কাছে কিতাব পড়ার মাধ্যমে শিক্ষকের কাছে পড়ার পূর্ণ উদ্দেশ্য সাধিত হচ্ছে।

আমাদের মাদ্রাসাগুলোতে যখন শিক্ষক নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয় তখন সেখানে লেখা হয়, 'যোগ্যতা : দাওরায়ে হাদীছ। তবে অভিজ্ঞদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে'। অভিজ্ঞতা বলতে আমরা শুধু বুঝি, তিনি কোন প্রতিষ্ঠানে কত বছর শিক্ষকতা

** শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

করেছেন। অনেকেই রয়েছেন দশ বছর শিক্ষকতা করার পরে প্রতিষ্ঠান পরিবর্তন করতে আসেন। নাহু পাঠদানে তার দশ বছরের অভিজ্ঞতা। তবে নাহবেমীর ও হিদায়াতুন্নাহু ছাড়া আর কোন নাহুর কিতাব তার মুতালাআ' করা হয়নি! এই অভিজ্ঞতার দাম কী?

আমাদের এটাও জানতে চাওয়া দরকার যে, তিনি এই দশ বছরে গায়রে দারসী কতগুলো নাহুর কিতাব পড়েছেন, কতগুলো বালাগাতের কিতাব পড়েছেন, কতগুলো হাদীছের কিতাব পড়েছেন, কতগুলো তাফসীর পড়েছেন। একজন সদ্য দাওরা শেষ করা ছাত্রের ইন্টারভিউ এবং দশ বছরের পুরাতন শিক্ষকের ইন্টারভিউ কখনোই একরকম হবে না। ঠিক একইভাবে প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষকদের বাৎসরিক পড়াশোনার হিসাব নেয়া দরকার। এটা জানা দরকার, তাদের কি পড়াশোনা চলমান রয়েছে, নাকি শিক্ষকতার ইন্টারভিউয়ে উত্তীর্ণ হওয়ার সাথে সাথেই তারা 'আল্লামাতুদ দাহর' হয়ে গেছেন! পড়াশোনা থেকে অমুখাপেক্ষী হয়ে গেছেন! এগুলোর মাধ্যমেই জানা যাবে যে, শিক্ষকটি জামেদ নাকি মাছদার।

আপনার মনে হ'তে পারে যে, এটা জানার কি খুবই দরকার! জ্বি, এর ওপরে অনেক কিছু নির্ভর করে। কারণ জামেদ শিক্ষকরা ছাত্রদের শুধু ততটুকুই শেখাতে পারেন যা তিনি দাওরায়ে হাদীছ পর্যন্ত পড়েছেন। এতে করে কিছু জামেদ ছাত্র তৈরি হয়। তারা মনে করে, এই পাঠ শুধু এই বইয়ের মাঝেই সীমাবদ্ধ। এর বাইরে দুনিয়ায় আর কিছু জানার নেই। এরাই পরবর্তীতে যে কোন কিতাবের লেখাকে অহি মনে করে। পক্ষান্তরে শিক্ষক যদি মাছদার হন তবে তিনি নিত্য নতুন কিতাব থেকে ইলম আহরণ করবেন। ক্লাসের আলোচনায় অটোমেটিক সেগুলো চলে আসবে। অনেক অজানা কিতাবের নাম আসবে। ছাত্ররা জানতে পারবে, এই আলোচনা এই বই ছাড়াও অনেকগুলো বইয়ে রয়েছে। সেগুলো আমাদের পড়া দরকার। এই ধরনের শিক্ষক নিত্য নতুন গবেষণার মাধ্যমে নিজের স্তর যেমন উন্নত করবেন তেমনই ছাত্রদেরও স্তর উন্নত হবে। সুতরাং শিক্ষকতায় 'মাছদার' হওয়ার চেষ্টা করুন। সারাদিন শুধু পয়সা উপার্জন নয়। কিছু ইলমী উপার্জন, কিছু নিজের পড়াশোনার জন্যও সময় রাখুন।

বিষয়ভিত্তিক দারস প্রদান : বিষয়ভিত্তিক দারস বলতে আমরা সারমর্ম আলোচনা করা বুঝি। আমাদের অনেক ধরনের শিক্ষক রয়েছেন। কিছু শিক্ষক আছেন যারা প্রতিদিনের দারস কিতাব থেকেই মুতালাআ' করে আসেন না। আবার কেউ কেউ মুতালাআ' করে এসে লাইন বাই লাইন পড়িয়ে যান। এর বাইরে কিছু শিক্ষক আছেন যারা কিতাব মুতালাআ' করে সেটা ভালভাবে বুঝে দারসে এসে নিজের ভাষায় বোঝানোর চেষ্টা করেন। এটাই সবচেয়ে উচ্চ স্তর। তারা মনে করেন, এটাই হয়ত বিষয়ভিত্তিক দারস। তবে এটা বিষয়ভিত্তিক দারস নয়।

বিষয়ভিত্তিক দারস প্রদানের জন্য একজন শিক্ষককে কমপক্ষে পাঁচটি কিতাব মুতালাআ' করতে হবে। একই আলোচনা কোন কিতাবে কতটুকু আলোচিত হয়েছে, কিভাবে হয়েছে। কোন কিতাবে কোন বিষয়কে মুখ্য এবং কোন বিষয়কে গৌণ করে উপস্থাপন করা হয়েছে। এই সবগুলো বিষয় নিজের ভেতরে নিয়ে সেখান থেকে সারমর্ম আলোচনা করার নামই হ'ল বিষয়ভিত্তিক দারস প্রদান। যা আমাদের মাঝে নেই বললেই চলে। এটার কারণ হ'ল সাইড পেশা নির্বাচনে ভুল হওয়া। হয়ত সে কারণেই পড়াশোনার সাথে সম্পর্ক কমে যাচ্ছে। সুতরাং প্রথম দুইটি পরামর্শ যদি আপনি গ্রহণ করেন তবে আপনি ধীরে ধীরে বিষয়ভিত্তিক দারসে সক্ষম হয়ে উঠবেন ইনশাআল্লাহ।

ইনপুট ও আউটপুট সক্রিয় রাখুন : বিষয়ভিত্তিক দারসে সক্ষম হয়ে উঠলে আপনার দায়িত্ব হবে, 'ইনপুট' ও 'আউটপুট' সক্রিয় করা। বিষয়টি আমি বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করছি। এই উপদেশ আমরা শিক্ষার্থীদেরই দিয়ে থাকি। তবে শিক্ষার্থীদের একটি চিরাচরিত গুণ হ'ল, তাদেরকে যে উপদেশই দেয়া হোক তারা প্রথমেই যাচাই করবে, উপদেশ দাতার মাঝে এই গুণের উপস্থিতি আছে কি-না। যদি উপদেশদাতার মাঝেই এই গুণের উপস্থিতি না থাকে তবে তারা উপদেশ গ্রহণ করতে চায় না। হয়ত আমাদের এই দুর্বলতার কারণেই তারা আমাদের কাছে উপদেশ গ্রহণ করছে না।

'ইনপুট' বলতে আমি আরবী ভাষার কথা বলছি। যে ভাষার মাধ্যমে কুরআন ও হাদীছ থেকে জ্ঞান আপনার ভেতরে প্রবেশ করবে। আপনি যদি আরবী না বোঝেন তবে কখনোই জ্ঞানের উৎস থেকে জ্ঞানার্জন করতে পারবেন না। এজন্য প্রথমেই আরবীর ওপর মেহনত বাড়ান। অধিকহারে শব্দ শিখুন। যত বেশী শব্দ শিখতে পারবেন ততই আপনি ভাষার ওপরে দখল পাবেন। আরবীকে এমনভাবে শিখুন, যেন কোন কিতাব আপনার কাছে ভাষাগত দিক থেকে দুর্বোধ্য মনে না হয়। এই অবস্থায় উন্নীত হওয়ার পরে দেখবেন, আপনার মনের জানালা খুলে গেছে। খোলা জানালা দিয়ে যেমন হু হু করে ঘরে বাতাস প্রবেশ করে, তেমনি আপনার মনের মাঝেও ইলমের উপস্থিতি বুঝতে পারবেন।

এরপরে আমি বলেছি, 'আউটপুট' সচল করুন। অর্থাৎ আপনি যে জ্ঞান অর্জন করেছেন সেটা যেন সুন্দরভাবে গুছিয়ে একজন মানুষের সামনে উপস্থাপন করতে পারেন। এজন্য আপনাকে বাংলা ভাষায় পারদর্শী হ'তে হবে। কুরআন-হাদীছের জ্ঞানার্জনের পরে আপনার একটি চিন্তাধারা তৈরি হয়েছে। নিজস্ব কিছু মতামত তৈরি হয়েছে। আপনি যদি সেই চিন্তাধারাকে আপনার ভেতর থেকে বের করে মানুষের কাছে উপস্থাপন করতে না পারেন। তবে আপনার ইলম দ্বারা শুধু আপনিই উপকৃত হ'লেন। অন্য কেউ হ'ল না। এটা কি কখনো ইলমে নাফে' বা উপকারী জ্ঞান হ'তে পারে?

'আউটপুট' সক্রিয় করার জন্য আপনি লেখালেখি শিখতে পারেন। কোন চিন্তাধারা গুছিয়ে লিখে দিলেন। মানুষ সেটা পড়ে আপনার চিন্তাধারার সাথে পরিচিত হ'ল। তার কাছে দাওয়াত পৌঁছে গেল। আবার আপনি বক্তব্যও শিখতে

পারেন। শুদ্ধভাবে গুছিয়ে কথা বলা শিখতে পারেন। এগুলোর মাধ্যমেও আপনি নিজের ইলম মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারবেন। আমাদের অনেক ভাল আলেম রয়েছেন যারা অনেক ইলমের অধিকারী। তবে 'আউটপুট' সক্রিয় না হওয়ার কারণে অবহেলিত হচ্ছেন। অনেকে আবার 'আউটপুট' বেশ সক্রিয় করে ফেলেছেন তবে 'ইনপুট' অচল। এদের মাধ্যমেও মানুষের খুব বেশী উপকার হয় না।

টেকনোলজি সম্পর্কে ধারণা রাখুন! শুধু শিক্ষকতাই নয়, যে কোন পেশাতে আপনি যদি নিজেকে আপ টু ডেট রাখতে না পারেন তবে দিনে দিনে আপনি পিছিয়ে পড়বেনই। সুতরাং আপনাকে নিজ পেশার বর্তমান চাহিদা বুঝতে হবে। একটা সময় লেখালেখির সিম্বল বুঝাতে 'দোয়াত-কলম' ব্যবহার করা হ'ত। তবে এখন ব্যবহার করা হয় 'ল্যাপটপ ও কফির মগ'। বোঝা গেল, সময়ের সাথে সাথেই সবকিছু পরিবর্তন হয়। সেই পরিবর্তন আপনি পসন্দ করেন বা না করেন, তা হবেই। সুতরাং বিরোধিতা না করে, ব্যক্তিগত নযরিয়্যাত প্রকাশ না করে যোগ্য হওয়ার চেষ্টা করুন।

একজন দুধ বিক্রেতা সেই এলাকাতে দুধ বিক্রি করতে যায়, যেখানে দুধ কেনার মানুষ রয়েছে। একজন মধু বিক্রেতা সেখানে দোকান দেয়, যেখানে মধু কেনার মানুষ রয়েছে। আপনি একজন শিক্ষক হিসাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসেন। কারণ এখানে শিক্ষা নেওয়ার মানুষ রয়েছে। একজন আদর্শ শিক্ষক হিসাবে আপনাকে সেখানেই যেতে হবে যেখানে শিক্ষার্থী রয়েছে। আজকের যুগে অফলাইন প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি অনলাইন শিক্ষাব্যবস্থা বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠেছে। অফলাইনের তুলনায় অনলাইনে ছাত্র অধিক। শেখার চাহিদা অনেক। আপনি ভুল বুঝবেন না যে, আমি আপনাকে অফলাইন ছেড়ে অনলাইনে চলে যেতে বলছি। অনলাইন সর্বদা টেম্পোরারি। যখন তখন এর অস্তিত্ব হারিয়ে যেতে পারে। তবে যতক্ষণ রয়েছে ততক্ষণ আপনারও পদচারণা থাকুক সেখানে। দোষের কী?

একজন শিক্ষক হিসাবে আপনাকে এম.এস.ওয়ার্ডের ব্যবহার জানতে হবে। পরীক্ষার প্রশ্ন যেন আপনি নিজেই করতে পারেন। ছাত্রদের যদি কখনো কোন শীট দেয়ার প্রয়োজন হয়, সেটা যেন নিজেই তৈরি করতে পারেন। আত্মউন্নয়ন-মূলক লিফলেট তৈরি করে ছাত্রদের দিতে পারেন। আপনাকে পাওয়ার পয়েন্টের কাজ জানতে হবে। কোন আধুনিক সেমিনারে কোন বিষয় বুঝানোর জন্য আপনি যেন সুন্দরভাবে নিজের মত করে একটি প্রেজেন্টেশন তৈরি করতে পারেন। কোন উন্নত প্রতিষ্ঠানে যদি ডিজিটাল বোর্ডে ক্লাস নিতে হয় তবে আপনি যেন অপারগ হয়ে না পড়েন। আপনি যেন সুন্দরভাবে স্লাইড তৈরি করে ক্লাস নিতে পারেন। এগুলো শিক্ষক হিসাবেই আপনার শেখা দরকার।

বর্তমানে যে কোন বিষয় খুব দ্রুত সমাধানের জন্য বা স্বল্প সময়ে যে কোন বিষয়ের ওপরে একটি মানসম্মত ক্লাসের প্রস্তুতি নিতে আপনাকে আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা চ্যাটবট ব্যবহার করা শিখতে হবে। কিভাবে তাকে কমান্ড করতে হয়, আপনার কাজগুলো সে কিভাবে আরো সহজ করতে পারে সেগুলো জানতে হবে। আপনি যে বিষয়গুলো পাঠদান করেন সে বিষয়গুলোর তথ্য, পিডিএফ বই বা বইয়ের ওয়ার্ড কপি কোন ওয়েবসাইটে পাওয়া যায় তা আপনাকে জানতে হবে। এই বিষয়গুলো যদি আপনি না জানেন এবং গলা বাজিয়ে বলতে থাকেন, 'এগুলোর ভেতরে কোন ইলম নাই! এগুলো সব দাজ্জালের ফিতনা'! তবে দিনশেষে দেখবেন, সবাই এগিয়ে গেছে। পেছনে রয়ে গেছেন আপনি এবং আপনার গলাবাজি।

আমরা এমন অনেক হাদীছের শিক্ষক দেখেছি, যারা সারাদিন হাদীছের মসনদেই থাকেন। অথচ তারা 'মাকতাবা শামেলা' ব্যবহার করতে জানেন না। আচ্ছা! এটাও কি দাজ্জালের তৈরি! আপনি হয়ত নিজের মুতালাআ' ও পাঠদানের ওপর খুবই সন্তুষ্ট! তবে আপনি জানেন না, এর সাথে যদি আপনি 'মাকতাবা শামেলা' ব্যবহার জানতেন তবে সে আপনাকে কোন মাত্রায় পৌঁছে দিত। এজন্য আমাদের মনে হয়, হাদীছের সাথে যুক্ত সকল শিক্ষককে 'মাকতাবা শামেলা' ব্যবহার করা জানতে হবে। দেখুন! এগুলো শিখতে একযুগ সময় লাগবে না। আপনি শিক্ষকতায় এসেছেন তার অর্থই আপনি মেধাবী। শুধু একটি রামাযান মেহনত করে আপনি যদি এগুলো শিখে নেন তবে আমাদের ধারণা, আপনি সবকিছুই শিখতে পারবেন। তবে কোন রামাযানে শিখবেন সেটা নির্ধারণের পূর্বে আগ্রহের মাত্রা বাড়াতে হবে এবং অতিরিক্ত ও অনর্থক আত্মসম্মান কমাতে হবে। কারণ উচ্চ আত্মসম্মানবোধ ইলম অর্জনে প্রতিবন্ধক। এই পর্যায়ে আমরা কিছু দোষ নিয়ে আলোচনা করব, যেগুলো থেকে আমাদের বেরিয়ে আসা দরকার।

দুনিয়া সম্পর্কে একজন শিক্ষকের দৃষ্টিভঙ্গি : আমরা জানি দ্বীনী খিদমতের পথ কণ্টকাকীর্ণ। তারপরও কিছু মানুষকে এই কাজের সাথে যুক্ত থাকতে হবে। নিঃস্বার্থ হয়েই কাজ করতে হবে। অন্যথা মানুষ দ্বীনের ব্যাপারে অজ্ঞ হয়ে পড়বে। অবশ্য কিছু মানুষ সবকিছু জেনে বুঝেই তাদের সন্তানদের এই পথে পাঠান। দ্বীনী বিদ্যাপিঠে তাদের সন্তানরা এক বুক আশা নিয়ে পা রাখে যে, সে একজন আলেম হবে। কুরআন ও হাদীছের ধারক-বাহক হবে। এই ছেলেগুলোও একটা সময় পরে আলেম হওয়ার বাসনা পরিত্যাগ করে। আমাদের হাত ফসকে বেরিয়ে যায়! আমরা তাদেরকে দ্বীনী শিক্ষায় ধরে রাখতে পারি না।

আমরা মনে করি, এই সমস্যা কিছুটা শিক্ষক কেন্দ্রিক। কারণ আলেম হওয়ার স্বপ্নে যারা মাদ্রাসায় এসেছে তাদের আলেম হওয়ার স্বপ্নই দেখানো উচিৎ। এখন আমার শিক্ষক যদি ক্লাসে এসে এই আফসোসের গল্প শোনান যে, তিনি একটুর জন্য বিসিএস করতে পারেননি। ডাক্তার হ'তে পারেননি। আজ যদি তিনি বিসিএস করতে পারতেন তবে তিনি আর এখানে পড়ে থাকতেন না। ঢাকায় তার তিনটা বাড়ি হ'ত।

এই দুখ্কান্না শুনে আমি আপনার অপূর্ণ স্বপ্নকে নিজের জীবনে পূর্ণ করতে চাইব। কারণ আমি আপনার ছাত্র। আপনার প্রভাবে আমি পূর্ণ প্রভাবিত। এই সমস্যা গুটিকয়েক জেনারেল শিক্ষকদের মাধ্যমে ঘটে বেশী। দুঃখিত! আমি আপনাকে আঘাত করছি না। যদি সেই সমস্যা আপনার মাঝেও থাকে তবে সংশোধনের চেষ্টা করছি।

আমাদের জেনারেল শিক্ষকদের কাছে আমরা ভিন্ন শিক্ষা পেয়েছি। তারা আমাদের তালিবুল ইলম হিসাবে যথেষ্ট সম্মান দিতেন। জেনারেল শিক্ষকরা আমাদের ক্লাসে এসে বলতেন, 'আপনাদের ভাগ্য অনেক ভাল যে, আল্লাহ আপনাদের দ্বীনী শিক্ষার জন্য কবূল করেছেন। আমরা জীবনটাকে নষ্ট করেছি। আমরা না জানি আল্লাহ্র বাণী, না জানি ইসলামের বিধি-বিধান। আপনারা অনেক বড় আলেম হবেন ইনশাআল্লাহ। দেশ ও দশের হেদায়াতের দিশারী হবেন। আর আপনাদের যেহেতু দু'অক্ষর শিখাচ্ছি এজন্য আপনারা হাশরের ময়দানে আমাদের জন্য সুপারিশ করবেন। আমাদের এই শিক্ষার কোন দাম নেই। কুরআন-হাদীছ ভালভাবে শিখেন। ইহকাল এবং পরকালে সুখী হবেন ইনশাআল্লাহ'। এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির জেনারেল শিক্ষকদের সংখ্যা আজ যথেষ্ট কম!

প্রিয় জেনারেল শিক্ষকগণ! আপনাদের প্রতি অনুরোধ করছি। দয়া করে ছাত্রদের দুনিয়াদার বানাবেন না। আপনি ইলমে দ্বীন শিক্ষা করেননি। আপনার সন্তানদেরও করাননি। আপনারা তো আপনাদের দৃষ্টিতে দুনিয়ার সকল সুখ ও সমৃদ্ধি পেয়েই গেছেন। আপাতত যে ছেলেগুলো আলেম হ'তে, দ্বীনের খাদেম হ'তে আমাদের মাদ্রাসাগুলোতে চলে এসেছে তাদের অন্তত দ্বীনের খাদেম হওয়ার সুযোগ দিন। দুনিয়ার লালসা তাদের মাথায় না দিয়ে আখেরাতের লোভ দেখান। যদি আপনার কথায় প্রলুব্ধ হয়ে একটি ছেলেও মাদ্রাসা থেকে চলে যায়, তবে এর দায়ভার আপনার। আপনি কোনদিন একটি স্কুল পড়ুয়া ছেলেকে মাদ্রাসায় আনতে পারেননি। তাহ'লে আপনার কথায় যারা মাদ্রাসা থেকে চলে যাচ্ছে তাদের ক্ষতিপূরণ আপনি কোথা থেকে দিবেন!

শিক্ষকতায় উপার্জিত টাকা কি হারাম হ'তে পারে : আমি যদি বলি, শিক্ষকতায় যে মাসিক বেতন পাওয়া যায় সেটা কি কখনো হারাম হ'তে পারে? তবে একবাক্যেই সবাই বলবে, কখনোই নয়। শিক্ষকতায় উপার্জিত অর্থ তো আহাল্লুল হালাল। তবে আমি আপনাকে দেখাতে পারি যে, একজন শিক্ষকের বেতন হারাম হ'তে পারে। আপনি হয়ত হারামকে চিনতে পারেননি। এজন্য আপনার এমন মনে হয়। তবে বাস্তবতায় হালাল খুব কঠিন জিনিস। নিজেকে হালালের মাঝে সীমাবদ্ধ করা খুব কঠিন কাজ। যদি তা কঠিন না হ'ত তবে রাসূল (ছাঃ) নিজের জন্য হালালের দো'আ করতেন না।

একটি মোবাইল যদি সকালে ফুল চার্জ করে আপনি ব্যবহার করা শুরু করেন তবে দুপুর হ'তেই তার চার্জ ফুরিয়ে আসবে। এটাই স্বাভাবিক। এখন আপনাকে যদি সকালে মোবাইলটি ফুল চার্জ দিয়ে বলা হয়, আপনাকে এটা রাত ১১টা পর্যন্ত ব্যবহার করতে হবে, তবে আপনাকে ব্যবহার পদ্ধতি পরিবর্তন করতে হবে। শুরুতেই আপনি ফোন পাওয়ার সেভিং মুডে নিয়ে যাবেন। ব্রাইটনেস যথাসম্ভব কমিয়ে দিবেন। শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় কাজগুলোই করবেন। ফ্লাশ লাইট জ্বালাবেন না। ক্যামেরা চালু করবেন না।

ঠিক তেমনই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কিছু শিক্ষক রয়েছেন যারা ক্লাসে এসে পাওয়ার সেভিং মুডে থাকেন। শিক্ষকরা সবাই মানুষ হয়। তাদের শরীরের নির্দিষ্ট একটা ধারণ ক্ষমতা রয়েছে। সেই ক্ষমতাকে তারা সঞ্চয় করেন। পূর্ণ ক্লাসটাইম তাদের ব্রাইটনেস কমানো থাকে। কারণ তাদের এ্যানার্জি সেভ করতে হয় কোচিং এর জন্য। কোচিংয়ে তারা যতটুকু সক্রিয়, ক্লাসে তারা ততটুকু সক্রিয় নন। ক্লাস টাইমে তারা রেস্ট মুডে থাকেন। নিজের ছোটখাটো প্রয়োজনগুলো পূরণ করেন। এবার আপনি বলুন, এই শিক্ষকদের মাসিক বেতন কি পাওয়ার সেভিং মুডে থাকার জন্য দেয়া হয়! নাকি নিজের সর্বোচ্চটা দিয়ে মেহনত করার বিনিময়ে দেয়া হয়! কোন রকমে মাস পার করে প্রতিষ্ঠান থেকে নেয়া মাসিক বেতন কি তাদের হালাল হচ্ছে? এজন্য সকল শিক্ষকের উপার্জন চোখ বন্ধ করে হালাল বলার কোন সুযোগ নেই।

অনেক শিক্ষককে দেখেছি, যারা অভিভাবকের কাছে টাকা কর্য নেন। আবার পরিশোধেও গড়িমসি করেন। এদিকে সন্তান আপনার কাছে পড়ে বলে অভিভাবকও কিছু বলতে পারে না। অনেকে আবার অভিভাবকের কাছে চেয়ে দাওয়াত নেন। আপনার এই অসহায়ত্ব দেখে ছাত্রদের মাথায় একটি বিষয় উঁকি দেয় যে, উস্তাযকে বাসায় দাওয়াত দিলে হয়ত তিনি আমাকে স্নেহ করবেন। বাসা থেকে আসার সময় তার জন্য কিছু নিয়ে আসলে হয়ত তিনি আমাকে অন্যদের তুলনায় বেশী সুযোগ-সুবিধা দিবেন। আচ্ছা, বলুন তো, একজন শিক্ষকের বিষয়ে ছাত্ররা এমন ধারণা রাখবে কেন? এটা কি একজন শিক্ষকের জন্য খুবই সম্মানের?

আপনার অনাগত ছাত্রদের পক্ষ থেকে বিশেষ আরয : আমি আপনাদের ছাত্র। বিশেষত এই লেখায় প্রত্যেকটি কথা আমি আপনাদের অনাগত হাযার হাযার ছাত্রের পক্ষ থেকেই বলছি। কথা বলতে গিয়ে হয়ত আমি আমার সকল সীমা পেরিয়ে গেছি। আমার কথার কর্কশতাকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। আমি আপনার একজন ছাত্র হিসাবেই আপনাকে বলেছি, আপনি যোগ্য হোন। আমাদের জীবনগুলো আপনারা নষ্ট করবেন না। আমাদেরকে দুনিয়ার পেছনে ছোটার স্বপ্ন দেখাবেন না। ছাহাবায়ে কেরামের কাছে যেমন ছিলেন রাসূল (ছাঃ), তাবেঈগণের কাছে যেমন ছিলেন ছাহাবায়ে কেরাম, আমাদের কাছে আপনারা তেমনই। আমরা আমাদের দারসে শিক্ষক হিসাবে ইমাম বুখারীকে চাই না। কারণ আমরা তো ইমাম মুসলিমের মত নই। আমরা আমাদের দারসে শিক্ষক হিসাবে আপনাদেরই চাই। তবে দায়সারাভাবে নয়, দরদী হিসাবে। চাকুরীজীবী হিসাবে নয়, রাহবার হিসাবে। সময় কাটানোর জন্য নয়, দক্ষ হিসাবে।

আমরা চাই, আপনারা আমাদের আদর্শ হোন। আপনাদের প্রতিটি কথা, কাজ যেন আমাদের জন্য অনুসরণীয় হয়। আমরা আপনাদের মুখে অশ্লীল ভাষা শুনতে চাই না। আমরা আপনাদের অন্তর থেকে সম্মান করি। আমরা চাই, আপনারা সেই সম্মানের জায়গাটা সারা জীবন ধরে রাখেন। দশ বছর পরে যেন আমাদের মনে না হয়, আপনাদের কাছে না পড়ে অন্য কারো কাছে পড়লে হয়ত আমাদের জীবনটা সুন্দর হ'ত। যোগ্যতা আরো কিছুটা বেশী হ'ত।

শ্রদ্ধেয় শিক্ষকগণ! ছাত্র যদি শিক্ষকের গর্ব হ'তে পারে তবে শিক্ষক কেন ছাত্রদের গর্ব হবে না! আমাদের তো ইচ্ছা হয়, ভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বন্ধুদের সামনে আমরা আপনাদের নিয়ে গর্ববোধ করি! যখন তারা তাদের শিক্ষকের গুণ বর্ণনা করে, তখন আমাদেরও মন চায় আপনাদের কিছু গুণ বর্ণনা করি! সেই সুযোগ কি আমরা পাবো না! আমরা কি গর্বভরে বলতে পারবো না যে, আমাদের অমুক শিক্ষক একাধিক ভাষার ওপর কিংবদন্তি। আমাদের অমুক শিক্ষক হাদীছের মসনদে বসলে মনে হয় যেন ৩০০ হিজরীর কোন ইমাম বসে আছেন। অমুক শিক্ষকের উছূলের দারসে বসলে মনে হয় তার রক্ত-গোশতেও উছূল মিশে আছে। আমরা কেন বলতে পারবো না!

শ্রদ্ধেয় আসাতিযায়ে কেরাম! আপনারা কি এখনো শিক্ষকতার মহান দায়িত্ব সম্পর্কে অবগত হননি? আপনারা কি এখনো বুঝতে পারছেন না যে, আপনাদের কি করা দরকার? যদি বুঝতে পারেন, তবে আর দেরী কেন? কিসের অপেক্ষা? আজ থেকেই শুরু হোক নতুনভাবে পথচলা। আজ থেকেই শুরু হোক রাত্রি জাগরণ। আজ থেকেই শুরু হোক পদচিহ্ন রেখে যাওয়া। এই দুইদিনের দুনিয়ার সাথে আপনাদের কোন বোঝাপাড়া নেই। আপনারা শিক্ষক। প্রজন্ম গড়ার কারিগর। প্রজন্মের হাত ধরে অমরত্বের পানে হোক আপনাদের নিরন্তর ছুটে চলা।

ডিলারশীপ ও পাইকারী ক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন : ০১৭৮২-৪৬৪০৯৮

খুচরা মূল্য :

- কালোজিরা ফুলের মৌসুমের মধু-৫০০ গ্রাম ৫৯০/-
- বরই ফুলের প্রাকৃতিক মধু-৫০০ গ্রাম ৫৯০/-
- প্রাকৃতিক বিভিন্ন ফুলের মিক্স মধু-৫০০ গ্রাম ৫৫০/-
- বিভিন্ন ফুলের মিক্স মধু-৫০০ গ্রাম ৩৪০/-
- সরিষা ও লিচু ফুলের মিক্স মধু-৫০০ গ্রাম ২৯৫/-
- শক্তি প্লাস আরোগ্য কালোজিরা তেল ৭৫ মিলি. ১৭০/-
- শক্তি প্লাস শান্তির দূত জয়তুন তেল ৭৫ মিলি. ১৭০/-

যোগাযোগ : প্রত্যাশা এন্টারপ্রাইজ, প্রসাদপুর বাজার, মান্দা, নওগাঁ। মোবাইল : ০১৭৮২-৪৬৪০৯৮

পাঠক-পাঠিকা ও শুভানুধ্যায়ীদের দৃষ্টি আকর্ষণ

আসসালা-মু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহ

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুখপত্র, ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা মাসিক আত-তাহরীক ১৯৯৭ সাল থেকে অদ্যাবধি নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। ফালিল্লাহিল হাম্দ। ধর্মীয় বিষয়ের পাশাপাশি রাজনীতি-অর্থনীতি, শিক্ষা ও সংস্কৃতিসহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সকল বিষয়ে পত্রিকাটি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে দিক নির্দেশনা প্রদান করে আসছে। আপোষহীন ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে শিরক ও বিদ'আতমুক্ত সমাজ গড়ার লক্ষ্যে। অতএব আত-তাহরীক-এর কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করা এবং বাংলার ঘরে ঘরে নির্ভেজাল এই দাওয়াত পৌঁছে দেওয়ার জন্য আপনাদের সার্বিক সহযোগিতা আমাদের একান্ত কাম্য।

দেশ-বিদেশের সকল পাঠক-পাঠিকা ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি আমাদের নিবেদন, আত-তাহরীক নিজে পড়ুন, অন্যকে পড়তে উৎসাহিত করুন এবং ছাদাক্বায়ে জারিয়া হিসাবে পরিচিতজনদের মাঝে নিয়মিতভাবে বিতরণ করুন! মনে রাখবেন আপনার মাধ্যমে যদি একজন মানুষও হেদায়াত লাভ করে, সেটি আপনার জন্য সর্বোৎকৃষ্ট লাল উট কুরবানী করার চেয়েও শ্রেষ্ঠ হবে' *(বুখারী হা/২৯৪২)*। তাছাড়া হেদায়াতপ্রাপ্ত ব্যক্তির আমলের সমপরিমাণ নেকীও আপনার আমলনামায় যোগ হবে' *(মুসলিম হা/১০১৭)*। সুতরাং আত-তাহরীক বিতরণের মাধ্যমে আপনিও হ'তে পারেন কলমী জিহাদের গর্বিত অংশীদার। আপনার প্রেরিত নিয়মিত/অনিয়মিত অনুদানে মাসিক আত-তাহরীক পৌঁছে যাবে দেশের প্রতিটি ঘরে ঘরে। শিরক-বিদ'আতের জাহেলিয়াত থেকে মুক্ত হয়ে মানুষ খুঁজে পাবে চিরন্তন হেদায়াতের দিশা ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন!

অনুদান প্রেরণের ঠিকানা : মাসিক আত-তাহরীক, হিসাব নং এসএনডি ০০৭১২২০০০০১১৫, আল-আরাফা ইসলামী ব্যাংক, রাজশাহী শাখা। বিকাশ নং : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০। (বিঃ দ্রঃ অনুদান প্রেরণের পর আমাদেরকে অবহিত করার অনুরোধ রইল)।

সার্বিক যোগাযোগ : মাসিক আত-তাহরীক, নওদাপাড়া, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০, ০১৭১৭-৫০৬৮৬৫।
পত্রিকা সংক্রান্ত যেকোন পরামর্শ প্রদানের জন্য যোগাযোগ করুন- মোবাইল : ০১৭২০-০৫৯৪৪২, ইমেইল : tahreek@ymail.com

শিশুর আবেগকে অবহেলা নয়

*জাহিদ হাসান**

আমাদের সন্তানরা বড় হ'তে হ'তে জীবনের নানা ধাপে নানা রকম মানসিক আঘাত পায়। এই আঘাতগুলোর প্রতিক্রিয়ায় কোন কোন শিশু ভেঙে পড়ে, আবার কেউ কেউ সময়ের সাথে সেই আঘাত থেকে নিরাময় লাভ করে। কেউ আঘাত পেয়ে তা কাটিয়ে উঠে, আবার কেউ তা নিজের ভেতরে জমিয়ে রাখে। এটা আসলে কেন হয়? এটাই আজকের আলোচনার বিষয়।

শিশুদের বেড়ে ওঠার পথে নানা ধরনের আবেগীয় আঘাত পাওয়া একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। এই আবেগীয় আঘাতগুলো সে কিভাবে মোকাবেলা করবে তার ওপরে নির্ভর করে শিশুর ভবিষ্যত মানসিক স্বাস্থ্য। এখন আমরা জানব, অভিভাবক হিসাবে আমরা আমাদের সন্তানদের আবেগীয় আঘাত থেকে সেরে উঠতে সাহায্য করতে পারি। যার ফলে তারা একটি সুস্থ ও সুখী ব্যক্তিত্বে পরিণত হ'তে পারে।

প্রথমেই আমরা শিশুদের দুই ভাগে ভাগ করব। প্রথমতঃ সুস্থ আবেগের অধিকারী শিশু। দ্বিতীয়তঃ আঘাতপ্রাপ্ত আবেগের অধিকারী শিশু। সুস্থ আবেগের অধিকারী শিশুর বৈশিষ্ট্য হ'ল, সে অনেক বেশী আত্মবিশ্বাসী, আনন্দময় ও শান্ত স্বভাবের হয়। তার ভেতরে কিছু বিশেষ গুণ লক্ষ্য করা যায়। যেমন আত্মসন্তুষ্টি। সে নিজের সম্পর্কে যথেষ্ট সন্তুষ্টি অনুভব করে। নিজেকে নিজের মত করে গ্রহণ করতে পারে। সে ভাবে, আমি যেমন, তেমনই ঠিক আছি। তার ভেতরে স্বাধীনতা লক্ষ্য করা যায়। সে অন্যের প্রশংসা ছাড়া টিকে থাকতে পারে। তাকে 'তুমি ভালো করেছ' 'তুমি সেরা' এসব কথা না বললেও সে নিজের কাজকে মূল্য দিতে শেখে। পাশাপাশি সে শান্ত ও সহনশীল হয়। সে পরিস্থিতি বোঝে এবং অন্যদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার ক্ষমতা রাখে। তার ভেতরটা শান্ত থাকে। চারপাশের কোলাহলেও সে ভারসাম্য বজায় রাখতে পারে।

সে আত্মবিশ্বাসী হয়। ভয় নয়, আত্মবিশ্বাস দিয়েই সামনে এগিয়ে চলে। নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস ও আত্মবিশ্বাসী হয়। সে নীরবতা উপভোগ করে। সব সময় স্বয়ংসম্পূর্ণ কারো সঙ্গ তার দরকার হয় না। সে নিজেকে সময় দেওয়া শেখে। পাশাপাশি তার ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হয়। সমস্যা হ'লেও সে নেতিবাচক নয়। সে সমাধান খোঁজে।

এ ধরনের একজন শিশুর চিত্র আমরা সামনে আনতে পারি। যেমন একজন ছেলের নাম রাফী। তার বয়স দশ বছর। সে একটি খেলায় হেরে গিয়েছে। তার বাবা-মা তাকে বলল, 'কোন সমস্যা নেই, তুমি ভালো খেলেছ। পরের বার আরও ভালো করার চেষ্টা করবে'। রাফী দুঃখিত হ'লেও, সে বুঝতে পারল যে, হারা-জেতা খেলার অংশ। সে পরের দিন আবার উৎসাহের সাথে অনুশীলন শুরু করল। এভাবে সে নিজের ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নিল এবং হতাশা থেকে নিজেকে দ্রুত উত্তরণ করতে পারল।

অন্যদিকে আহত আবেগের অধিকারী শিশুর বৈশিষ্ট্য আবার ভিন্ন। সে মানসিক ক্ষত নিয়ে বড় হয়। সে সহজে হাসতে পারে না। আত্মবিশ্বাসে ঘাটতি থাকে। নেতিবাচক চিন্তার মাঝেই সে জীবন পরিচালনা করে। সে সর্বদা অন্যের প্রশংসা ও স্বীকৃতির প্রয়োজন অনুভব করে। নিজের সম্পর্কে অনিরাপদ ও অনিশ্চিত বোধ করে। নিজেকে ছোট মনে করে। 'আমি পারি না', 'আমি যথেষ্ট ভালো না' এই ধারণা তার মনে গেঁথে যায়।

এ ধরনের শিশু নিজের সিদ্ধান্ত ও ক্ষমতা নিয়ে সর্বদা সন্দেহে থাকে। সিদ্ধান্ত নিতে ভয় পায়। সে নিজেই নিজের সবচেয়ে বড় সমালোচক হয়। সর্বদা নিজেকে অবহেলিত ও ভালোবাসাহীন অনুভব করে। তার ভেতর সবসময় একটা শূন্যতা কাজ করে। সব কিছুতে সে খারাপ ফলাফল দেখে। কোন কাজে তার আশা বা বিশ্বাস তৈরি হয় না, সবকিছুতেই সমস্যা দেখে। তার সুখ অনুভব করতে কষ্ট হয় এবং প্রায়ই সে অসন্তুষ্ট থাকে। সে আনন্দকে উপভোগ করতে জানে না, সবসময় মনে হয় কিছু একটা নেই।

এ ধরনেরও একজন শিশুর উদাহরণ আমরা সামনে আনতে পারি। যেমন তানভীর একজন নয় বছর বয়সী ছেলে। সে একটি বৃত্তি প্রতিযোগিতায় অংশ নিল। তবে কৃতকার্য হ'তে পারল না। তার বাবা-মা এটিকে ব্যর্থতা হিসাবে দেখিয়ে তাকে তিরস্কার করলেন। বললেন, 'তুমি আরও ভালো করতে পারতে। এভাবে কখনোই সফল হবে না। তুমি কিছুই পারো না'। এরপর থেকে আস্তে আস্তে তানভীরের মনে ভয় বাসা বাঁধতে শুরু করে। সে আর কোন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে না। সব কাজে তার আত্মবিশ্বাস হারিয়ে যায়। সে সর্বদা ভাবতে শুরু করে, সে যা করে তা ভাল হয় না। আর সে কখনোই ভালো কিছু করতে পারবে না। এবার আমরা ঐ সকল বিষয় নিয়ে আলোচনা করব যার কারণে শিশুরা মানসিক আঘাত পায়। যে আঘাত পারবর্তীতে শিশুর আবেগীয় ক্ষতের কারণ হয়।

অতিরিক্ত রাগ বা শাস্তি : যখন বাবা-মা ছোট ভুলের জন্য শিশুর উপর অতিরিক্ত রেগে যান বা শারীরিকভাবে শাস্তি দেন, তখন শিশু নিজেকে ছোট মনে করে এবং বাবা-মায়ের কাছেই নিরাপত্তাহীনতা অনুভব করে।

অবহেলা : অনেক বাবা-মা রয়েছেন যারা শিশুর আবেগীয় চাহিদা উপেক্ষা করেন। আমাদের মনে রাখতে হবে, শিশুরা শুধু খাবার বা পোষাক নয়, বরং ভালোবাসা, মনোযোগ ও আবেগীয় সাড়া পাওয়ার প্রয়োজন অনুভব করে। বাবা-মা যদি তাদের অনুভূতিকে গুরুত্ব না দেন বা সময় না দেন, তাহ'লে শিশু নিজের মূল্যহীনতা অনুভব করতে শুরু করে। যা ভবিষ্যতে তাকে সম্পূর্ণভাবে হীনমন্য করে ফেলে।

তুলনা করা : অনেক বাবা-মা শিশুদের বলেন, 'তোমার ভাই তো ভালো করে, তুমি কিছুই পারো না'? এই ধরনের কথায় শিশু ভাবতে শুরু করে, সে অন্য ভাই-বোন বা সহপাঠীর সাথে তুলনায় যথেষ্ট ভালো না। এতে হীনমন্যতা তৈরি হয়, শিশুর নিজস্বতা হারিয়ে যায়।

অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণ : শিশুর স্বাধীনতাকে অতিরিক্ত দমন করবেন না। যখন বাবা-মা শিশুর প্রতিটি পদক্ষেপ নিয়ন্ত্রণ করেন। সবকিছু নির্ধারণ করে দেন যে, সে কী পরবে, কী পড়বে, কার সাথে মিশবে তখন সে নিজের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে এবং তার স্বাধীনতাবোধ নষ্ট হয়। অবশ্যই এক্ষেত্রে আপনি পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করবেন এবং পাশে থাকবেন। তবে সবসময় নিজের মতকেই তার ওপর চাপিয়ে দেবেন না।

এই সবকিছুর পাশাপাশি বাবা-মায়েদের মানসিকভাবে সুস্থ হ'তে

** সহকারী শিক্ষক, শান্তি নিকেতন ইন্সটিটিউট, ফেনী।*

হবে। যদি তারা নিজেরাই মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন, তবে তা শিশুর উপর প্রভাব ফেলে। অর্থাৎ যদি বাবা-মা নিজের শৈশবের আঘাত বা মানসিক সমস্যাগুলো কাটিয়ে উঠতে না পারেন, তাহ'লে তারা অজান্তেই সেগুলো শিশুর উপর চাপিয়ে দিয়ে থাকেন। যা শিশুদের জন্য চরম ক্ষতিকর পরিণামের কারণ হয়।

শিশুর আবেগ প্রতিকারের উপায় :

প্রথমতঃ নিজেকে সংশোধন করুন। আপনি যদি অতীতের মানসিক ক্ষত থেকে বেরিয়ে না আসেন, তবে সন্তানের কাছে আপনি কখনোই আদর্শ হ'তে পারবেন না। শিশুদের আবেগিক স্বাস্থ্য উন্নত করতে অভিভাবক হিসাবে আপনি প্রথমে নিজের আবেগিক স্বাস্থ্য উন্নত করুন। আগে নিজের রাগ, হতাশা, উদ্বেগ নিয়ন্ত্রণ করুন। সন্তান যখন ভুল করে তখন চিৎকার নয়, বোঝানোর ভাষা ব্যবহার করুন। মনে রাখবেন, ওদের মস্তিষ্ক এখনো শেখার পর্যায়ে রয়েছে। ওদের এখন আপনি যা শেখাবেন তাই শিখবে।

এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট। কারণ শিশুরা অভিভাবকদের আচরণ অনুকরণ করে শেখে। পাশাপাশি অভিভাবকের রাগ ও অস্থিরতা শিশুর মধ্যে ভয় ও অনিরাপত্তাবোধ সৃষ্টি করে। সুতরাং নিজের আবেগ নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারলে, আমরা আমাদের সন্তানকে আবেগ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি শেখাতে পারি। বিষয়টি একটু উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে বলি। আমীনা এমন একজন মা যিনি প্রায়ই সন্তানের উপর রাগান্বিত হ'তেন। তিনি যখন বুঝতে পারলেন যে, তার এই আচরণ তার সন্তানের মধ্যে ভয় ও অনিরাপত্তাবোধ সৃষ্টি করছে, তখন তিনি নিজের রাগ নিয়ন্ত্রণের জন্য কাউন্সিলিং শুরু করলেন। তিনি ধীরে ধীরে নিজের আবেগ বুঝতে ও নিয়ন্ত্রণ করতে শিখলেন। এর ফলে তার সন্তানও আগেরমত শান্ত ও আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠল। এটাই প্রকৃত নিয়ম।

দ্বিতীয়তঃ শিশুর আবেগ স্বীকার করুন। শিশুর কান্না, রাগ বা ভয়কে অবহেলা করবেন না। বরং শিশুর আবেগ অস্বীকার না করে তা স্বীকার করুন ও সম্মান করুন। এটি তাদেরকে নিজের আবেগ বুঝতে ও প্রকাশ করতে সাহায্য করবে। মনে করুন, আপনার সন্তান যখন স্কুল থেকে মন খারাপ কিংবা রাগান্বিত হয়ে বাড়ি ফিরে তখন আপনি তাকে কাছে বসিয়ে জিজ্ঞেস করুন, তোমার কি মন খারাপ? বল আমাকে। বা এভাবে বলুন, তোমার রাগ হওয়া স্বাভাবিক, বিষয়টি আমাকে খুলে বল। এভাবে আপনি তার আবেগ প্রকাশ করার সুযোগ দিবেন। কখনো এভাবে বলবেন না, এটাতে আবার রাগ করতে হয় নাকি? বা এটা কোন বড় ব্যাপার নয় বলে তার আবেগকে অস্বীকার করবেন না।

তৃতীয়তঃ তার জন্য সুরক্ষিত ও নিরাপদ পরিবেশ তৈরি করুন। শিশুরা যেখানে ভয় ছাড়া তাদের মতামত, অনুভূতি ও চিন্তা প্রকাশ করতে পারে, এমন একটি সুরক্ষিত পরিবেশ তৈরি করুন। তারা হয়ত ছোট, কিন্তু তাদের অনুভূতি সত্য। তাদের কথা গুরুত্ব দিয়ে শুনতে হবে। যেমন ফাতেমাদের পরিবারে প্রতিদিন ঘুমানোর পূর্বে আলোচনা সেশন আছে। যেখানে পরিবারের সবাই তাদের অনুভূতি ও চিন্তা সবার সাথে ভাগ করে নেয়। সেখানে ফাতেমা নিরাপদে তার যেকোন অনুভূতি প্রকাশ করতে পারে। এমনকি সে যদি রাগ বা হতাশাও অনুভব করে সেটিও সে সবার সাথে শেয়ার করতে পারে। শিশুদের এমন একটি জায়গা থাকা প্রয়োজন।

চতুর্থতঃ চতুর্থ করণীয় হ'ল, শিশুদের সাথে সময় কাটানো। তাদের সাথে গল্প করুন, খেলুন, হাসুন। তারা যখন কথা বলবে, মনোযোগ দিন। এই সময় ফোনে চোখ রাখবেন না। এটি তাদের আত্মসম্মান বাড়াতে ও নিরাপত্তাবোধ তৈরি করতে সাহায্য করে। যেমন আপনি প্রতিদিন আপনার সন্তানের সাথে আধা ঘন্টা বিশেষ সময় কাটান। যেখানে আপনি শুধুমাত্র সন্তানের প্রতি মনোযোগ দেন। এই সময়টি আপনার সন্তানের সাথে আপনার বন্ধন গড়ে তুলবে এবং আপনার কাছে আপনার সন্তান যে মূল্যবান তা সন্তান অনুভব করবে।

পঞ্চমতঃ পঞ্চম করণীয় হ'ল শিশুদের প্রশংসা করা। তবে কখনোই তা অতিরিক্ত নয়। প্রশংসা শিশুদের আত্মবিশ্বাস বাড়াতে সাহায্য করে, তবে এটি যথার্থ ও সার্থক হওয়া উচিত। মনে করুন, আয়েশার আম্মু লক্ষ্য করলেন যে, আয়েশা তার গণিতের পরীক্ষায় আগের চেয়ে ভালো করেছে। তিনি বললেন, 'আমি দেখেছি, তুমি এই পরীক্ষার জন্য কত কঠিন পরিশ্রম করেছ। তোমার এই অধ্যবসায় দেখে আমি খুব গর্বিত। আমি খুব খুশি হয়েছি। বারাকাল্লাহু লাক। এই ধরনের প্রশংসা আয়েশাকে বুঝতে সাহায্য করে যে, প্রচেষ্টা ও অধ্যবসায়ই মূল্যবান, শুধুমাত্র ফলাফল নয়।

ষষ্ঠতঃ শিশুদের সিদ্ধান্ত নিতে উৎসাহিত করা। শিশুদের বয়স উপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে উৎসাহিত করুন। এটি তাদের আত্মনির্ভরশীলতা ও আত্মবিশ্বাস বাড়াতে সাহায্য করে। যেমন জাহিদ ছাহেব তার ছেলে মুছ'আবকে দু'টি পোশাক থেকে একটি বেছে নিতে বলেন বা তার লাঞ্চ বক্সে সে কী খেতে চায় তা জিজ্ঞেস করেন। এটি তার ছেলেকে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অনুশীলন শিক্ষা দেয় এবং তাকে বুঝতে সাহায্য করে যে, তার মতামত মূল্যবান।

সপ্তমতঃ সপ্তম করণীয় হ'ল আবেগ নিয়ন্ত্রণের কৌশল শেখানো। শিশুদের তাদের আবেগ চিনতে ও নিয়ন্ত্রণ করতে শেখান। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, বারাকাহ যখন রাগান্বিত হয়, তার বাবা তাকে প্রথমে শয়তান থেকে আশ্রয় নিতে শেখান। তারপর স্থান পরিবর্তন করতে বলেন। এরপর গভীর শ্বাস নিতে শেখান। তারা একসাথে ১০ পর্যন্ত গণনা করেন এবং তারপর বারাকাহ তার অনুভূতি সম্পর্কে কথা বলতে পারে। এটি বারাকাহকে তার রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে শেখায়।

অষ্টমতঃ অষ্টম করণীয় হ'ল ভালোবাসা প্রকাশ করা। শুধু মনে মনে নয়, মুখে বলুন! তোমাকে ভালোবাসি, তুমি পারবে, আমি তোমার পাশে আছি। রাসূল (ছাঃ) কাউকে ভালোবাসলে তা প্রকাশ করতে বলেছেন। পাশাপাশি তাকে ভুল স্বীকার করতে শেখান। সন্তান ভুল করলে তাকে শাস্তি না দিয়ে বুঝিয়ে বলুন। নিজেও যদি ভুল করেন, বলুন 'দুঃখিত, আমি ভুল করেছি, আমাকে ক্ষমা করে দাও'। তার সাথে কথা বলার সময় সর্বদা ইতিবাচক শব্দ ব্যবহার করুন। ইতিবাচক শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে শিশুর আত্মবিশ্বাস বাড়াতে সাহায্য করুন।

শেষকথা : শিশুদের আবেগিক স্বাস্থ্য তাদের সামগ্রিক বিকাশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ। একজন অভিভাবক হিসাবে, আমাদের দায়িত্ব হ'ল তাদের সুস্থ আবেগিক বিকাশের জন্য সঠিক পরিবেশ ও সমর্থন প্রদান করা। মনে রাখবেন, এটি একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। একদিনে না হ'লেও, আপনার ধৈর্য, ভালবাসা, সমর্থন ও দো'আ আপনার সন্তানকে একটি সুস্থ আবেগিক ব্যক্তিত্ব হিসাবে গড়ে তুলতে সাহায্য করবে।

দফ ইসলামী ঐতিহ্যের অংশ

*-মুহাম্মাদ আব্দুর রঊফ**

পৃথিবীতে প্রচলিত ধর্মগুলোর মধ্যে নিঃসন্দেহে ইসলামই একমাত্র অভ্রান্ত ও চূড়ান্ত সত্য ধর্ম। এই মহাসত্য ধর্ম পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের উপর ভিত্তিশীল। যা মহান প্রভু আল্লাহ তা'আলার বাণী। আল্লাহ তা'আলা মহিমান্বিত কুরআনে সংশয়বাদী, নাস্তিক, কাফের ও মুশরিকদের চিরন্তন এক চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন যে, যদি তাদের মনে কুরআনের সত্যতা নিয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে তবে তারা যেন এর অনুরূপ একটি আয়াত রচনা করে দেখায় *(বাক্বারাহ ২/২৩)*। কুরআন নাযিলের সময় থেকে আজ পর্যন্ত কেউ এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে সক্ষম হয়নি আর ক্বিয়ামত পর্যন্ত হবেও না। এভাবেই আল্লাহ তা'আলা ইসলামের সত্যতা সার্বজনীনভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

ইসলাম বিরোধী শক্তি ইসলামকে মানবরচিত ধর্ম প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়ে যুগে যুগে নানাভাবে সংজ্ঞায়িত, বিকৃত এবং বিতর্কিত করার অপচেষ্টা ও কূটকৌশল অব্যাহত রেখেছে। সেজন্য ইসলাম তাদের কাছে অতি মাত্রায় রক্ষণশীল ধর্ম, জঙ্গীবাদের ধর্ম, অন্ধবিশ্বাসভিত্তিক ধর্ম, অসহিষ্ণু ধর্ম, মধ্যযুগীয় বর্বর ধর্ম, নারী বিরোধী ধর্ম, পশ্চাতপদ ধর্ম ইত্যাদি। ইতিহাসের এক গৌরবময় পর্বে মুসলমানগণ আরব ও আ'জম শাসন করে মানবজাতির সামনে ইসলামের অনুপম সৌন্দর্য তুলে ধরেছিলেন। পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসাবে ইসলাম বারবারই তার শ্রেষ্ঠত্ব ও সত্যতা প্রমাণ করেছে। আর এই শ্রেষ্ঠত্বই ইসলামবিরোধী অপশক্তিগুলোকে বিচলিত করেছে। এ কারণে তারা ইসলাম সম্পর্কে উক্ত নেতিবাচক ধারণাসমূহ উসকে দিয়েই থেমে থাকেনি, বরং ইসলামের মৌলিকত্ব ধ্বংসের জন্য উদ্ভাবন করেছে নানান মতবাদ।

যেমন- মুসলিম বিশ্বে গণতন্ত্রের মত মূর্খের শাসনব্যবস্থা চাপিয়ে দিয়ে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে ইসলামী খিলাফতভিত্তিক শাসনব্যবস্থা। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের মত ধর্মহীন কুফরী মতবাদের মাধ্যমে আঘাত করা হয়েছে ইসলামী আইন ও বিধানের ওপর। ইসলামী অর্থনীতিকে ভেঙে দেওয়া হয়েছে পুঁজিবাদ ও সূদভিত্তিক অর্থব্যবস্থা চাপিয়ে দিয়ে। জাতীয়তাবাদের বিভাজনমূলক মতবাদকে হাতিয়ার করে টুকরো টুকরো করে ফেলা হয়েছে মুসলিম উম্মাহর ঐক্য ও বিশ্বভ্রাতৃত্ব। এখানেই শেষ নয়! ইসলামকে রক্ষণশীল ও সংস্কৃতিহীন ধর্ম হিসাবে চিত্রিত করে ইসলামে হারাম ঘোষিত নাচ-গান, অশ্লীলতা, মদ্যপান, যেনা-ব্যভিচার ও নানা রকম ভোগবাদী সংস্কৃতিকে তথাকথিত 'আধুনিকতা' ও 'বিনোদন'-এর নামে সমাজে এমনভাবে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে যেন তা স্বাভাবিক ও সহজলভ্য হয়ে যায়। এর মাধ্যমে সুপরিকল্পিতভাবে মুসলমানদের আধ্যাত্মিক শক্তি ও নৈতিক স্থিতি দুর্বল করে ফেলা হয়েছে।

*শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

এমতাবস্থায় আমাদের করণীয় ছিল ইসলামের মৌলিক ভিত্তি দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা। কিন্তু আমরা পশ্চিমাদের ধোঁকায় পড়ে ইসলামকে তথাকথিত 'মডারেট ধর্মে' পরিবর্তন করে ফেলেছি। গণতন্ত্রকে ইসলামী মূল্যবোধের নামে 'ইসলামী গণতন্ত্র' বলেছি; সূদভিত্তিক ব্যাংকিং ব্যবস্থায় সামান্য পর্দা টেনে তা রূপ দিয়েছি 'ইসলামী ব্যাংক'-এ। একইভাবে আমরা সৃষ্টি করেছি 'ইসলামী গান', 'ইসলামী নাটক', 'ইসলামী সিনেমা' যা মূলত পশ্চিমা সংস্কৃতির চেহারাকেই ধর্মীয় মোড়কে উপস্থাপন। এমনকি ইংরেজী নববর্ষের মত অনৈসলামী সংস্কৃতিও দো'আ চাওয়ার মাধ্যমে ইসলামী আবহে রূপ দেওয়া হয়েছে। ৩১শে ডিসেম্বর রাতে পরস্পরের কাছে দো'আ চাওয়া হচ্ছে যেন নতুন বছরটি আরও ভাল হয়। এ যাবৎ যারা বাংলা নববর্ষের বিরোধিতা করে এসেছেন তাদেরই একাংশ এ বছর বাংলা নববর্ষকেও ইসলামীকরণ করেছেন! এ সবই আমাদের আত্মপরিচয়হীনতা, চেতনার বিভ্রান্তি, ইসলামী সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের মৌলিক আদর্শ না বুঝার করুণ চিত্র।

ইসলামী সংস্কৃতি বা ঐতিহ্যের মৌলিক আদর্শ হ'ল, পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ যতটুকু অনুমোদন করেছে সেই সীমারেখার মধ্যে থাকা। কিন্তু দুঃখজনক বিষয় হ'ল ইসলামী সংস্কৃতির কোন প্রান্তরেখাই লঙ্ঘন করতে আমরা বাকী রাখিনি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, দফ বাজানো শর্ত সাপেক্ষে জায়েয হওয়া সত্ত্বেও হালাল-হারামের সূক্ষ্ম সীমারেখা বিলুপ্ত হওয়ার আশঙ্কায় ইসলামে হালাল একমাত্র এই বাদ্যযন্ত্রের ঐতিহ্যের কথা বুক ফুলিয়ে বলা যায় না। তদুপরি ইসলামের এই নিদর্শন যতটুকু আমাদের জন্য কল্যাণকর ততটুকু প্রকাশ করা গুরুদায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। আশা করা যায় এর মাধ্যমে দফের অপব্যবহার বন্ধ হবে এবং আমরা ইসলামী ঐতিহ্যের প্রকৃত রূপও উপলব্ধি করতে সক্ষম হব। এ কারণেই আলোচ্য প্রবন্ধের অবতারনা।

দফ (دف) হ'ল ফ্রেমে বাধা একমুখী ঢোল বিশেষ। দফ-এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, آلة من آلات الموسيقى مستدبرة كالغربال ليس لها جلاجل يشد الجلد من أحد طرفيها 'দফ হ'ল চালুনির মত পিছন দিকে খোলা একটি বাদ্যযন্ত্র, যাতে ঝুনঝুন আওয়াজ থাকে না এবং একপাশে চামড়ার পর্দা টেনে বাঁধা হয়'।[১] সংজ্ঞা থেকে বোঝা যায় যে, দফ চালুনি সদৃশ গোলাকৃতির ফ্রেমে বাঁধা একটি বাদ্যযন্ত্র। যার একদিক সম্পূর্ণ খোলা এবং অন্য দিক চামড়ার পর্দা দিয়ে মোড়ানো। যাতে আঘাত করলে সুরেলা কোন আওয়াজ হবে না বরং ঢ্যাব ঢ্যাব আওয়াজ হয়। বাজারে একটি দফ পাওয়া যায় তাতে ধাতব রিং লাগানো থাকে। ফলে বাজানোর সময় ঘণ্টার মত সুরেলা একটি আওয়াজ বের হয়। এ জাতীয় দফ বাজানোর বিধান অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র বাজানোর ন্যায় হারাম। ছহীহ হাদীছ

১. *ড. মুহাম্মাদ রাওয়াস কাল'আজী, মু'জামু লুগাতিল ফুক্বাহা (বৈরূত : দারুন নাফায়েস, ১ম সংস্করণ ১৪১৬ হি./১৯৯৬ খৃ.), পৃ. ১৮৬।*

অনুযায়ী রাসূল (ছা.) কয়েকটি ক্ষেত্রে দফ বাজানোর অনুমতি দিয়েছেন। নিম্নে সেগুলো উল্লেখ করা হ'ল-

বিবাহের অনুষ্ঠানে : রুবাঈ বিনতে মু'আব্বিয ইবনু আফরা (রা.) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমার বাসর রাতের পরের দিন নবী করীম (ছা.) এলেন এবং আমার বিছানার ওপর বসলেন, যেমন বর্তমানে তুমি আমার কাছে বসে আছ। সে সময় আমাদের ছোট মেয়েরা দফ বাজাচ্ছিল এবং বদরের যুদ্ধে শাহাদত বরণকারী আমার বাপ-চাচাদের শোকগাঁথা গাচ্ছিল। তাদের একজন বলে বসল, আমাদের মধ্যে এক নবী আছেন, যিনি আগামী দিনের কথা জানেন। তখন রাসূল (ছা.) বললেন, এ কথা বাদ দাও, আগে যা বলছিলে, তাই বল'।[২]

এ হাদীছ থেকে বুঝা যায়, রাসূল (ছা.)-এর সামনে দফ বাজানো হয়েছে কিন্তু তিনি নিষেধ করেননি। অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, রাসূল (ছা.) বলেন, فَصْلُ مَا بَيْنَ الحَرَامِ وَالحَلَال، الدُّفُّ وَالصَّوْتُ فِي النِّكَاحِ، 'হারাম (ব্যভিচার) ও হালাল বিবাহের মধ্যে পার্থক্য হ'ল ঘোষণা করা ও দফ ব্যবহার'।[৩] এই হাদীছ প্রমাণ করে, মূলত বিবাহের সংবাদ প্রচারের জন্য বিয়েতে দফ বাজানোকে উৎসাহিত করা হয়েছে।

ঈদের দিনে : আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবুবকর (রা.) আমার নিকটে আসেন। তখন আমার নিকটে দু'জন আনছার বালিকা উপস্থিত ছিল। তারা বুয়াস যুদ্ধে আনছারদের মুখে উচ্চারিত কবিতাগুলো গানের সুরে আবৃত্তি করছিল। আয়েশা (রা.) বলেন, তারা পেশাদার গায়িকা ছিল না। আবুবকর (রা.) বললেন, শয়তানের বাঁশি (বাদ্যযন্ত্র) নবী করীম (ছা.)-এর ঘরে? এ ঘটনাটি ছিল ঈদুল ফিতরের দিনের। নবী করীম (ছা.) বলেন, হে আবুবকর! প্রত্যেক জাতিরই ঈদ (আনন্দ উৎসব) রয়েছে। আর এটাই হচ্ছে আমাদের ঈদ'।[৪] একই বর্ণনা ঈদুল আযহার দিনগুলোর বিষয়েও এসেছে।[৫] এছাড়াও ইবনু মাজাহ্র অপর একটি বর্ণনায় পাওয়া যায় 'রাসূল (ছা.) মদীনার গলিপথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। কয়েকজন বালিকা দফ বাজিয়ে গান গেয়ে বলছিল, 'আমরা বনু নাজ্জারের বালিকার দল। কত খোশ নছীব! মুহাম্মাদ (ছা.) আমাদের মহৎ প্রতিবেশী'। তখন নবী করীম (ছা.) বলেন, 'আল্লাহ অবগত আছেন, আমি তো তোমাদের ভালবাসি'।[৬]

সুতরাং উপরোক্ত হাদীছগুলো বিশ্লেষণ করলে দু'টি বিষয় স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। প্রথমতঃ দফ কেবল বিবাহ অনুষ্ঠান ও ঈদের দিনে বাজানো জায়েয। এছাড়া অন্য কোন সময় দফ বাজানোর অনুমতি রাসূল (ছা.) দেননি। এ কথার স্বপক্ষে অন্য একটি হাদীছ এখানে উল্লেখ্য যে, রাসূল (ছা.) কোন এক যুদ্ধাভিযানে যান। তিনি ফিরে এলে এক কৃষ্ণবর্ণা কন্যা এসে বলে, 'হে আল্লাহ্র রাসূল (ছা.)! আমি মানত করেছিলাম যে, আপনাকে আল্লাহ তা'আলা সুস্থাবস্থায় ফিরিয়ে আনলে আপনার সম্মুখে আমি দফ বাজাব এবং গান করব'। তখন রাসূল (ছা.) তাকে বললেন, 'তুমি সত্যিই যদি মানত করে থাক তবে দফ বাজাও, তা না হ'লে বাজাইও না'।[৭] এই হাদীছে স্পষ্ট বোঝা যায়, রাসূল (ছা.) উক্ত কন্যার মানত পূর্ণ করার জন্য দফ বাজানোর অনুমতি দিয়েছেন অন্যথা দিতেন না। সেজন্য বিবাহ ও ঈদ ব্যতিরেকে অন্য সময় দফ বাজানো সুন্নাহ সম্মত নয়। আবার ঈদ কিংবা ওয়ালীমায় পেশাদার গায়ক কিংবা বাদক ভাড়া করে দফ বাজানোও বৈধ নয়।

দ্বিতীয়তঃ উপরে উল্লিখিত সবক'টি হাদীছে বালিকা মেয়েদের দফ বাজানোর কথা এসেছে। সেজন্য প্রাপ্ত বয়স্ক কোন নারী কিংবা পুরুষের দফ বাজানো জায়েয নয়। ছহীহ বুখারীর বিখ্যাত ব্যাখ্যাকার ইবনে রজব হাম্বলী (মৃ. ৭৯৫ হি.) দফ বাজানো বিষয়ে তিনটি মত উল্লেখ করেছেন তন্মধ্যে **১ম** মত হ'ল, নারীদের দফ বাজানো সর্বাবস্থায় বৈধ। এক্ষেত্রে সেই দফের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যাতে ধাতব রিং যুক্ত ঝনঝন শব্দ হয় না।[৮] এখানে তিনি পুরুষদের কথা উল্লেখ করেননি। হাফেয ইবনে হাজার আসক্বালানী (মৃ. ৮৫২ হি.) বলেন, وَالْأَحَادِيثُ الْقَوِيَّةُ فِيهَا الْإِذْنُ فِي ذَلِكَ لِلنِّسَاءِ فَلَا يَلْتَحِقُ بِهِنَّ الرِّجَالُ لِعُمُومِ النَّهْيِ عَنِ التَّشَبُّهِ بِهِن، 'দফ বাজানো বিষয়ে শক্তিশালী হাদীছগুলোর অনুমোদন শুধু নারীদের জন্য। পুরুষরা এতে অন্তর্ভুক্ত হবে না। কেননা পুরুষদের নারীদের সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ করা সম্পর্কে সাধারণভাবে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে'।[৯]

সুতরাং দফ নিঃসন্দেহে ইসলামী সংস্কৃতির একটি ঐতিহ্যবাহী উপাদান। তবে এর ব্যবহার সীমিত ও নির্দিষ্ট পরিসরে অনুমোদিত। আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি যে, আমাদের অবশ্যই নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে ফিরে আসতে হবে। তবে সেটি পশ্চিমা মোড়কে নয় বরং পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের গণ্ডির মধ্যে থেকে। রাসূল (ছা.) নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে দফ বাজানোর অনুমতি দিয়েছেন। তাই সেই নির্দিষ্ট ক্ষেত্রগুলোতেই দফ বাজানো ইসলামী সংস্কৃতির অংশ হিসাবে গণ্য। কিন্তু দুঃখজনক বাস্তবতা হ'ল, যে দফ রাসূল (ছা.)-এর যুগে কেবল বালিকারা ঈদ কিংবা ওয়ালীমার মত বিশেষ অনুষ্ঠানে ব্যবহার করতেন। আজ সেটিকেই প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষরা ইসলামী সংগীতে ব্যবহার করছেন আর ইসলামী সংস্কৃতি পালনের তৃপ্তির ঢেকুর তুলছেন। এ সমস্ত সংগীত এবং বাজনাযুক্ত হারাম গানের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এতে ইসলামী চেতনা মোটেও জাগ্রত হয় না বরং সুরেলা বাজনাযুক্ত গান শোনার ন্যায় পূর্ণ অনুভূতি পাওয়া যায়। যা স্পষ্টরূপে শরী'আতের সীমারেখা লঙ্ঘন। আল্লাহ আমাদের সঠিক বুঝ দান করুন- আমীন!

২. বুখারী হা/৫১৪৭; তিরমিযী হা/১০৯০; আবূদাঊদ হা/৪৯২২।
৩. ইবনু মাজাহ হা/১৮৯৬; নাসাঈ হা/৩৩৬৯; তিরমিযী হা/১০৮৮।
৪. বুখারী হা/৯৫২; মুসলিম হা/৮৯২; ইবনু মাজাহ হা/১৮৯৮।
৫. বুখারী হা/৯৮৭, ৩৫২৯; নাসাঈ হা/১৫৯৭।
৬. ইবনু মাজাহ হা/১৮৯৯; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩১৫৪।
৭. তিরমিযী হা/৩৬৯০; মিশকাত হা/৬০৩৯; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২২৬১।
৮. ইবনে রজব, ফাৎহুল বারী, ৮/৪৩৬ পৃ.।
৯. ইবনে হাজার আসক্বালানী, ফাৎহুল বারী, ৯/২২৬ পৃ.।

হুসায়েন বিন আলী (রাঃ)

-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

(নভেম্বর'২৪ সংখ্যার পর)

ছাহাবায়ে কেরামের নিকটে হুসায়েন (রাঃ)-এর মর্যাদা :

ছাহাবায়ে কেরামের নিকটে হুসায়েন (রাঃ)-এর উচ্চ মর্যাদা ছিল। তাকে সবাই ভালোবাসতেন। মুহাম্মাদ ইবরাহীম আত-তায়মী বলেন, যখন ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) রেজিস্ট্রি লিখেছিলেন তখন তিনি বদরে অংশগ্রহণকারীদের ন্যায় হাসান-হুসায়েন (রাঃ)-এর জন্যও ভাতা নির্ধারণ করে ছিলেন রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটতর হওয়ার কারণে। তিনি হাসান-হুসায়েন প্রত্যেকের জন্য ৫ হাযার দিরহাম নির্ধারণ করেন।[১]

১. একদা ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) মিম্বরের উপরে থাকাবস্থায় হুসায়েন (রাঃ) এসে বললেন, আপনি আমার পিতার (নানার) মিম্বর থেকে নেমে আপনার পিতার মিম্বরে যান। তিনি আমাকে তার সামনে বসালেন। আমার হাতে কিছু নুড়ি পাথর ছিল, যা আমি উলটপালট করছিলাম। তিনি মিম্বর থেকে নেমে আমাকে বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে বললেন, বৎস! তোমাকে এটা কে শিখিয়েছে? আমি বললাম, আমাকে কেউ শিখায়নি। তিনি বললেন, তুমি আমাদের কাছে এসে আমাদেরকে রহমতমণ্ডিত করবে। হুসায়েন (রাঃ) বললেন, একদিন আমি ওমর (রাঃ)-এর কাছে এসে দেখলাম তিনি মু'আবিয়া (রাঃ)-এর সাথে অবস্থান করছেন এবং ইবনু ওমর তাঁদের কাছে না গিয়ে ফিরে যাচ্ছেন, তখন আমিও ফিরে আসলাম। পরবর্তীতে ওমর (রাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ হ'লে তিনি বললেন, বৎস! তুমি আমাদের কাছে আসছ না কেন? আমি বললাম, একদিন এসে আপনাকে মু'আবিয়া (রাঃ)-এর সাথে একান্তে কথা বলতে দেখলাম, তখন ইবনু ওমর ফিরে গেল এবং আমিও ফিরে গেলাম। তিনি বললেন, বৎস! ইবনু ওমর অপেক্ষা অনুমতি পাওয়ার তুমি অধিক হকদার।[২]

২. আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হাসান-হুসায়েনের ঘোড়ার রেকাব (পাদানী) ধরে রাখতেন। তিনি মনে করতেন এটা তার প্রতি নে'মত (সৌভাগ্য)।[৩]

৩. ঈযার ইবনু হুরাইছ বলেন, আমর ইবনুল আছ (রাঃ) কা'বার পাদদেশে উপবিষ্ট ছিলেন। তখন তিনি হুসায়েন বিন আলীকে আসতে দেখে বললেন, এই যুবক দুনিয়া ও আসমানবাসীর প্রিয়'।[৪]

ইয়াযীদ ইবনে মু'আবিয়ার বায়'আত গ্রহণ :

মু'আবিয়া (রাঃ)-এর মৃত্যুর পর ঐ সময়ে জীবিত প্রায় ৬০ জন ছাহাবীসহ তৎকালীন ইসলামী বিশ্বের প্রায় সকল কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ পরবর্তী খলীফা হিসাবে ইয়াযীদের হাতে আনুগত্যের বায়'আত করেছিলেন।[৫] মদীনার কেবল চারজন ছাহাবী বায়'আত নিতে বাকী ছিলেন। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস, আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়ের ও হুসায়েন ইবনু আলী (রাঃ)। প্রথমোক্ত দু'জন পরে বায়'আত করেন। শেষোক্ত দু'জন গড়িমসি করলে আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) তাঁদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন, إِتَّقِيَا اللهَ وَلَا تَفَرَّقَا بَيْنَ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِيْنَ 'আপনারা আল্লাহকে ভয় করুন! মুসলিম উম্মাহ্র মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টি করবেন না'।[৬] কিন্তু হুসায়েন (রাঃ) ও আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়ের (রাঃ) দু'জনেই মদীনা থেকে মক্কায় চলে যান।

হুসায়েন (রাঃ)-এর কূফার উদ্দেশ্যে যাত্রার কারণ :

(ক) কূফাবাসীর পত্র প্রেরণ :

হুসায়েন (রাঃ)-এর ইরাকের কূফায় গমনের নানা কারণ ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল।-

কূফাবাসী যখন জানল যে, মু'আবিয়া (রাঃ)-এর মৃত্যুর পর ইয়াযীদের বায়'আত প্রত্যাখ্যান করে হুসায়েন (রাঃ) মক্কায় চলে গেছেন, তখন তারা সুলায়মান ইবনু ছুরাদের বাড়ীতে একত্রিত হয়। এসময় সুলায়মান ইবনু ছুরাদ বলেন, মু'আবিয়া (রাঃ) মৃত্যুবরণ করেছেন। হুসায়েন (রাঃ) বায়'আত করা থেকে বিরত আছেন এবং তিনি মক্কায় গমন করেছেন। আর তোমরা তাঁর পিতার দলভুক্ত। এক্ষণে তোমরা তাকে সাহায্য করতে চাইলে তার নিকটে পত্র লেখ। আর যদি বিশৃঙ্খলা ও ব্যর্থতার ভয় কর, তাহ'লে তোমরা তার সাথে প্রতারণা কর না। তখন তারা হুসায়েন (রাঃ)-কে সাহায্য করতে একমত হয়ে তাঁর নিকটে পত্র প্রেরণ করে এ মর্মে যে, আমরা নু'মান বিন বাশীরের সাথে জামা'আতে ছালাত আদায় করব না এবং ঈদেও তার ইমামতিতে ছালাত আদায় করব না। সুতরাং আপনি আমাদের নিকটে আসুন। আপনি আসলে আমরা নু'মানকে সিরিয়ায় বের করে দিব। সুলায়মান ইবনু ছুরাদ, মুসাইয়েব ইবনু নাজবাহ, রিফা'আহ ইবনু শাদ্দাদ এবং হাবীব ইবনু মুযাহের-এর পক্ষ থেকে লিখিত পত্র আব্দুল্লাহ ইবনু সাবা আল-হামাদানী ও আব্দুল্লাহ ইবনু ওয়ালের মাধ্যমে প্রেরিত হয়। এর দু'দিন পরে ক্বায়েস ইবনু মিসহার আছ-ছায়দাবী, আব্দুর রহমান আল-আরহাবী, আম্মারাহ ইবনু উবায়দ আস-সুলূলী পত্র প্রেরণ করে। তারা ৫৩টি পত্র হানী ইবনু হানী আস-সাবীঈ ও সা'দ ইবনু আব্দুল্লাহ আল-হানাফীর মাধ্যমে প্রেরণ করে। যেসব পত্রে বায়'আতকারী ও যারা হুসায়েন (রাঃ)-এর আগমন প্রত্যাশা

---

১. ইবনু আসাকির, তারীখু দিমাশক, ৩/২৩৮ পৃঃ।
২. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ৩/২৮৫, ৪/৩৫১; তাহযীবুল কামাল ৬/৪০৪; তাহযীবুত তাহযীব ২/৩৪৬।
৩. আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ৮/৩৮ পৃঃ।
৪. ইবনু সা'দ, তাবাকাতুল কুবরা, ১/৪১৯ পৃঃ।
৫. ইবনু রাজাব হাম্বলী (৭৩৬-৭৯৫ হি.), যায়লু তাবাক্বা-তিল হানাবিলাহ (রিয়াদ : মাকতাবা উবায়কান, ১ম সংস্করণ ১৪২৫ হি./২০০৫ খৃ.) ৩/৫৫ পৃ., বর্ণনা : আব্দুল গণী মাক্বদেসী (৫৪১-৬০০ হি.)।
৬. ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, তাবি) ৮/১৫০ পৃ.।

করত, তাদের নাম ছিল।[৭] অতঃপর শিবছ ইবনু রবীঈ, হিজার ইবনু আবজার, ইয়াযীদ ইবনুল হারেছ, আযরাহ ইবনু ক্বায়েস, আমর ইবনুল হাজ্জাজ আয-যুবায়দী, মুহাম্মাদ ইবনু ওমর আত-তায়মী পত্র লেখে। তারা হুসায়েন (রাঃ)-কে লিখল যে, ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে, ফল পরিপক্ক হয়েছে, বাধা দূর হয়েছে। এখন আপনি চাইলেই আপনার সুসজ্জিত বাহিনীর নিকটে আসতে পারেন।[৮] হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) উল্লেখ করেছেন যে, কূফার নেতাদের কাছ থেকে ১৫০টি লিখিত অনুরোধপত্র হুসায়েন (রাঃ)-এর নিকটে পৌঁছে।[৯]

(খ) হুসায়েন (রাঃ)-এর পক্ষে ইরাকবাসীর বায়'আত :

কূফাবাসীর প্রেরিত ধারাবাহিক পত্র ও দূতগণের আগমনে হুসায়েন (রাঃ) কূফাবাসীর যথার্থ আগ্রহ ও তাদের কৃত্রিম ভালোবাসা অনুধাবন করেছিলেন। আর তারা তাদের নেতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। তারা ইয়াযীদকে স্বীকৃতি দেয়নি এবং তারা কূফার গভর্ণর নু'মান বিন বাশীরকে অচিরেই বের করে দিবে। ফলে তাদের এমন একজন নেতা প্রয়োজন যার অধীনে তারা একত্রিত হবে। তাদের সেই কাঙ্ক্ষিত নেতা হচ্ছেন হুসায়েন (রাঃ)। তিনি কূফা গমনের চিন্তা তখনই করেছেন, যখন কূফার দূতগণ এসে স্বীকার করল যে, إنــه ليس علينا إمـــام 'আমাদের কোন নেতা নেই'। আর তাঁর পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করে তাকে তারা কূফায় আগমনের আহ্বান জানাচ্ছে। তারা আরো বলল, لعـــــل الله أن يجمعنا بك على الهدى والحق، 'হয়তো আপনার মাধ্যমে আল্লাহ আমাদেরকে হেদায়াত ও হকের উপরে একত্রিত করবেন'। এসব প্রেক্ষিতে হুসায়েন (রাঃ) ঘটনা যাচাইয়ের জন্য স্বীয় চাচাতো ভাই মুসলিম বিন আক্বীল-কে অগ্রিম কূফায় প্রেরণ করেন।[১০] তিনি ৬০ হিজরীর রামাযানের মধ্যবর্তী সময়ে মক্কা থেকে রওয়ানা হয়ে ৫ই শাওয়াল কূফায় পৌঁছেন।[১১] হুসায়েন (রাঃ) কূফার নির্ভরযোগ্য কোন ব্যক্তির নিকটে অবস্থানের নির্দেশ দেন।[১২] তিনি সেখানে মুসলিম ইবনু আওসাজাহ[১৩] মতান্তরে হানী ইবনু উরওয়ার নিকটে অবস্থান করেন।[১৪] তবে তিনি প্রথমে মুখতার ইবনু উবায়দ আছ-ছাক্বাফীর গৃহে অবস্থান করেন। অতঃপর সেখানে থেকে হানীর বাড়ীতে স্থানান্তরিত হন।[১৫] সেখানে ১২ থেকে ১৮ হাযার লোক হুসায়েনের পক্ষে মুসলিম-এর হাতে আনুগত্যের বায়'আত গ্রহণ করে।[১৬] অন্য বর্ণনায় ৩০ হাযারের অধিক লোক বায়'আত করেন।[১৭]

(গ) ইরাকবাসীর প্রতি হুসায়েন (রাঃ)-এর পত্র প্রেরণ :

হুসায়েন (রাঃ)-এর নিকটে কূফাবাসীর ক্রমাগত পত্র আসায় তাদের বায়'আত গ্রহণের আগ্রহ অবগত হয়ে তিনি একটি পত্র প্রেরণ করেন। যাতে তিনি স্বীয় চাচাত ভাই মুসলিম বিন আক্বীলকে প্রেরণ করা, তাকে সহযোগিতা করা এবং কূফায় গমনের আগ্রহ প্রকাশ করেন।[১৮]

(ঘ) মুসলিম বিন আক্বীল (রাঃ)-এর পত্র :

মুসলিম বিন আক্বীল (রাঃ) সরল মনে হুসায়েন (রাঃ)-কে কূফায় আসার আমন্ত্রণ জানিয়ে পত্র প্রেরণ করেন। তিনি লিখেন যে, অগ্রবর্তী দূতগণ মিথ্যা বলেননি। সকল কূফাবাসী আপনার পক্ষে। সুতরাং আমার পত্র পেয়ে আপনি চলে আসুন।[১৯]

পত্র পেয়ে হুসায়েন (রাঃ) হজ্জের একদিন পূর্বে সপরিবারে মক্কা থেকে কূফায় রওয়ানা হয়ে যান। হুসায়েন (রাঃ)-এর আগমনের খবর জানতে পেরে কূফার গভর্ণর নু'মান বিন বাশীর জনগণকে ডেকে বিশৃংখলা না ঘটাতে উপদেশ দেন। কোনরূপ কঠোরতা প্রয়োগ করা হ'তে তিনি বিরত থাকেন। ফলে কুচক্রীদের কানভারিতে তিনি পদচ্যুত হন ও বছরার গভর্ণর ওবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদকে তদস্থলে নিয়োগ দেয়া হয় এবং একই সাথে তার উপর কূফার দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়। তিনি দায়িত্ব পেয়েই প্রথমে মুসলিম বিন আক্বীলকে গ্রেফতার ও হত্যা করেন।[২০] অতঃপর তার সাহায্যকারী হানী ইবনু উরওয়াকেও হত্যা করা হয়।[২১]

কূফা যাত্রাকালে হুসায়েন (রাঃ)-কে ছাহাবায়ে কেরামের নছীহত :

হুসায়েন (রাঃ) কূফায় রওয়ানা হওয়ার প্রাক্কালে আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস ও আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ)-এর ন্যায় উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ছাহাবীগণ তাঁকে বারবার নিষেধ করেন এবং আলী (রাঃ) ও হাসান (রাঃ)-এর সাথে কূফাবাসীদের পূর্ববর্তী বিশ্বাসঘাতকতার কথা তাঁকে জোরালোভাবে স্মরণ করিয়ে দেন। ইবনু আব্বাস ও ইবনু ওমরের বারবার তাকীদ সত্ত্বেও যখন তিনি ফিরলেন না, তখন ইবনু আব্বাস (রাঃ) তাকে বললেন, যদি ইরাকীরা সত্যিই আপনাকে চায়, তবে তারা সদলবলে এসে আপনাকে সসম্মানে নিয়ে যাক। কিন্তু তারা

---

৭. ড. মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল হাদী আশ-শায়বানী ও মুহাম্মাদ সালিম আল-খিযরি, আল-ক্বাওলুস সাদীদ ফী সীরাতিল হুসাইন আশ-শাহীদ, (কুয়েত : মাবাররাতুল আলি ওয়াল আছহাব, ১ম প্রকাশ, ২০১০ খ্রি.), পৃঃ ১৩৫।
৮. আবুল ফারজ আল-ইছফাহানী, মুক্বাতালুত ত্বালেবীন, পৃঃ ৯৫-৯৬। গৃহীত: আল-ক্বাওলুস সাদীদ, পৃঃ ১৩৬।
৯. আল-বিদায়াহ ৮/১৫৪।
১০. ইউসুফ আল-মিয্যী, তাহযীবুল কামাল, ৫/৪২৩ পৃঃ; ইবনু হাজার আসক্বালানী, তাহযীবুত তাহযীব, ২/৩০১ পৃঃ।
১১. মুরূজুয যাহাব, ৩/৫৫পৃঃ।
১২. ফুতূহুল বুলদান ৫/৩৬ পৃঃ; মাক্বতালুল খাওয়ারিযমী, ১/১৯৬ পৃঃ।
১৩. তারীকুল উমামি ওয়াল মুলূক, ৩/২৭৫ পৃঃ; মুরূজুয যাহাব, ৩/৫৫পৃঃ।
১৪. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ৩/১৯৯ পৃঃ।
১৫. তারীকুল উমামি ওয়াল মুলূক, ৩/২৭৯ পৃঃ।
১৬. তাহযীবুল কামাল ৬/৪২৩; তাহযীবুত তাহযীব ২/৩০১।
১৭. আল-ইক্বদুল ফারীদ, ৪/৩৭৬-৭৭।
১৮. আল-ক্বাওলুস সাদীদ, পৃঃ ১৩৬।
১৯. বালাযুরী, আনসাবুল আশরাফ, ৩/১৬৭ পৃঃ।
২০. আল-ইছাবাহ, ক্রমিক ১৭২৬ 'হুসায়েন (রাঃ)'; আল-বিদায়াহ ৮/১৭১।
২১. ত্বাবারী, তারীখুল উমামি ওয়াল মুলূক, ৩/২৮১-৮২ পৃঃ; মুক্বাতালুত ত্বালেবীন, পৃঃ ৬৭-৬৮।

তো কেবল চিঠি পাঠিয়েছে। কিন্তু হুসায়েন (রাঃ) কোন কথাই শুনলেন না। অবশেষে বারবার অনুরোধ করে ব্যর্থ হয়ে ইবনু আব্বাস বললেন, ইরাকীরা প্রতারক। আপনি তাদের ধোঁকায় পড়বেন না। এরপরেও যদি আপনি নিতান্তই যেতে চান, তবে আমার অনুরোধ, আপনি মহিলা ও শিশুদের নিয়ে যাবেন না। আমি ভয় পাচ্ছি যে, ওছমান যেভাবে তাঁর স্ত্রী ও সন্তানদের সামনে নিহত হয়েছেন, আপনিও তেমনি ওদের চোখের সামনে নিহত হবেন'। এরপর আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) এসে তাঁকে বুঝালেন। কিন্তু তাতেও তিনি ফিরলেন না। তখন তিনি তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে বুক ভাসিয়ে শেষ বিদায় দেন এই বলে, أَسْتَوْدِعُكَ اللهَ مِنْ قَتِيْلٍ 'হে নিহত! আল্লাহ্র যিম্মায় আপনাকে সোপর্দ করলাম'।

এভাবে একে একে আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের, মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফিইয়াহ, আবু সাঈদ খুদরী, আবু ওয়াক্বিদ লায়ছী, জাবের বিন আব্দুল্লাহ, মিসওয়ার বিন মাখরামাহ, উমরাহ বিনতে আব্দুর রহমান, আবুবকর বিন আব্দুর রহমান, আব্দুল্লাহ বিন জা'ফর, আমর বিন সাঈদ ইবনুল 'আছ প্রমুখ ছাহাবীগণ তাঁকে কূফায় না যাওয়ার অনুরোধ করেন। বিশেষ করে আবুবকর বিন আব্দুর রহমান এসে তাঁকে বলেন, هُمْ عَبِيْدُ الدُّنْيَا فَيُقَاتِلُكَ مَنْ قَدْ وَعَدَكَ أَنْ يَّنْصُرَكَ 'ওরা দুনিয়ার গোলাম। অতএব যারা আপনাকে সাহায্যের নিশ্চিত ওয়াদা করেছে, ওরাই আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে'। কিন্তু সবাইকে নিরাশ করে হুসায়েন জবাব দেন, مَهْمَا يَقْضِى اللهُ مِنْ أَمْرٍ يَكُنْ 'আল্লাহ যেটা ফায়ছালা করবেন, সেটাই হবে'। এই জবাব শুনে আবুবকর বিন আব্দুর রহমান বলে উঠলেন, *'ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'উন'*।[২২]

২২. *আল-বিদায়াহ ৮/১৬২-৬৩; তাহযীবুত তাহযীব ২/৩০৭।*

আত-তাহরীক টিভির সাথে থাকুন ঘরে বসে বিশুদ্ধ দ্বীন শিখুন!
আত-তাহরীক টিভি
অহির আলোয় উদ্ভাসিত জীবনের জন্য
অনলাইন ভিত্তিক টেলিভিশন চ্যানেল 'আত-তাহরীক টিভি' পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক দ্বীনি অনুষ্ঠানমালা প্রচার করে যাচ্ছে। সম্পূর্ণ বিজ্ঞাপন মুক্ত ও বিষয়ভিত্তিক আলোচনা সমূহ দেখার জন্য আমাদের সাথেই থাকুন।
ওয়েবসাইট :
www.hadeethfoundationbd.com
www.ahlehadeethbd.org
www.tawheederdak.com
www.at-tahreek.com
মোবাইল এ্যাপ পেতে স্ক্যান করুন
মোবাইল নম্বর : ০১৪০৪-৫৩৬৭৫৪
ফেসবুক পেইজ
At-Tahreek Tv
Monthly At-Tahreek
ইউটিউব চ্যানেল
At-Tahreek Tv
Ahlehadeeth Andolon Bangladesh

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, হুসায়েন যাত্রার ব্যাপারে আমাকে পরাস্ত করেছে। আমি তাকে বললাম, اتق الله في نفسك، والزم بيتك، ولا تخرج أمامك، 'তুমি তোমার নিজের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর, তোমার ঘরকে আঁকড়ে ধরে থাক, সামনে অগ্রসর হইও না'।[২৩]

জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, আমি হুসায়েনের সাথে কথা বলেছি। তাকে বললাম, اتق الله ولا تضرب الناس بعضهم ببعض، فوالله ما حمدتم ما صنعتم، فعصاني، 'আল্লাহকে ভয় কর। মানুষকে পরস্পরের সাথে হত্যায় লিপ্ত কর না। আল্লাহ্র শপথ! তোমরা যা করতে যাচ্ছ তা প্রশংসনীয় নয়। কিন্তু সে আমার কথা রাখল না'।

আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়ের (রাঃ) বলেন, আপনি কি এমন এক কওমের নিকটে যাচ্ছেন যারা আপনার পিতা ও ভাইকে হত্যা করেছে? হুসায়েন (রাঃ) বললেন, আমি সেখানে নিহত হলেও মক্কায় থাকা অপেক্ষা সেখানে যেতে পসন্দ করি'।[২৪] অনুরূপভাবে ইবনু মুতী' ও ইবনু আইয়াশ কূফাবাসী ও তাদের গাদ্দারী সম্পর্কে হুসায়েন (রাঃ)-কে সতর্ক করেন।[২৫]

[ক্রমশঃ]

২৩. *তাহযীবুল কামাল ৬/৪৬১; আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ৯/১৬৫।*
২৪. *ইবনু আবী শায়বাহ ১৫/৯৫; তাবারী ৫/৩৮৪-৮৫ পৃঃ; তাহযীবুল কামাল ৬/৪৪০; আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ৮/১৮৩।*
২৫. *তাবারী ৫/৩৫১ পৃঃ; ইবনু সা'দ, তাবাক্বাত ৫/১২৪-১৪৫।*

ডা. সাম্মী লিউনার্দ কেয়া
এম.বি.বি.এস, এম.এস, (অবস-গাইনী)
বি.সি.এস (স্বাস্থ্য)
স্ত্রী রোগ, প্রসূতি বিদ্যা বিশেষজ্ঞ ও সার্জন
বি.এম.ডি.সি রেজিঃ নং এ-৪৯৩১৫
রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
যে সকল রোগের চিকিৎসা করা হয়
- Normal Delivery (সিজার ছাড়াই বাচ্চা হওয়া)-তে প্রাধান্য (রোগীর স্বাস্থ্যের সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা)।
- গর্ভধারণকালীন মায়ের বিভিন্ন জটিলতা নির্ণয় ও চিকিৎসা প্রদান।
- বাচ্চা না হওয়ার (বন্ধ্যাত্ব/ইনফার্টিলিটি) কারণ নির্ণয় ও চিকিৎসা প্রদান।
- ডিম্বাশয়ের সিস্ট-টিউমার এবং জরায়ু নালী চিকন/বন্ধ হয়ে যাওয়ার চিকিৎসা করা হয় এবং প্রয়োজনে অপারেশন করা হয়।
- লাইগেশন (Ligation) করার পর পুনরায় বাচ্চা নেওয়ার অপারেশন।
চেম্বার
মেডিপ্যাথ ডায়াগনষ্টিক কমপ্লেক্স
শুভেচ্ছা ভিউ (জমজম হাসপাতালের পার্শ্বে), কাজীহাটা, লক্ষীপুর, রাজশাহী।
রোগী দেখার সময় : বিকাল ৩-টা থেকে
ফোন : ০৭২১-৭৭৪৩৩৩ মোবাইল : ০১৭১২-৬৮৫২৯৭
সিরিয়ালের জন্য : ০১৭৯৯-৮৯৫৪৮৮, ০১৩০৮-৬৩৫৫৭২

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশিত বই সমূহ ও মাসিক আত-তাহরীক-এর প্রাপ্তিস্থান

রাজশাহী	: **হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিক্রয় কেন্দ্র**, নওদাপাড়া, ০১৭৭০-৮০০৯০০; ওয়াহীদিয়া লাইব্রেরী, রাণীবাজার ০১৭৩৭-১৫২০৩৬; হাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী, হেতেম খাঁ ছোট মসজিদ ০১৭৫১-৪৫৪৫৭৯ হাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী, তাহেরপুর ০১৭৩৮-৬৭৩৮৭০।
ঢাকা	: **প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স**, বাংলা বাজার ০১৭৮৪-০১২৯৬৪; **দারুল আবরার লাইব্রেরী**, বাংলাবাজার, ০১৭৮৪-০১২৯৬৪ আনোয়ার হোসেন, আনোয়ার বুক ডিপো, ৫০, বাংলাবাজার ০১৯২৪-৭৩৩৮১৫; মীযানুর রহমান, মুহাম্মাদপুর ০১৭৩৬-৭০০২০২; আনীসুর রহমান, মাদারটেক ০১৭১৮-৭৫৫৩৫৫; বাবু টেলিকম, মিরপুর ০১৭১৩-২০৩৩৯৬; মাহমূদুল হাসান, সততা লাইব্রেরী, ধামরাই ০১৭২৪৪৮৪২৩৪; তাসলীম পাবলিকেশন্স, কাঁটাবন ০১৯১৯-৯৬২৯১৯; হাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী, জিরানী, সাভার ০১৬০৮-০৮৮১২৮।
ময়মনসিংহ	: আবুল কালাম ০১৭৬৭-৪৬৮৮০৫। **মুন্সিগঞ্জ :** সুজন মাহমুদ, মাওয়া ০১৯২৬-১৬২৩০১। **মানিকগঞ্জ :** ইঞ্জিনিয়ার মনিরুল ইসলাম ০১৭৭২-৮৬৭৮৯৮। **নরসিংদী :** আব্দুল্লাহ ইসহাক, মাধবদী, ০১৯৩২০৭২৪৯২।
কুমিল্লা	: মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ, ইকরা লাইব্রেরী, বুড়িচং ০১৫৫৭-০০০৩৭৭; কামাল আহমাদ, লাকসাম ০১৮১২০৪৩৬৭১; ইসলামী জ্ঞানের আলো লাইব্রেরী ০১৬৭৬-৭৪৭৫৩২; বিসমিল্লাহ লাইব্রেরী ০১৬৮০-৩৫৫১৯০।
কুষ্টিয়া	: শহিদুল ইসলাম, আব্দুল্লাহ হার্ডওয়ার, কন্দর পদিয়া, ই.বি. কুষ্টিয়া ০১৭৪৫-০৩২৪০৭।
খুলনা	: আব্দুল মুকীত, খুলনা, ০১৯২০-৪৬০১৩১; মাসঊদুর রহমান ০১৯১৮-৯১৬৮৮১; সালেহা লাইব্রেরী ০১৭১১-২১৭২৮৮।
গাযীপুর	: বেলাল হোসাইন, তাওহীদ লাইব্রেরী, গাযীপুর, ০১৯১৩-০৭০৩৮৪; আব্দুছ ছামাদ শিকদার, ইসলামিয়া লাইব্রেরী, আনসার একাডেমী, গাযীপুর ০১৮২৫-৭৯১৮৭১; বাদশা মিয়া, ০১৭১৩-২৬৯৮৬০; মুহাম্মাদ এনামুল হক, সুমাইয়া লাইব্রেরী, মাওনা চৌরাস্তা ০১৯২২-১৫৭৫৭৩; ছাব্বির বই বিতান, টঙ্গী ০১৮৬৪৭৮১১১৭; ছিদ্দীক বই বিতান, আমান টেক্স সংলগ্ন ০১৯২৫-৪১৮২২০; খাইরুল ইসলাম, আমান টেক্স, বৈরাগীর চালা, গাযীপুর ০১৭২৯-৫৯৫১৬৬; হাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী, বোর্ড বাজার ০১৭৫৪-৩৯৪১৯১। **গোপালগঞ্জ :** খন্দকার অহীদুল ইসলাম, ব্যাংকপাড়া ০১৭২৫-৩৮৪১৭৫।
গাইবান্ধা	: হাদীছ ফাউণ্ডেশন পাঠাগার, গোলাপবাগ টিএণ্ডটি সংলগ্ন, গোবিন্দগঞ্জ ০১৭৩৭-৮৯৭০১১; ০১৭৩১-৪৮৫৭১৯; ডাঃ মোঃ হারূণুর রশীদ, আত-ত্বাকওয়া লাইব্রেরী, ০১৭২০-৫১১১৬৫; মোঃ আব্দুল আউয়াল, ইসলামিয়া লাইব্রেরী, সাঘাটা ০১৭২৫-৬৩৮৬০৮।
চট্টগ্রাম	: হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিক্রয় কেন্দ্র, চট্টগ্রাম শাখা ০১৭১৫-৮৮০৮৬৬।
চাঁপাই নবাবগঞ্জ	: হাদীছ ফাউণ্ডেশন পাঠাগার, শিবতলা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ০১৭৩০-৯২৫৭৬৬; হাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী, কানসাট ০১৭৪০-৮৫৬৬০৯; ডাক-বাংলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, রহনপুর ০১৭৩৮-৫৪৬৫১৭। রূহুল আমীন, আল-ইখলাছ স্টোর, বিশ্বরোড মোড়, হোসেন পাম্পের পাশে ০১৭৮৭-০৯০৭৪৭।
চুয়াডাঙ্গা	: সাঈদুর রহমান, জয়রামপুর, দামুড়হুদা ০১৯১৮-২১৬৫৮৫।
জামালপুর	: আনীসুর রহমান, আরিফ ফার্মেসী এণ্ড ইসলামিয়া লাইব্রেরী, সরিষাবাড়ী, জামালপুর ০১৯১৬-৭৬৯৭৩৪।
জয়পুরহাট	: হালাল সলিউশন, জয়পুরহাট সদর ০১৯৮০-৬৪৬০৬০; আল-আমীন, বটতলী বাজার, ক্ষেতলাল ০১৭৫৮-০৯৮৫৮০।
ঝিনাইদহ	: আসাদুল্লাহ, কিতাব ঘর ০১৭৫৩-৬৫২৮৬১; আল-আমীন টুপি ঘর, অগ্রণী ব্যাংকের নীচে, আহলেহাদীছ মসজিদের উত্তর পাশে, ডাকবাংলা বাজার ০১৯৩৯-৭৩৫৫১৮।
ঠাকুরগাঁও	: আব্দুল বারী, মীম লাইব্রেরী ০১৭১৭-০০৪১১৬; মুহাম্মাদ আবুবকর, মাকতাবাতুল হুদা ০১৭৬০-৫৮৮১০৯; যিয়াউর রহমান, আল-ফুরকান লাইব্রেরী, হরিপুর ০১৭৩৩-৬৬৬৯৩৪।
দিনাজপুর	: হাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী, বিরামপুর শাখা, দিনাজপুর ০১৭৮০-৬৫০১১১; ছাদিক হোসেন, মদীনা লাইব্রেরী, রাণীর বন্দর, ০১৭২৩-৮৯০৯১২; মুছাদ্দিক বিল্লাহ, যুবসংঘ লাইব্রেরী, পার্বতীপুর ০১৭২৩-৮৮৯৯১১; সাজ্জাদ হোসেন তুহিন ০১৭৪০-৫৬২৭২১; মীযানুর রহমান, তামীম বই ঘর, রাণীগঞ্জ, ঘোড়াঘাট ০১৭৩৭-৬০৭৪৮৮; আরাফাত ইসলাম ০১৭৫০-২৯০০৫৯; আল-আমীন লাইব্রেরী, খোলাহাটী ক্যান্টনমেন্ট সংলগ্ন, পার্বতীপুর, দিনাজপুর ০১৭৩৫-৪৭৪০৭২; হাদীছ ফাউণ্ডেশন পাঠাগার ও বই বিক্রয় কেন্দ্র, লালবাগ, সদর দিনাজপুর ০১৭৭৪-০২৪৯২৬; বাংলাহিলি হিলফুল ফুযুল মাদ্রাসা, হাকিমপুর ০১৯৮১-১২৮১২৪।
নওগাঁ	: আফযাল হোসাইন ০১৭১০-০৬০৪৭১; আতাউর রহমান, হামিদিয়া লাইব্রেরী ০১৭৬৫-৬৪৮১২৩; শাহজালাল লাইব্রেরী, ০১৭৪১-৩৮৮৮৯৪; মাদরাসা লাইব্রেরী ০১৭৭০-৬৩২৮৩২। আব্দুল আযীয, রহমানিয়া লাইব্রেরী, আনন্দনগর আহলেহাদীছ মসজিদ সংলগ্ন ০১৭৭২-৮৫৫৭৮৬।
নীলফামারী	: আব্দুস সালাম, বিদ্যা বুক হাউস ০১৭২৮৩৪৬৩১৩; এডুকেশন সেন্টার অব ইসলাম, ডিমলা ০১৭৮৩-৮৫৫৭৩২।
পাবনা	: রেযাউল করীম খোকন, রূপালী কনফেকশনারী ০১৭১৪-২৩১৩৬২; শীরীন বিশ্বাস ০১৯১৫-৭৫২৭১১; আব্দুল লতীফ, ০১৭৬১৭০৬৯৪১; হাসান আলী, আত-তাক্বওয়া জামে মসজিদ, চরমিরকামারী, ঈশ্বরদী, পাবনা ০১৭১৮-১২০৩১৫।
পটুয়াখালী	: ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মাদ মুনীরুল ইসলাম, নতুন বাসষ্ট্যাণ্ডের দক্ষিণে ০১৭৫৮-৯৩৯৪৩৭।
পঞ্চগড়	: আব্দুল ওয়াজেদ, ঝিলিমিলি কসমেটিক্স, ফুলতলা বাজার ০১৭১৩-৬৮৭৫৮০।
ফরিদপুর	: দেলোয়ার হোসাইন কোর্ট কম্পাউন্ড ০১৭১৩-৫৯৮৪৭৬। **মাগুরা :** ইলিয়াস, ০১৯২৮-৭০৭৬৪৩।
বগুড়া	: শাহীন লাইব্রেরী ০১৭৪১-৩৪৫৫৯৮; মামূন, আদর্শ লাইব্রেরী ০১৭১৮-৪০৮২৬৯; শরীফুল ইসলাম, সেনানিবাস ০১৪০৪-৫৩৫৫৯১; মদীনা অক্সফোর্ড লাইব্রেরী ০১৭১৬-৫৩৬৫৪৯।
মেহেরপুর	: জোনাকী লাইব্রেরী ০১৭১০১১৮৫১৪; রবীউল ইসলাম, মুজীব নগর বুকস্টল, বড় বাজার ০১৭৫৬-৬২৭০৩১।
যশোর	: মুহসিন, হেলাল বুক ডিপো, দড়াটানা ০১৯৭২-৩২৪৭৮২।
রংপুর	: রেযাউল করীম, **দারুসসুন্নাহ লাইব্রেরী**, সেন্ট্রাল রোড, ০১৭৪০-৪৯০১৯৯; হাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী, মুসলিমপাড়া শাখা ০১৭৩৭-৫৩১৯৮২, মতিউর রহমান, পীরগঞ্জ, ০১৭২৩-৩১৩৭৫৮; আর রহমান লাইব্রেরী শঠিবাড়ী ০১৮১০-০১০৮৭৮।
লালমণিরহাট	: শাহ আলম, ফাহমিদা লাইব্রেরী, মহিষখোচা ০১৯১৬-৪৯১৭৯৮; ছালেহা লাইব্রেরী ০১৭১১-২১৭২৮৮; তাজ লাইব্রেরী ০১৭২৪-৮৪৩২৮৩।
সিরাজগঞ্জ	: সত্যের আলো লাইব্রেরী, জামতৈল পূর্ব বাজার, কামারখন্দ ০১৭১৬-৯৬৯৭৯৬।
সিলেট	: ই,সি,এস, লাইব্রেরী, সিলেট ০১৭১২-৬৬৮৩৪৫; শহীদুল ইসলাম, আত-তাকওয়া মসজিদ ০১৭৬১-৯৮২৫৯৭।
সাতক্ষীরা	: হাবীবুর রহমান ০১৭৪০-৬২৬০৫৭; মাগফূর রহমান বাবলু, বাঁকাল ০১৭১৬-১৫০৯৫৩; আব্দুস সালাম, মল্লিক লাইব্রেরী, কলারোয়া ০১৭৪৮-৯১০৮২৫। **বাগেরহাট :** শেখ জার্জিস আহমাদ ০১৭১৩-৯০৫৩১৬।

উত্তম প্রতিশোধ

*-মূল : মুহসিন জব্বার, অনুবাদ : নাজমুন নাঈম**

একজন বৃদ্ধ কৃষকের একটি বিশাল খেজুর বাগান ছিল। এর মধ্যে একটি গাছ ছিল খুবই উন্নতমানের। তিনি গাছটিকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন এবং বিশেষ পরিচর্যা করতেন। গাছটির উৎকৃষ্ট মানের সুমিষ্ট খেজুরের এলাকা জুড়ে সুখ্যাতি ছিল। গাছটিতে ফলনও হ'ত তুলনামূলক বেশী। কৃষক প্রতি বছর সকলকে জানান দিয়ে এ গাছের খেজুর নামাতেন। এলাকার লোকজনও খেজুর কেনার জন্য নির্দিষ্ট দিনে বাগানে ভিড় জমাতো। ঐ গাছের সাথে সাথে কৃষকের বাগানের অন্য খেজুরও অধিক পরিমাণে বিক্রি হ'ত। এতে কৃষক বেশ লাভবান হ'তেন। ফলে গ্রামের অন্য কৃষকেরা তাকে হিংসা করত।

একবার খেজুর সংগ্রহের আগের রাতে সেই গাছের সব খেজুর চুরি হয়ে গেল। এজন্য পরবর্তী বছর কৃষক আর খেজুর সংগ্রহের তারিখ ঘোষণা করলেন না। কেবল কয়েকজন বন্ধু-বান্ধব ও প্রতিবেশীরাই বিষয়টি জানত। কিন্তু দেখা গেল, সে বছরেও আগের রাতে খেজুর চুরি হয়ে গেল। চোরের সুনির্দিষ্ট সময়জ্ঞান দেখে কৃষক নিশ্চিত হয়ে গেলেন যে, এটি তার প্রতিবেশী বা নিকটাত্মীয়দের মধ্যেই কেউ করেছে, যারা প্রতি রাতে তার বাড়িতে এসে কফি পান করত ও খোশগল্প করত।

পরের বছর তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে সেই খেজুর গাছের প্রসঙ্গ তুললেন এবং বন্ধু ও প্রতিবেশীদের মধ্যে একাধিকবার এ'লান করলেন যে, তিনি নির্দিষ্ট দিনে খেজুর সংগ্রহ করবেন। এরপর সেই নির্ধারিত দিনের আগের রাতে তিনি বন্দুক নিয়ে বাগানের একটি ছোট টিবির আড়ালে চোরের অপেক্ষায় বসে থাকলেন।

অপেক্ষা বেশী দীর্ঘ হ'ল না। কিছুক্ষণের মধ্যে একজন লোক লাঠি ভর দিয়ে হেঁটে আসতে লাগল, যার মুখচ্ছবি প্রথমে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না। তবে যখন লোকটি আরও কাছে আসলো, কৃষক বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন! কারণ চোর আর কেউ নয়, তার অন্ধ প্রতিবেশী আবু সাঈদ।

অন্ধ আবু সাঈদকে দেখে কৃষকের কৌতুহল হ'ল। তিনি বন্দুক রেখে দেখার সিদ্ধান্ত নিলেন যে, একজন অন্ধ ব্যক্তি কিভাবে এত উঁচু গাছ থেকে খেজুর চুরি করতে পারে। তিনি দেখলেন, আবু সাঈদ সাবধানে লাঠির সাহায্যে রাস্তা অনুভব করতে করতে খেজুর গাছের কাছে আসল। একটি দড়ি বের করল এবং সেটি গাছের চারপাশে পেঁচিয়ে নিজের পিঠের পেছনে বাঁধল, যাতে সে ও গাছের গুঁড়ি একই বৃত্তের মধ্যে থাকে। এরপর প্রচলিত কৌশলে গাছে উঠতে লাগল। গাছে উঠতে উঠতে যখন তার মাথা খেজুর পাতার স্পর্শ পেল, তখন সে বুঝল যে, গাছের চূড়ায় পৌঁছে গেছে। এরপর সে খেজুরের থোকা গুলো কাটতে লাগল। সব কাজ শেষ হ'লে সে একই উপায়ে নিচে নেমে আসলো এবং চুপচাপ নিজের বাড়ির দিকে চলে গেল। তখন কৃষক ভাবলেন, একজন অন্ধ মানুষকে হত্যা করার জন্য গুলি নষ্ট করা বৃথা। তাছাড়া একজন অন্ধকে চুরির দায়ে হত্যা করলে মানুষ তা বিশ্বাস করবে না। উপরন্তু তার সুনাম নষ্ট হবে। তাই তিনি প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য এক পরিকল্পনা করলেন।

কৃষক প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য পরের মৌসুম পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। তিনি তার ক্ষোভ পুরো একটি বছর ধরে লুকিয়ে রাখলেন। যখন খেজুর সংগ্রহের সময় ঘনিয়ে আসল, তখন তিনি পূর্বের ন্যায় এলাকা জুড়ে খেজুর সংগ্রহের তারিখ ঘোষণা করলেন। বিশেষ করে আবু সাঈদের সামনে জোরে জোরে বললেন, আমি আগামীকাল সকালেই খেজুর নামিয়ে ফেলব। আশা করি এই বছর আমার খেজুর গাছ চোরের হাত থেকে রক্ষা পাবে।

এরপর রাত নামার আগেই কৃষক তার প্রিয় খেজুর গাছের কাছে গেলেন। তিনি গাছের সব খেজুর ও পাতা কেটে ফেললেন। ফলে গাছটি শুধু একটি মাথাহীন গুঁড়িতে পরিণত হ'ল। এরপর তিনি নিশ্চিন্তে ঘুমাতে গেলেন।

রাতে আবু সাঈদ তার চেনা পদ্ধতিতে দড়ি বেঁধে গাছে উঠতে লাগল। কিন্তু এবার গাছে কোন খেজুর বা পাতা ছিল না, যার স্পর্শে সে বুঝতে পারবে যে, সে গাছের চূড়ায় পৌঁছে গেছে। ফলে খেজুর ও পাতার স্পর্শের আশায় আবু সাঈদ উপরের দিকে উঠতে লাগলো। কিন্তু পত্র-পল্লবহীন ন্যাড়া গাছের একেবারে উপরে উঠে গিয়ে সে পিছন দিকে পড়ে গেল এবং মর্মান্তিকভাবে মৃত্যুবরণ করলো। পরদিন সকালে ঘোষণা অনুযায়ী সকলে বাগানে উপস্থিত হয়ে বুঝতে পারল, চোর আসলে কে ছিল!

এখানে সবচেয়ে বেশী অবাক করা বিষয় ছিল কৃষকের ধৈর্য ও প্রতিশোধের জন্য দীর্ঘ অপেক্ষা। তিনি সম্পূর্ণ এক বছর ধরে কিভাবে নিজের রাগ লুকিয়ে রাখলেন, আর কিভাবে এতদিন আবু সাঈদের সাথে হাসিমুখে কথাবার্তা বলতেন সেটাই বিস্ময়কর! অবশেষে তিনি এমন কৌশল প্রয়োগ করলেন, যাতে অন্ধ চোরও মৃত্যুবরণ করল, তার সুনামও অক্ষুণ্ন থাকল।

** শিক্ষার্থী, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

ডাঃ মোঃ শওকত হাসান

এমবিবিএস (এসএসএমসি)
পিজিটি (ডায়াবেটিস, থাইরয়েড ও হরমোন)
ডি-কার্ড (কোর্স-কার্ডিওলজি)
হৃদরোগ, মেডিসিন, ডায়াবেটিস চিকিৎসক
স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ, ঢাকা।

ফেনী কার্ডিয়াক সেন্টার
এন্ড স্পেশালাইজড হাসপাতাল

১৭০, শহীদ শহিদুল্লাহ কায়সার সড়ক, পুলিশ কোয়ার্টার,
(ফেনী চক্ষু হাসপাতালের পার্শ্বে), ফেনী।
ফোন: ০৩৩১-৬২১১৭, মোবাইল: ০১৯০৫-১১১৬৬৬
০১৯০৫-২২২৭৭৭, ০১৯০৫-৭৭৭১১১

রোগী দেখার সময়
প্রতিদিন সকাল ৯-টা দুপুর ২-টা, বিকাল ৪-টা রাত ৮-টা (শুক্রবার বন্ধ)

লাল চালের পুষ্টিগুণ

-আত-তাহরীক ডেস্ক

বর্তমানে মানুষ খাদ্যের স্বাদ ও চেহারার প্রতি যতটা মনোযোগী, তার চেয়ে অনেক কম মনোযোগী হচ্ছে খাদ্যের পুষ্টিমান ও স্বাস্থ্য উপযোগিতার প্রতি। আমাদের দেশে সাদা মিনিকেট চাল দিন দিন জনপ্রিয় হয়ে উঠছে মূলত তার চকচকে রঙ ও চিকন আকৃতির কারণে। কিন্তু এই চাল প্রসেসিংয়ের সময় এর প্রাকৃতিক আঁশ, ভিটামিন বি, আয়রণসহ নানা পুষ্টিগুণ নষ্ট হয়ে যায়। ফলস্বরূপ, দীর্ঘদিন এই চাল খাওয়ার ফলে দেহে অপুষ্টি, ডায়াবেটিস, কোষ্ঠকাঠিন্য ও রক্তস্বল্পতা ইত্যাদি রোগের ঝুঁকি বাড়ে।

অপরদিকে আমাদের নিজস্ব কৃষিভিত্তিক ঐতিহ্যের অংশ লাল চাল। ধান থেকে খোসা ছাড়ানোর পর পরই পাওয়া যায় ব্রাউন রাইস বা লাল চাল। এটি অপেক্ষাকৃত কম প্রক্রিয়াজাত, আঁশসমৃদ্ধ ও প্রাকৃতিকভাবে বিভিন্ন খনিজ পদার্থে পূর্ণ। লাল চাল নিয়মিত খেলে হযমশক্তি ভালো থাকে, রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে থাকে এবং দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে। তাই শরীর ও স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করে আমাদের উচিত চকচকে চালের পরিবর্তে স্বাস্থ্যকর ও পুষ্টিকর লাল চাল খাওয়া এবং অন্যদেরও এ বিষয়ে সচেতন করা।

লাল চালের পুষ্টিগুণ :

সাদা চালের মত লাল চালে ক্যালোরি এবং কার্বোহাইড্রেট ভরপুর, তবে অন্যান্য প্রায় সকল পুষ্টির ক্ষেত্রে বাদামী বা লাল চাল সাদা চালকে ছাড়িয়ে যায়। এই গোটা শস্যটি ফোলেট, রাইবোফ্লাভিন (বি-২), পটাশিয়াম এবং ক্যালসিয়ামের একটি ভাল উৎস।

উপরন্তু লাল চালে অধিক হারে ম্যাঙ্গানিজ বিদ্যমান। এই খনিজ উপাদানটি শরীরের অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়ার জন্য অত্যাবশ্যক। যেমন হাড়ের বিকাশ, ক্ষত নিরাময়, পেশী সংকোচন, বিপাক, স্নায়ুর কার্যকারিতা এবং রক্তে শর্করার নিয়ন্ত্রক। ম্যাঙ্গানিজের অভাবে বিপাকীয় সমস্যা, হাড়ের ক্ষয়, দুর্বল বৃদ্ধি এবং কম উর্বরতা সম্বলিত জটিলতা সৃষ্টি হ'তে পারে। আপনার প্রায় সমস্ত দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় পুষ্টির জন্যে এই চালের মাত্র এক কাপ ভাত-ই যথেষ্ট।

ভিটামিন ও খনিজ ছাড়াও, লাল চাল শক্তিশালী উদ্ভিদ যৌগ সরবরাহ করে। উদাহরণস্বরূপ, লাল চালের মধ্যে রয়েছে ফেনল এবং ফ্ল্যাভোনয়েডস নামক এক প্রকার অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট, যা শরীরকে জারণ চাপ থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করে। অক্সিডেটিভ স্ট্রেস হৃদরোগ, ক্যান্সার এবং অকাল বার্ধক্য সহ বেশ কয়েকটি ভয়াবহ রোগের দিকে ধাবিত করে।

ব্রাউন রাইসে পাওয়া অ্যান্টিঅক্সিডেন্টগুলো ফ্রি-র‍্যাডিক্যাল নামক অস্থির অণু দ্বারা সৃষ্ট কোষের আঘাত রোধ করতে এবং শরীরের প্রদাহ কমাতে সাহায্য করে।

ওযন কমাতে লাল চাল :

লাল চাল ওযন কমাতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। সাদা চালের মতো পরিশোধিত শস্যের তুলনায় লাল চালের মতো গোটা শস্য প্রচুর পরিমাণে ফাইবার এবং পুষ্টি ধারণ করে। যেমন ১৫৮ গ্রাম লাল চালের মধ্যে ৩.৫ গ্রাম ফাইবার থাকে, যা সাদা ভাতের মধ্যে থাকে ১ গ্রামেরও কম। ফাইবার দীর্ঘ সময় ধরে আপনার পাকস্থলি পরিপূর্ণ রাখে বিধায় ফাইবার সমৃদ্ধ খাবার নির্বাচন আপনাকে সামগ্রিকভাবে কম ক্যালোরি গ্রহণে সাহায্য করতে পারে। লাল চাল পেটের মেদ কমাতেও সাহায্য করে।

হার্টের সুস্থতায় লাল চাল :

লাল চাল ফাইবার এবং উপকারী যৌগসমৃদ্ধ হওয়ায় এটি হৃদরোগের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে। লাল চালের ভাতে লিগনান্স নামক যৌগ রয়েছে, যা হৃদরোগের ঝুঁকির কারণগুলো উপশমে সাহায্য করে। লিগনান সমৃদ্ধ খাবার যেমন- তিসি, তিল এবং বাদাম, উচ্চ কলেস্টেরল, নিম্ন রক্তচাপ এবং ধমনীর শক্ত হয়ে যাওয়া হ্রাসে সাহায্য করে। লাল চালের মধ্যে থাকা ম্যাগনেসিয়াম নামক খনিজ উপাদান হার্ট-সুস্থ রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

উচ্চ ডায়াবেটিস কমাতে লাল চাল :

যদিও রক্তে শর্করার উপর কার্বোহাইড্রেট সবচেয়ে বেশী প্রভাব ফেলে, ডায়াবেটিস আক্রান্ত ব্যক্তিরা সাদা ভাতের মতো পরিশোধিত শস্য জাতীয় খাবারগুলো কম খেয়ে রক্তে শর্করা এবং ইনসুলিনের স্পাইক কমিয়ে থাকেন। সাদা চালের বদলে লাল চাল খেয়ে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ব্যক্তিরা বিভিন্ন উপায়ে উপকৃত হ'তে পারেন। লাল চালে বিদ্যমান ম্যাগনেসিয়াম এবং ফাইবার উভয়ই রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।

লাল চালে সাদা ভাতের তুলনায় কম গ্লাইসেমিক ইনডেক্স থাকে, যার অর্থ হ'ল এটি ধীরে হযম হয় এবং রক্তে শর্করার উপর কম প্রভাব ফেলে। সাদা চালে গ্লাইসেমিক সূচক (জিআই)-এর মাত্রা বেশী, যা একটি খাদ্য কত দ্রুত রক্তে শর্করা বাড়ায় তা পরিমাপ করে। লাল চালের জিআই-৫০ এবং সাদা চালের জিআই-৮৯, যার অর্থ হ'ল সাদা চাল রক্তে শর্করার মাত্রা লাল চালের তুলনায় অনেক দ্রুত বৃদ্ধি করে। উচ্চ-জিআই খাবার খাওয়ার সাথে টাইপ-২ ডায়াবেটিস সহ বেশ কিছু দীর্ঘস্থায়ী রোগ হওয়ার সম্ভাবনা জড়িত। লাল চাল প্রাথমিক অবস্থায় টাইপ-২ ডায়াবেটিস হওয়ার সম্ভাবনা হ্রাস করতে পারে।

ক্ষতিকর গ্লুটেন এড়াতে লাল চাল :

গ্লুটেন একটি প্রোটিন যা গম, বার্লি এবং রাইয়ের মতো শস্যে পাওয়া যায়। অনেকে গ্লুটেনে অ্যালার্জি থাকার কারণে পেটে ব্যথা, ডায়রিয়া, ফুসকুড়ি এবং বমির মতো হালকা থেকে গুরুতর প্রতিক্রিয়া অনুভব করে থাকেন। উপরন্তু গাঁট-ফোলানো বাত ও টাইপ-১ ডায়াবেটিসের মত অটোইমিউন রোগাক্রান্ত লোকেরা প্রায়ই গ্লুটেন-মুক্ত খাদ্য থেকে উপকৃত হন। এই সকল কারণে গ্লুটেন-মুক্ত খাবারের ক্রমবর্ধমান চাহিদা সৃষ্টি হয়েছে।

সৌভাগ্যবশত লাল চালের ভাত প্রকৃতিগতভাবেই এই সমস্যাযুক্ত প্রোটিন থেকে মুক্ত থাকার কারণে যারা গ্লুটেন নিতে পারেন না তাদের নিরাপদ পসন্দে পরিণত হয়েছে। উল্লেখ্য, গ্লুটেন-মুক্ত ডায়েটে থাকা লোকেদের জন্য বিভিন্ন স্বাস্থ্যকর গ্লুটেন-মুক্ত পণ্য যেমন ক্র্যাকার এবং পাস্তার মধ্যেও লাল চাল ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

[সংকলিত]

কবিতা

শিরক ও বিদ‘আতের ছায়া

-মিছবাহুল হক
গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

শিরকের মেঘে ঢাকা আজি তাওহীদের আকাশ,
আক্বীদা-আমলে সুন্নাহ্র নামে বিদ‘আতের প্রকাশ।
কথায় কথায় শিরনী খাওয়ার চলছে আয়োজন,
রাসূল বিধান দিলেন কি-না, নেইকো প্রয়োজন।
দরগা ঘুরে চাওয়া-পাওয়া, মাযারে সিজদা করি,
এ কোন্ দ্বীন শেখা হ’ল, কোন্ হেদায়াত ধরি?
কবরকে বানিয়েছি মসজিদ, গাই না‘তের ছলে গান,
তিন-চল্লিশায় ব্যবহার হয় পবিত্র কুরআন।
চাঁদা তুলে পাড়ায় পাড়ায় জালসা আয়োজন,
কুরআন-হাদীছ নেই তো সেথায়, সস্তা আলাপন।
নবী বলেন, বিদ‘আত সবই ভ্রষ্টতা-গোমরাহী
তবুও আমরা শিরক মানি, বিদ‘আতের গান গাহি।
আখেরাতে মুক্তি পেতে শিরক-বিদ‘আত ভুলি,
এসো সবাই নবীর দেয়া হেদায়াত মেনে চলি।
তাওহীদের দাওয়াত নিয়ে উঠো হে নওজোয়ান,
পরিশুদ্ধ ঈমানের বলে হও সবে বলিয়ান।
আহ্বান করো পথহারাদের ছহীহ দ্বীনের পানে,
ছহীহ আক্বীদা, বিশুদ্ধ আমল থাক সবার জীবনে।
হোক প্রতিজ্ঞা, চলুক প্রচেষ্টা, থাকুক ভালোবাসা,
শিরক-বিদ‘আত দূর হোক, ছহীহ সুন্নাহ জিন্দাবাদ
এটাই প্রত্যাশা।

ইলমে দ্বীনের আলো

-খায়রুল ইসলাম
ফেনী সদর, ফেনী।

ইলমে দ্বীন তো বাঁচার পথ জীবন-ইমতিহানে,
এই জ্ঞান ছাড়া চলবে না গাড়ি কভু সফলতার পানে।
ছালাতের মাঝে খুশূ-খুযূ চাই, কুরআন বুঝি না,
খাঁটি দ্বীনের সন্ধান চাই, হাদীছ শিখি না।
যুক্তি দিয়েই সব বুঝি মোরা জ্ঞান তো আগে না,
ফৎওয়াবাজী করতে মোদের ইলম লাগে না।
তাইতো মোরা দিনে দিনে হচ্ছি বিপথগামী,
ছওয়াব তাতেই, যার শুরুতে রয়েছে দলীল ‘ইসলামী’।
এটা তো এক অন্ধের কাজ, মোরা তো অন্ধ নই,
জ্ঞান-বিজ্ঞান শাসন করেছি, সেই দিন গেল কই!
শোন ভাই! আর দেরী নয় এসো ইলম শিখি,
ইলমে দ্বীনের আলো দিয়ে দুনিয়াটাকে দেখি।
দুনিয়ার মাল-সম্পদ যত, সবই তো যাবে রয়ে,
উপকারী জ্ঞান চিরদিন রবে নেকীর পশরা হয়ে।
ছোট হোক আর বড় হোক, সবার জন্য জ্ঞান,
কুরআন-হাদীছ শিক্ষা করা সবার হোক ধ্যান।

দ্বীনী দাওয়াত

-মুনাওয়ার হোসাইন
ঈশ্বরদী, পাবনা।

এসো মুসলিম দাওয়াত দেই
আল্লাহ ছাড়া মা‘বূদ নেই,
নবীর দেখানো পথ ছাড়া
অন্য কোন সুপথ নেই।
এক কুরআন এক হাদীছ মানি
এক কা‘বা এক রাসূল জানি,
সব ভেদাভেদ ভুলে এসো
ছহীহ আক্বীদায় ঈমান আনি।
মোদের যাহা দিলেন রব
দ্বীনের জন্য যাক সেসব,
দ্বীনকে সদা রক্ষা করব
তাতেই শান্তি অনুভব।
জীবন যদি বিলিয়ে দেই
এর মত তো শান্তি নেই,
শহীদ হব মুক্তি পাবো
চিরদিন রব জান্নাতেই।
এই চাওয়াটাই রবের দারে
তুষ্টি দাও গো মনের ঘরে,
দুনিয়া আমার হোক না আঁধার
আলো জ্বলুক মাটির গোরে।

সূরা আছর

-কামারুয্যামান
ছোট বেলাইল, বগুড়া।

আল্লাহ বলেন, কালের শপথ!
ক্ষতিগ্রস্থ হবে অবশ্যই সকল মানুষ।
চারটি গুণে গুণান্বিত হ’তে পারে যারা,
সকল প্রকার ক্ষতি থেকে বেঁচে যাবে তারা।
জেনে বুঝে ঈমান এনে নেক আমল করবে
অবশ্যই ক্ষতি থেকে তারা রেহাই পাবে।
পরস্পরকে হক্বের উপদেশ অবশ্যই দিবে
নইলে ক্ষতির আশংকা নিশ্চয়ই থেকে যাবে।
হকের দাওয়াত দিতে গেলে ধৈর্যের প্রয়োজন,
উপদেশ দিলে ধৈর্যের, হবে পাপের ক্ষতিপূরণ।
সূরা আছরের উক্ত চারটি গুণে হব গুণান্বিত,
আল্লাহ্র ক্ষমা পেয়ে মোরা জান্নাতে হব সম্মানিত।

দৃষ্টি আকর্ষণ

আত-তাহরীক-এ প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের দায়ভার সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞাপন দাতার। এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের কোন দায়বদ্ধতা নেই। -*সম্পাদক*।

স্বদেশ

হজ্জ ব্যবস্থাপনায় দক্ষিণ এশিয়ায় সেরা বাংলাদেশ

দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে হজ্জ ব্যবস্থাপনায় এ বছর প্রথম হয়েছে বাংলাদেশ। হজ্জ শেষে সঊদী সরকার এ তালিকা প্রকাশ করেছে বলে জানিয়েছে এজেন্সিদের সংগঠন 'হাব'। হাব বলছে, ভারত-পাকিস্তানসহ দক্ষিণ এশিয়ার ৬ দেশের হজ্জ ব্যবস্থাপনা নিয়ে সঊদী আরব সরকারের প্রকাশ করা তালিকায় এবার প্রথম হয়েছে বাংলাদেশ। হাবের মহাসচিব ফরীদ আহমাদ মজুমদার বলেন, এ বছরের হজ্জ ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত সুন্দর ছিল। সঊদী আরব, বাংলাদেশ উভয় পর্বে অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে নিবন্ধিত সকল হজ্জযাত্রী হজ্জ পালন করতে গেছেন। এটি আমাদের জন্য মাইলফলক।

হাবের সভাপতি বলেন, সবাই মিলে ঐক্যবদ্ধভাবে হজ্জ ব্যবস্থাপনা সুন্দর করার চেষ্টা করেছি। এ বছর আল্লাহ্‌র রহমতে হজ্জের জন্য কোন কান্নাকাটি নেই, মারামারি নেই, টিকেটের কোন অভাব হয়নি। ছিল না তেমন কোন অভিযোগ। দেশে ফিরে আসা হাজীরা এবারের ব্যবস্থাপনায় সন্তুষ্ট।

ভারতের দখলে বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী যেসব সম্পদ

পঞ্চগড় যেলার সদর, তেঁতুলিয়া ও বোদা উপযেলার বিভিন্ন সীমান্তে কয়েকশ' একর অমীমাংসিত জমি দীর্ঘদিন ধরে দখল করে রেখেছে ভারত। সূত্র অনুযায়ী, ২০১৫ সালের ৩১শে আগস্ট বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ছিটমহল বিনিময় চুক্তি বাস্তবায়িত হয়। এতে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে থাকা ভারতের ১১১টি ছিটমহল (১৭,১৬০ একর) এবং ভারতের অভ্যন্তরে থাকা বাংলাদেশের ৫১টি ছিটমহল (৭,১১০ একর) বিনিময় হয়। তবে সীমান্ত এলাকার লোকজনের অভিযোগ, ভারত ঐ বিনিময়ে জমির দিক থেকে লাভবান না হওয়ায়, পরবর্তীতে বিভিন্ন অমীমাংসিত জমি দখল করে নেয়।

যেলা প্রশাসন ও স্থানীয় সূত্রের তথ্যমতে, তেঁতুলিয়া উপযেলার বাংলাবান্ধা ইউনিয়ন, পঞ্চগড় সদর উপজেলার হাড়িভাষা ইউনিয়ন ও বোদা উপযেলার বড়শী ইউনিয়নে বড় অংশের জমি সহ ৬-৭শ' একর জমি ভারতের দখলে রয়েছে।

সীমান্তবাসীর অভিযোগ, বিগত ১৫ বছর ধরে সরকার ভারতের অনুকূলে নীরব ভূমিকা পালন করেছে। জমি হারালেও কার্যকর কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি। তারা বলছেন, এখন আর বাংলাদেশের নতজানু পররাষ্ট্রনীতি চলবে না। ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্য সরকারের দৃঢ় অবস্থান নেওয়া প্রয়োজন।

[(আমরা সরকারের স্বাধীন ও সাহসী ভূমিকা আশা করি (স.স.)।]

বিদেশ

সহস্র ফুট উঁচু মেগা সুনামিতে ধ্বংস হ'তে পারে সমগ্র যুক্তরাষ্ট্র

কল্পনা করুন, প্রায় এক হাযার ফুট উঁচু একটি পানিরাশির প্রাচীর আপনার দেশের উপকূলরেখার দিকে ছুটে আসছে একটি অপ্রতিরোধ্য গতিতে, দৌড়ানোর সময় নেই, প্রস্তুতি নেয়ার সময় নেই। ধারণাটি বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীর মতো শোনাতে পারে, কিন্তু বাস্তবিকই, ভূতাত্ত্বিক এবং দুর্যোগ বিশেষজ্ঞরা এর সম্ভাব্যতা সম্পর্কে সতর্কতা জারী করেছেন।

ভার্জিনিয়া টেকের একদল ভূ-বিজ্ঞানীর একটি গবেষণায় যুক্তরাষ্ট্রের 'ক্যাসকাডিয়া সাবডাকশন জোনে'-এ একটি বড় ভূমিকম্পের ফলে সৃষ্ট মেগা-সুনামির সম্ভাবনা তুলে ধরা হয়েছে। উত্তর ক্যালিফোর্নিয়া থেকে ব্রিটিশ কলাম্বিয়া পর্যন্ত প্রায় ৭শ' মাইল বিস্তৃত এই ঝুঁকিপূর্ণ স্থানটি যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে সক্রিয় ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চলগুলির মধ্যে একটি।

গবেষকরা সতর্ক করে দিয়েছেন, আগামী ৫০ বছরের মধ্যে এই অঞ্চলে ৮.০ মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হানার সম্ভাবনা রয়েছে। এর ফলে দেশটির সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলি হবে সম্ভবত দক্ষিণ ওয়াশিংটন, উত্তর ওরেগন এবং উত্তর ক্যালিফোর্নিয়া। এমনকি আলাস্কা এবং হাওয়াইয়ের মতো দূরবর্তী অঞ্চলগুলিও এই বিশাল দুর্যোগের সম্ভাব্য প্রভাব থেকে মুক্তি পাবে না।

মেগা-সুনামি শত শত এমনকি সহস্র ফুটেরও বেশী উঁচু ঢেউ হিসাবে আঘাত হানতে পারে এবং স্থলভাগের অভ্যন্তরে বহু মাইল ছড়িয়ে যেতে পারে। ২০০৪ সালের ভারত মহাসাগরের সুনামি ছিল ইতিহাসের সবচেয়ে মারাত্মক প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলির অন্যতম। যেখানে ১৪টি দেশে ২ লাখ ৩০ হাযারেরও অধিক মানুষ নিহত হয়েছিল।

এর আগে, ১৯৫৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রের লিটুয়া উপসাগরে শক্তিশালী ভূমিকম্পের পর ভূমিধসের ফলে আলাস্কায় ঘটে যাওয়া মেগা-সুনামির ঢেউ নথিবদ্ধ করা হয়েছিল ১ হাযার ৭শ' ১৯ ফুট উঁচু।

[(প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয় আল্লাহ্‌র হুকুমে। আল্লাহ্‌র অবাধ্য জাতিকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য মাঝে-মধ্যে তিনি এরূপ সুনামি-জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি পাঠিয়ে থাকেন। যেমন তিনি ২০২০-২০২২ সালে করোনা মহামারি পাঠিয়েছিলেন। সেখানেও সর্বাধিক মৃত্যুর তালিকার ঊর্ধ্বে ছিল আমেরিকা সহ উন্নত বিশ্ব। কিন্তু তাদের শিক্ষা হয়নি। তারা পুনরায় তাদের অবৈধ সন্তান ইস্রাঈলকে দিয়ে ফিলিস্তীন ও ইরান সহ মুসলিম বিশ্বের উপর বর্বর হামলা ও আগ্রাসন চালাচ্ছে। এ সময় এরূপ প্রাকৃতিক গযব আসা স্বাভাবিক। ঐসব দেশের বিজ্ঞ নেতাদের বিশ্বব্যাপী তাদের বর্বরতা ও আগ্রাসন থামানোর আশা করছি (স.স.)।]

মুসলিম জাহান

ক্যাপ্টেন ইব্রাহীম ত্রাওরে : আফ্রিকান নবজাগরণের অগ্রসেনানী

পশ্চিম আফ্রিকার অন্যতম দরিদ্র দেশ বুরকিনা ফাসো। জনসংখ্যার প্রায় ৯০ শতাংশই পশুপালনের মতো প্রথাগত জীবিকায় নির্ভরশীল। দারিদ্র্যের হার ৬৪.৫ শতাংশ। এই হতাশার মাঝেই ২০২২ সালে মাত্র ৩৪ বছর বয়সে এক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতায় এসে দেশটিকে নতুন স্বপ্ন দেখাতে শুরু করেন ক্যাপ্টেন ইব্রাহীম ত্রাওরে, যিনি বিশ্বের সর্বকনিষ্ঠ রাষ্ট্রপ্রধান। গতানুগতিক প্রবীণ নেতৃত্বে পরিচালিত আফ্রিকায় তিনি এক তরুণ ক্যারিশম্যাটিক ব্যতিক্রম। পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদ ও আধুনিক উপনিবেশবাদের শৃঙ্খল ছিন্ন করে আফ্রিকাকে নতুন দিশা দেওয়ার স্বপ্নে বিভোর এই তরতাযা যুবক আজ 'আফ্রিকার মুক্তির নতুন সূর্য' হিসাবে আবির্ভূত হচ্ছেন। পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদ ও নয়া-উপনিবেশবাদের কবল থেকে মুক্ত করতে তার ভাবনা চিন্তা এখন আফ্রিকার ঘরে ঘরে।

স্বাধীনতার আগে ও পরে বহু যুগের পশ্চিমা, বিশেষ করে ফরাসী শোষণ ও নির্ভরশীলতা আফ্রিকাকে পিছিয়ে রেখেছে, ত্রাওরের এই যুক্তি আফ্রিকায় এখন গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে।

ত্রাওরে ফ্রান্সসহ ঐতিহ্যগত পশ্চিমা শক্তির সামরিক উপস্থিতি বন্ধ করার এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ক্ষমতায় এসেই তিনি ফ্রান্সের সঙ্গে সামরিক চুক্তি আনুষ্ঠানিকভাবে বাতিল করেন। এক মাসের মধ্যে দেশ থেকে ফরাসী বিশেষ বাহিনী প্রত্যাহারে বাধ্য করা হয়। ত্রাওরের দেখাদেখি নাইজার, মালি ও আইভরি কোস্ট ফরাসি সেনা সরিয়ে দেওয়ার নির্দেশনা দেয়। একই সঙ্গে তিনি রাশিয়া ও অন্যান্য বিকল্প শক্তির সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলে বহুমুখী কূটনৈতিক কৌশল গ্রহণ করেছেন।

ত্রাওরে নিজেকে 'একজন সৈনিক ও জনগণের সেবক' হিসাবে পরিচয় দেন। ক্ষমতাকে তিনি কর্তৃত্ব হিসাবে নয়, দায়িত্ব হিসাবে দেখেন। তাঁর এই নম্রতা ও মানুষের পাশে থাকার মানসিকতা তাঁকে ব্যাপক জনপ্রিয়তা এনে দিয়েছে। তাঁর নেতৃত্বে দেশে শুরু হয়েছে রাষ্ট্রীয় সংস্কার, দুর্নীতিবিরোধী অভিযান এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে জনগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ।

ইতিমধ্যে ত্রাওরে সরকারের ব্যয় সংকোচনে মন্ত্রী-আমলাদের বেতনবৃদ্ধি বন্ধ করেছেন। একই সঙ্গে জাতীয় সম্পদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় সোনার দু'টি খনি জাতীয়করণ করেছেন এবং ইউরোপে অপরিশোধিত সোনা রফতানী সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দেন। ফলে ২০২৩ সালে বুরকিনা ফাসো ৫৭ টন সোনা উৎপাদন করে আফ্রিকার পঞ্চম বৃহত্তম সোনা উৎপাদনকারী দেশে পরিণত হয়, যা বৈশ্বিক উৎপাদনের প্রায় ২ শতাংশ।

দেশীয় প্রক্রিয়াকরণে জোর দিয়ে তিনি প্রথমবারের মতো সোনার শোধনাগার নির্মাণ করেন, যার বার্ষিক ক্ষমতা ১৫০ টন। ত্রাওরে বলেন, 'আমরা আর বিদেশে আমাদের সোনা পরিশোধন করব না। এখন আমরা জানতে পারব যে আমাদের খনি থেকে বেরিয়ে আসা সোনার আসল মূল্য কী। এর আগে দেশের সোনা যেত দক্ষিণ আফ্রিকা, সুইজারল্যাণ্ড বা চীনের শোধনাগারগুলিতে। কত সোনা যে লোপাট হ'ত তার ইয়ত্তা নেই।

ত্রাওরে সম্ভবত একমাত্র বিশ্বনেতা যিনি আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল ও বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তা গ্রহণে স্পষ্টভাবে 'না' বলেছেন। তাঁর মতে, দেশকে উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিতে পশ্চিমাদের শর্তসাপেক্ষ ঋণ নয়, প্রয়োজন প্রাকৃতিক সম্পদের সঠিক ব্যবস্থাপনা। বুরকিনা ফাসোতে সোনার পাশাপাশি রয়েছে দস্তা, তামা, ম্যাঙ্গানিজ, ফসফেট, চুনাপাথর এবং সম্ভাবনাময় হীরা, বক্সাইট, নিকেল ও ভ্যানাডিয়ামের মওজুদ, যা দীর্ঘদিন অব্যবহৃত ছিল।

বুরকিনা ফাসো দীর্ঘদিন ধরে পশ্চিমা মদদপুষ্ট সশস্ত্র জঙ্গী হামলার শিকার। এই অঞ্চলে ফ্রান্স ও তার পশ্চিমা মিত্রদের দীর্ঘমেয়াদী কৌশল ছিল স্থানীয় সরকারগুলোর ওপর প্রভাব বিস্তার করে জঙ্গীবাদ মোকাবিলায় সহায়তা প্রদান। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেছে, এই সহায়তার মধ্য দিয়ে আফ্রিকান দেশগুলোর ওপর মূলত তাদের আধিপত্য কায়েম রাখা হয়েছে। স্থানীয় জনমনে সেই পুরোনো ঔপনিবেশিক অভিজ্ঞতার পুনর্জাগরণ ঘটিয়েছে।

ত্রাওরে বিদেশী সেনার ওপর নির্ভরতা কমিয়ে জনগণকে সম্পৃক্ত করে 'ভলান্টিয়ারস ফর দ্য ডিফেন্স অব ফাদারল্যাণ্ড' নামে স্থানীয় প্রতিরক্ষা বাহিনী গঠন করেন। এই বাহিনী জনগণের আত্মবিশ্বাস ও জাতীয়তাবোধ বাড়িয়েছে।

ত্রাওরের নেতৃত্বে বুরকিনা ফাসো মালি ও নাইজারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ কূটনৈতিক ও প্রতিরক্ষা জোট গড়ে তোলে। তাদের 'স্বাধীন সাহেল' উদ্যোগ পশ্চিমা প্রভাবমুক্ত, সম্পদনির্ভর, স্বাধীন সাহেল অঞ্চল গঠনের নতুন স্বপ্ন দেখায়, যা আফ্রিকার উপনিবেশোত্তর নতুন রাজনৈতিক দর্শনের প্রতিফলন।

ত্রাওরে নিজেকে শুধু বুরকিনা ফাসোর নেতা মনে করেন না তিনি আফ্রিকার একজন সৈনিক। তাঁর বক্তব্যে বারবার উঠে আসে আফ্রিকান ঐক্য, বহুজাতিক করপোরেশনগুলোর শোষণ এবং প্রকৃত স্বাধীনতার জন্য সংঘবদ্ধ হওয়ার বার্তা। তাঁর নেতৃত্বে বুরকিনা ফাসো আফ্রিকান ইউনিয়নে নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

ক্যাপ্টেন ইব্রাহীম শুধু একজন রাষ্ট্রনায়ক নন, বরং তিনি এক নতুন রাজনৈতিক দিগন্তের প্রতীক। তাঁর নেতৃত্বে বুরকিনা ফাসো যেমন আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা ও অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার পথে এগোচ্ছে, তেমনি সমগ্র আফ্রিকায় তিনি হয়ে উঠেছেন স্বাধীনতা ও পরিবর্তনের বাতিঘর।

ক্যাপ্টেন ত্রাওরের এসব পদক্ষেপে নৈতিক পরাজয়ের মুখে ফ্রান্সসহ পশ্চিমা বিশ্ব। ফলে এর জবাবে এখন তারা নানা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করছে, মানবিক সহায়তা বন্ধ করছে এবং সামরিক হুমকিও দিচ্ছে। কিন্তু এতে কার্যত আফ্রিকার এই নতুন নেতৃত্ব আরও কঠোর হয়ে উঠছে। জনসাধারণের সমর্থনও বাড়ছে। আফ্রিকান জনমনে এখন প্রশ্ন উঠছে যে, ফ্রান্স আমাদের নিরাপত্তা দেওয়ার নামে খনিজ সম্পদ লুটে নিয়েছে, তাকে আর কত দিন সহ্য করব?

[(কথিত বৃহৎ শক্তিগুলি 'ভেটো পাওয়ার' নামে তাদের লুটের পাওয়ার সংরক্ষণ করে। সবার আগে এদের এই 'ভেটো পাওয়ার' বাতিল করার পক্ষে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হওয়া উচিৎ (স.স.)।]

গাযার পরিস্থিতি ভয়াবহ ও অমানবিক, শতভাগ অধিবাসী দুর্ভিক্ষের ঝুঁকিতে : জাতিসংঘ

গাযায় ইস্রাঈলের সামরিক অভিযানে সেখানকার পরিস্থিতি এখন ভয়াবহ ও অমানবিক কষ্টকর বলে জানিয়েছেন জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনার ভলকার টুর্ক। সম্প্রতি জেনেভায় অনুষ্ঠিত জাতিসংঘ মানবাধিকার পরিষদের ৫৯তম অধিবেশনে তিনি বলেন, ফিলিস্তীনীদের ওপর ইস্রাঈলের সামরিক অভিযান এবং যুদ্ধের পদ্ধতি গাযায় ভয়াবহ ও অযৌক্তিক মানবিক বিপর্যয় সৃষ্টি করছে। তিনি বলেন, ইস্রাঈল খাদ্যকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করছে এবং জীবনরক্ষাকারী ত্রাণ আটকে দিচ্ছে। ঈস্রাঈলী শীর্ষ কর্মকর্তাদের মানবতাবিরোধী ও ঘৃণা ছড়ানো বক্তব্য ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়ংকর অপরাধের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। অন্যদিকে জাতিসংঘের মানবিক বিষয়ক সমন্বয় অফিস (ওসিএইচএ)-এর মুখপাত্র জেন্স লারকে বলেছেন, গাযা পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষুধার্ত স্থান। এটিই একমাত্র সংজ্ঞায়িত একটি ভূখণ্ড, যেখানে ১০০ শতাংশ জনসংখ্যা দুর্ভিক্ষের ঝুঁকিতে রয়েছে।

উল্লেখ্য, গাযা উপত্যকায় ইস্রাঈলী বাহিনীর হামলায় এ পর্যন্ত নিহতের সংখ্যা প্রায় ৫৬ হাযার ১৫২ জনে পৌঁছেছে।

[(সবকিছু জানা সত্ত্বেও বিশ্ব নীরব কেন? অর্থ ও অস্ত্র শক্তিতে বলিয়ান পাশ্চাত্য বিশ্ব বিশেষ করে জি-৭ তাদের গত ১৬ই জুনের বৈঠকে ইস্রাঈলকে সমর্থন দিয়েছে। তাতে তাদের বর্বরতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। অতএব শুধু কথায় সমবেদনা নয়, কাজে এই বর্বরদের হাত টেনে ধরুন! (স.স.)।]

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

কৃত্রিম রক্ত তৈরি করছেন বিজ্ঞানীরা, ব্যবহার করা যাবে ২০৩০ সালে

সারা বিশ্বের অসংখ্য মানুষ রক্তসম্পর্কিত জটিলতায় ভুগছেন। অনেক এলাকায় প্রয়োজনীয় ও কার্যকর রক্তের অভাবে মানুষের মৃত্যু হচ্ছে। সেই সংকট কমাতে কৃত্রিম রক্ত তৈরির জন্য কাজ করছেন জাপানের নারা মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা। এরই মধ্যে কৃত্রিম রক্তের কার্যকারিতা পরীক্ষাগারে পরখ করেছেন তাঁরা।

বিজ্ঞানীদের তথ্যমতে, কৃত্রিম রক্তে প্রাকৃতিক রক্তের মতো কোন গ্রুপ নেই। সব রক্তের গ্রুপের জন্য ব্যবহারযোগ্য কৃত্রিম রক্তের মেয়াদ দুই বছর পর্যন্ত হ'তে পারে। আর তাই যরূরী পরিস্থিতিতে কৃত্রিম রক্ত ব্যবহারের সুযোগ অনেক সমস্যার সমাধান করবে। যা বিশ্বজুড়ে যরূরী চিকিৎসাব্যবস্থাকে বদলে দেবে।

বিজ্ঞানীরা মেয়াদোত্তীর্ণ রক্ত থেকে লোহিত রক্তকণিকার অণু হিমোগ্লোবিন বের করে কৃত্রিম রক্ত তৈরি করছেন। এরই মধ্যে ১৬ জন সুস্থ প্রাপ্তবয়স্ক স্বেচ্ছাসেবকের শরীরে ১০০ থেকে ৪০০ মিলিলিটার কৃত্রিম রক্ত প্রবেশ করিয়েছেন তাঁরা। এই পরীক্ষা সফল হ'লে ২০৩০ সালের মধ্যে কৃত্রিম রক্ত সবার ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করা হ'তে পারে।

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

ঈদুল আযহা পরবর্তী দাওয়াতী সফরে আমীরে জামা'আত

পবিত্র ঈদুল আযহার পরবর্তী দিনগুলিকে দাওয়াতী সফরে ব্যয় করার উদ্দেশ্যে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** গত ৯, ১১ ও ১৩ই জুন নওগাঁ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও গাইবান্ধা যেলার বিভিন্ন এলাকা সফর করেন। বিস্তারিত রিপোর্ট নিম্নরূপ :

৯ই জুন সোমবার বড় কালিকাপুর, আত্রাই, নওগাঁ : রাজশাহী-সদর যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা দুররুল হুদার নেতৃত্বে ১টি মাইক্রোবাস যোগে নেতা-কর্মীদের নিয়ে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** সকাল সাড়ে ৯-টায় নওদাপাড়া মারকায থেকে রওয়ানা হন। এসময় তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক-এর সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষাবোর্ড-এর সচিব শামসুল আলম, আল-'আওন-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির, রাজশাহী-সদর 'আন্দোলন'-এর কর্মী সালমান ফারেসী প্রমুখ।

দুপুর সাড়ে ১২-টায় বড় কালিকাপুর পশ্চিমপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে পৌঁছলে সেখানকার নেতা-কর্মীরা আমীরে জামা'আত ও তাঁর সফরসঙ্গীদের অভ্যর্থনা জানান। সেখানে সাথীদের নিয়ে তিনি যোহর ও আছর ছালাত জমা ও ক্বছর আদায় করেন। অতঃপর সেখানে অনুষ্ঠিত সুধী সমাবেশে বক্তব্য পেশ করেন। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুস সাত্তারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সুধী সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি আফযাল হোসাইন, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক শহীদুল আলমসহ আমীরে জামা'আতের সফরসঙ্গীগণ। সুধী সমাবেশ শেষে অত্র মসজিদেই তিনি সাথীদের নিয়ে দুপুরের আতিথেয়তা গ্রহণ করেন। এসময়ে সার্বিক সহযোগিতা করেন অত্র শাখার প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ মিলন শাহ। অতঃপর সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেলা ৩-টায় তিনি রাজশাহীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেন এবং বিকাল ৫-টায় নওদাপাড়া মারকাযে পৌঁছেন। *ফালিল্লাহিল হাম্দ!*

১১ই জুন বুধবার রহনপুর, গোমস্তাপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ : রাজশাহী-সদর যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা দুররুল হুদার নেতৃত্বে মাইক্রোবাস যোগে নেতা-কর্মীদের সাথে নিয়ে আমীরে জামা'আত সকাল সাড়ে ১০-টায় নওদাপাড়া মারকায থেকে রওয়ানা হন। এসময় তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক-এর সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, আল-'আওন-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব, 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক রবীউল ইসলাম, আল-'আওন-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির ও রাজশাহী-সদর 'আন্দোলন'-এর কর্মী সালমান ফারেসী প্রমুখ।

অতঃপর তানোর হয়ে দুপুর সাড়ে ১২-টায় নাচোল শিমুলতলায় পৌঁছলে যেলার সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার হোসাইনের নেতৃত্বে চাঁপাই উত্তর ও দক্ষিণের কর্মীরা আমীরে জামা'আত ও তাঁর সফরসঙ্গীদের অভ্যর্থনা জানান। এ সময়ে তারা শ্লোগানসহ মোটর সাইকেলের বহর নিয়ে রহনপুরের দিকে এগিয়ে যান এবং দুপুর দেড়টায় আয়েশা খাতুন জালিবাগান হাফেযিয়া মাদ্রাসায় পৌঁছেন। সেখানে সাথীদের নিয়ে তিনি যোহর ও আছর ছালাত জমা ও ক্বছর আদায় করেন এবং অত্র মাদ্রাসায় দুপুরের আতিথেয়তা গ্রহণ করেন। অতঃপর বাদ আছর সেখানে অনুষ্ঠিত সুধী সমাবেশে বক্তব্য পেশ করেন। উক্ত সমাবেশে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'যুবসংঘে'র সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি আরীফুল ইসলাম ও আমীরে জামা'আতের সফরসঙ্গীগণ। সুধী সমাবেশ শেষে আমীরে জামা'আত নিকটবর্তী রহনপুর ডাকবাংলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে মাগরিব ও এশার ছালাত জমা ও ক্বছর আদায় করেন এবং মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য পেশ করেন। সেখান থেকে ফেরার পথে তিনি চাঁপাই নবাবগঞ্জ শহরস্থ রেহাইরচর আদর্শপাড়ায় অবস্থিত আহলেহাদীছ যুবসংঘ পরিচালিত দারুস সুন্নাহ সালাফিইয়াহ মাদ্রাসা পরিদর্শন করেন। অতঃপর দিনব্যাপী দাওয়াতী সফর শেষে রাত ১১-টায় নওদাপাড়া মারকাযে ফিরে আসেন। *ফালিল্লাহিল হাম্দ!*

১৩ই জুন শুক্রবার গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা : ১৩ই জুন শুক্রবার আমীরে জামা'আত সকাল সাড়ে ৮-টায় নওদাপাড়া মারকায থেকে রওয়ানা হন। এসময় তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, রাজশাহী-সদর যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা দুররুল হুদা, 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আবুল কালাম, আল-'আওনের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির, রাজশাহী-সদর 'আন্দোলন'-এর কর্মী সালমান ফারেসী প্রমুখ।

বেলা ১১-টায় তিনি যেলার গোবিন্দগঞ্জ টিএণ্ডটি সংলগ্ন তাওহীদ ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠিত আহলেহাদীছ জামে মসজিদে পৌঁছেন এবং ১১ই জুন বুধবার সকাল ১০-টায় মৃত্যুবরণকারী 'আন্দোলন'-এর ২০১৭-২০১৯ সেশনের সাবেক কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা জনাব নূরুল ইসলাম প্রধানের পরিবারের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তিনি তাদের সার্বিক খোঁজ-খবর নেন এবং তাদেরকে সান্ত্বনা দেন। অতঃপর পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী মুহতারাম আমীরে জামা'আত টিএণ্ডটি সংলগ্ন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন। বাদ জুম'আ তিনি জনাব নূরুল ইসলাম প্রধানের গ্রামের বাড়ী দক্ষিণ ফুলবাড়ী গমন করেন। সেখানে পৌঁছে নব নির্মিত দক্ষিণ ফুলবাড়ী কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে অপেক্ষমাণ মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে তিনি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য পেশ করেন। সেখানে তিনি 'আন্দোলন'-এর সাবেক সাহিত্য সম্পাদক মৃত মাওলানা শিহাবুদ্দীন সুন্নীর স্মৃতিচারণ করেন ও মুছল্লীদের নিকট থেকে আনুগত্যের বায়'আত গ্রহণ করেন। অতঃপর মসজিদের পার্শ্ববর্তী পারিবারিক গোরস্থানে জনাব নূরুল ইসলাম প্রধানের কবর যিয়ারত করেন। অতঃপর তার ভাতিজা জনাব শহীদুল ইসলামের বাড়ীতে আতিথেয়তা গ্রহণ করেন। অতঃপর বিকাল সোয়া ৩-টায় তিনি সফরসঙ্গীদের নিয়ে রাজশাহীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন এবং সন্ধ্যা সোয়া ৬-টায় নওদাপাড়া মারকাযে ফিরে আসেন। *ফালিল্লাহিল হাম্দ!*

ভাইগদিয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদ উদ্বোধন

২৩শে মে শুক্রবার, সবুজবাগ, ঢাকা : অদ্য জুম'আর খুৎবার মাধ্যমে ২০০ বছর পূর্বে স্থাপিত ঢাকার সবুজবাগ থানাধীন ঐতিহ্যবাহী ভাইগদিয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদের নতুন ভবন উদ্বোধন করেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব।** খুৎবায় তিনি মসজিদ নির্মাণের চেয়ে মসজিদ আবাদের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। এই সাথে অত্র মসজিদটি যেন অত্রাঞ্চলে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' তথা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের প্রচার ও প্রসারের মারকায হিসাবে গড়ে ওঠে সেই প্রার্থনা করেন। তিনি মসজিদ নির্মাণে সহযোগিতাকারী

সকল দ্বীনী ভাই-বোনদের জন্য দো'আ করেন ও মসজিদের বর্ধিত অংশে মহিলাদের জন্য মসজিদ সম্প্রসারণের পরামর্শ দেন। অতঃপর বাদ জুম'আ সেখানে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আলোচনা সভায় সংক্ষিপ্ত বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন ও ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা তাসলীম সরকার। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কুমিল্লা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ছফিউল্লাহ, ঢাকা-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলার সাধারণ সম্পাদক আব্দুল ওয়াদূদ, আল-'আওনের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির প্রমুখ। উল্লেখ্য যে, উক্ত মসজিদ প্রথম নির্মিত হয়েছিল ১৮১৯ সালে।

আলোচনা সভা ও কবর যিয়ারত

২৩শে মে শুক্রবার, ঢাকা : অদ্য বাদ আছর ঢাকার বেরাইদ পূর্বপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব।** অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, বেরাইদ ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান মাহফূযুর রহমান, আল-'আওনের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির। আলোচনা সভা শেষে আমীরে জামা'আত ঢাকা-দক্ষিণ যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ও অত্র মসজিদের মুতাওয়াল্লী জনাব মোশাররফ হোসাইনের বাসায় গমন করেন এবং তার পরিবারের খোঁজ-খবর নেন ও তাদেরকে সান্তনা দেন। অতঃপর তিনি তার কবর যিয়ারত করেন। উল্লেখ্য, গত ৭ই মে বুধবার বিকাল সাড়ে ৩-টায় ব্রেইন স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে ঢাকা এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

অতঃপর তিনি সফরসঙ্গীদের নিয়ে বাদ মাগরিব আফতাবনগর প্রজেক্ট সংলগ্ন আঙ্গারজোড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে অনুষ্ঠিতব্য আলোচনা সভায় যোগদানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। পথিমধ্যে তিনি আস-সুন্নাহ ফাউণ্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত 'আস-সুন্নাহ স্কীল ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট' পরিদর্শন করেন। যেখানে বেকারত্ব দূরীকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন বেকার বা অর্থনৈতিকভাবে অসচ্ছল ব্যক্তিদের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে গড়ে তোলা হয়। অতঃপর বাদ মাগরিব আঙ্গারজোড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় তিনি বক্তব্য পেশ করেন। ঢাকা-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সমাজকল্যাণ সম্পাদক ইয়াসীন মিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন ও অন্যান্যগণ।

মাহে রামাযান উপলক্ষে দেশব্যাপী কর্মী প্রশিক্ষণ, আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

৬৬. ২০শে রামাযান ২১শে মার্চ শুক্রবার পাবনা : অদ্য বাদ আছর যেলার সদর থানাধীন খয়েরসুতী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ সোহরাব আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব।

৬৭. ২০শে রামাযান ২১শে মার্চ রবিবার দৌলতপুর, কুষ্টিয়া-পশ্চিম : অদ্য বেলা ১১-টায় যেলার দৌলতপুর থানাধীন কিশোরীনগর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মানছূরুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, যুববিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার ও কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য মুহাম্মাদ তরীকুয্যামান।

৬৮. ২০শে রামাযান ২১শে মার্চ শুক্রবার ফেনী : অদ্য বাদ জুম'আ যেলা শহরের জমিদার ভবনস্থ দারুলহাদীছ সালাফিইয়াহ মাদ্রাসা ও মসজিদ কমপ্লেক্সে এক প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি সৈয়দ মহিউদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম ও 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুর রঊফ।

৬৯. ২০শে রামাযান ২১শে মার্চ শুক্রবার পটুয়াখালী : অদ্য বাদ জুম'আ যেলা শহরের আস-সুন্নাহ মাদ্রাসা কমপ্লেক্স মসজিদে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার মুনীরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন ও 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ রাক্বীবুল ইসলাম।

৭০. ২১শে রামাযান ২২শে মার্চ শনিবার বাগাতিপাড়া, নাটোর : অদ্য বাদ আছর যেলার বাগাতিপাড়া থানাধীন বাঁশবাড়িয়া কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মাদ্রাসার সভাপতি জনাব আবুল কালামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম।

৭১. ২১শে রামাযান ২২শে মার্চ শনিবার দক্ষিণ-বাপ্তা, ভোলা : অদ্য বাদ যোহর যেলার সদর থানাধীন দক্ষিণ-বাপ্তা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি কামরুল হাসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন, কেন্দ্রীয় দাঈ রাক্বীবুল ইসলাম ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক আরাফাত যামান।

৭২. ২১শে রামাযান ২২শে মার্চ শনিবার রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ : অদ্য বাদ আছর যেলার রূপগঞ্জ থানাধীন কাদীরারটেক আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। মসজিদ কমিটির সভাপতি শামসুদ্দীন ভূঁইয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব ও 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ড. ইহসান ইলাহী যহীর।

৭৩. ২২শে রামাযান ২৩শে মার্চ রবিবার সখিপুর, শরীয়তপুর : অদ্য বাদ আছর যেলার সখিপুর থানাধীন সখিপুর সরকারবাড়ী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আব্দুল ক্বাদেরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান

হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক আরাফাত যামান ও 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ রাক্বীবুল ইসলাম।

৭৪. ২৮শে রামাযান ২৯শে মার্চ শনিবার রহনপুর, গোমস্তাপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ : অদ্য বাদ যোহর যেলার গোমস্তাপুর উপযেলাধীন রহনপুর বাগদুয়ারপাড়া ২নং মেডিকেল গেইট আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল্লাহ্র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রকাশনা সম্পাদক অধ্যাপক আব্দুল লতীফ ও 'সোনামণি'র পরিচালক মুহাম্মাদ রবীউল ইসলাম।

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

যুব সমাবেশ

১৪ই জুন শনিবার, তানোর, রাজশাহী : অদ্য সকাল ১১-টায় যেলার তানোর উপযেলা পরিষদ অডিটরিয়ামে 'যুবসংঘ' রাজশাহী-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক যুব সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ আবুল কাশেমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ দুররুল হুদা, 'আন্দোলন' সঊদী আরব শাখার সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল হাই মাদানী, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুন নূর, 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ রবীউল ইসলাম প্রমুখ।

১৫ই জুন রবিবার, বাগডোব, মহাদেবপুর, নওগাঁ : অদ্য সকাল ৯-টায় যেলার মহাদেবপুর উপযেলাধীন বাগডোব বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'যুবসংঘে'র উদ্যোগে এক যুব সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘে'র সভপতি আব্দুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড'-এর চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম ও 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মুহাম্মাদ আবুল কালাম।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড

আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ

২ ও ৩ মে শুক্র ও শনিবার শাসনগাছা, কুমিল্লা : গত ২রা মে অদ্য শুক্রবার বাদ আছর কুমিল্লা যেলা শহরের শাসনগাছা আল-মারকাযুল ইসলামী কমপ্লেক্সে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড'-এর উদ্যোগে বোর্ড অধিভুক্ত চট্টগ্রাম ও কুমিল্লা অঞ্চলের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে ২ দিনব্যাপী আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ শুরু হয়। শেষ হয় ৩রা মে শনিবার বাদ আছর। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ছফিউল্লাহ্র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষাবোর্ড'-এর চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব ও 'বোর্ডে'র পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ড. নূরুল ইসলাম।

অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা মুছলেহুদ্দীন, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা জামীলুর রহমান, গাযীপুর-উত্তর সাংগঠনিক যেলার সভাপতি মাওলানা খায়রুল ইসলাম, 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক আহমাদুল্লাহ, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকার মাস্টার ট্রেইনার মুহাম্মাদ ইউসুফ আহাম, কুমিল্লা সরকারী টিসার্স ট্রেনিং কলেজের সহকারী অধ্যাপক ড. মুহাম্মাদ আবুল কাসেম, সাতকানিয়া সরকারী কলেজ, চট্টগ্রামের সহকারী অধ্যাপক সাইফুল ইসলাম, কুমিল্লা মহিলা মহাবিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের প্রভাষক ইয়াসীন মিয়া, কোম্পানীগঞ্জ বদীউল আলম ডিগ্রী কলেজের ইংরেজী বিভাগীয় প্রধান নূরুল ইসলাম শামীম, কুমিল্লা যেলা স্কুলের সিনিয়র শিক্ষক ইব্রাহীম খলীল প্রমুখ। প্রশিক্ষণে মোট ১২৪ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘে'র সাবেক সাধারণ সম্পাদক অলিউল্লাহ।

মারকায সংবাদ

গ্রন্থপাঠ প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ

২রা জুন সোমবার নওদাপাড়া, রাজশাহী : অদ্য সকাল ৮-টায় আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর শিক্ষক মিলনায়তনে বালক শাখার অভিভাবিকাদের গ্রন্থপাঠ প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মারকাযের ভাইস প্রিন্সিপাল ড. নূরুল ইসলাম, মুশরিফ ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম, শিক্ষক আব্দুর রঊফ, মাহদী হাসান রেযা প্রমুখ। উল্লেখ্য যে, গত ৮ই মে বৃহস্পতিবার সকাল ১০-টায় ইউসুফ বিন যাবনুল্লাহ আল-'আতীর লিখিত, মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক অনূদিত ও হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশিত 'আদর্শ সন্তান গঠনে মহীয়সী মা ইতিহাসের কালজয়ী কাহিনী' বইয়ের উপর এম.সি.কিউ পদ্ধতিতে উক্ত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় ১ম ও ২য় স্থান এবং যৌথভাবে ৩য় স্থান অধিকার করেন ২জন। বিজয়ী ১ম জনকে ১০০০ টাকা, ২য় জনকে ৮০০ টাকা, ৩য় জনকে ৫০০ টাকা সমমূল্যের হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশিত বই পুরস্কার প্রদান করা হয়। এছাড়াও ৫ জনকে বিশেষ পুরস্কার প্রদান করা হয়।

মৃত্যু সংবাদ

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা ও গাইবান্ধা যেলার গোবিন্দগঞ্জ টিএণ্ডটি সংলগ্ন আহলেহাদীছ জামে মসজিদের সাবেক সিনিয়র সভাপতি নূরুল ইসলাম প্রধান (৮৬) বার্ধক্যজনিত কারণে বগুড়া হেলথ সিটি ক্লিনিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত ১১ই জুন বুধবার সকাল ১০-টায় মৃত্যুবরণ করেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'উন*। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী ও ১ পুত্রসহ বহু সাংগঠনিক সাথী ও আত্মীয়-স্বজন রেখে যান। এদিন বিকাল ৩-টায় গোবিন্দগঞ্জ টিএণ্ডটি সংলগ্ন আহলেহাদীছ জামে মসজিদের সামনে তার প্রথম জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় ইমামতি করেন অত্র মসজিদের খতীব মাহবূবুর রহমান। অতঃপর বিকাল ৫-টায় তার নিজ গ্রাম দক্ষিণ ফুলবাড়ী আহলেহাদীছ জামে মসজিদের সামনে দ্বিতীয় জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় ইমামতি করেন আমীরে জামা'আতের পক্ষে তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক এবং 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড'-এর চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। জানাযা শেষে তাকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়। জানাযায় আল-'আওনের কেন্দ্রীয় সহ-প্রশিক্ষণ সম্পাদক দেলাওয়ার হোসাইন, গাইবান্ধা-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. 'আওনুল মা'বূদ, সাংগঠনিক সম্পাদক আবু হানীফ মোল্লা, 'যুবসংঘে'র সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মামূন ও আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরামের যেলা সভাপতি শওকত হাসানসহ যেলা 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ' ও 'সোনামণি'র দায়িত্বশীলবৃন্দ এবং বিপুল সংখ্যক গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন।

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/৩৬১) : আমার স্ত্রীর ৪ ভরি ৫ আনা স্বর্ণ ও দেড় লক্ষ টাকা এবং আমার অবিবাহিত মেয়ের ১ ভরি ১ আনা স্বর্ণ আছে। অন্যদিকে আমি ঋণগ্রস্ত এবং স্ত্রী ও মেয়ের কোন আয় নেই। এক্ষণে তাদের সম্পদ যাকাতযোগ্য কি? যাকাত দিতে হ'লে কার উপর দেয়া ফরয?

-কামরুল হাসান খান, কান্দিরপাড়, কুমিল্লা।

উত্তর : যিনি সম্পদের মালিক, তার উপরই যাকাত ফরয হয়। এক্ষণে স্ত্রীর সম্পদ সাড়ে ৭ ভরি বা সমপরিমাণ নগদ অর্থ হ'লে তার সম্পদে তার উপরই যাকাত ফরয হবে। অনুরূপই মেয়ে পৃথকভাবে সাড়ে সাত ভরি স্বর্ণের মালিক হ'লে তার সম্পদেও যাকাত ফরয হবে। অর্থাৎ প্রত্যেকে নিজ নিজ সম্পদের যাকাত দিবে যদি তা নিছাব পরিমাণ হয় এবং এক বছর নিজ মালিকানায় থাকে *(উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ৬/৬৬; মাজমূ' ফাতাওয়া ১৮/৯৯)*। উভয়ের সম্পদ একত্রে হিসাব হবে না। অতএব তাদের কারো সম্পদ এখনও পৃথকভাবে যাকাতযোগ্য হয়নি। উল্লেখ্য যে, যাকাতযোগ্য সম্পদের মালিক স্ত্রী বা মেয়ের নিজস্ব আয় না থাকলে স্বামী সক্ষম হলে তাদের পক্ষ থেকে যাকাত আদায় করতে পারে।

প্রশ্ন (২/৩৬২) : ছালাতে যদি দুনিয়াবী চিন্তা চলে আসে, তাহ'লে ছালাত সঠিক হবে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর : ছালাতে খুশূ'-খুযূ তথা একাগ্রতা থাকা যরূরী। কারো ছালাতে খুশূ'-খুযূ তথা একাগ্রতার ঘাটতি থাকলে ছালাত হয়ে গেলেও ছওয়াব কমে যাবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, এমন লোকও আছে যারা ছালাত শেষ করে ফিরে যায়, অথচ তার ছালাতের পূর্ণ ছওয়াব তার জন্য লেখা হয় না (অর্থাৎ ছালাতের রুকন ও শর্তগুলো পূরণ না করায় এবং খুশূ'-খুযূ না থাকায় পূর্ণ ছওয়াব পায় না)। বরং কেউ পায় এক দশমাংশ, কেউ নবমাংশ, কেউ অষ্টমাংশ, কেউ সপ্তমাংশ, কেউ ষষ্ঠাংশ, কেউ পঞ্চমাংশ, কেউ চতুর্থাংশ, কেউ তৃতীয়াংশ, আবার কেউ পায় অর্ধেক *(আবুদাউদ হা/৭৯৬; ছহীহুত তারগীব হা/৫৩৭)*। উল্লেখ্য যে, লোকেরা ছালাতে দাঁড়ালে শয়তান মনোযোগ নষ্ট করে ছওয়াব থেকে বঞ্চিত করার চেষ্টা করে। ওছমান ইবনু আবুল 'আছ (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! শয়তান আমার, আমার ছালাত ও ক্বিরাআতের মধ্যে বাধা হয়ে দাঁড়ায় এবং সব কিছুতে গোলমাল বাধিয়ে দেয়। তখন রাসূলুল্লাহ বললেন, এটা এক (প্রকারের) শয়তান যার নাম খিনযাব। যে সময় তুমি তার উপস্থিতি বুঝতে পারবে তখন (আঊযুবিল্লাহ পড়ে) তার অনিষ্ট হ'তে আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় চেয়ে তোমার বাম পাশে তিনবার থুক মারবে। তিনি বলেন, তারপরে আমি তা করলাম। ফলে আল্লাহ আমার হ'তে তা দূর করে দিলেন *(মুসলিম হা/২২০৩; মিশকাত হা/৭৭)*।

প্রশ্ন (৩/৩৬৩) : বর্তমানে জেন্ডার ইকুইটির নামে নারী ও পুরুষের উত্তরাধিকারে সমান অধিকার দাবী করা হচ্ছে। অর্থাৎ পুরুষ যতটুকু সম্পদ পাবে, নারীকেও ততটুকু দিতে হবে। এ বিষয়ে ইসলামের বিধান কি?

-নবীউল আহসান, বুয়েট, ঢাকা।

উত্তর : এ দাবী অবান্তর। বরং ইসলাম নারীর ন্যায্য অধিকার প্রদানের ব্যাপারে সুস্পষ্ট নির্দেশনা দিয়েছে। উপরন্তু এই নীতি লংঘনের ব্যাপারে কঠোর শাস্তির হুঁশিয়ারী এসেছে পবিত্র কুরআনে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষদের অংশ রয়েছে এবং পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের সম্পত্তিতে নারীদের অংশ রয়েছে কম হৌক বা বেশী হৌক। এ অংশ সুনির্ধারিত' *(নিসা ৪/৭)*। সম্পত্তিতে নারীদের প্রাপ্য অংশ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ তোমাদের সন্তানদের (মধ্যে মীরাছ বণ্টনের) ব্যাপারে তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমান। যদি দুইয়ের অধিক কন্যা হয়, তাহ'লে তারা পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ পাবে। আর যদি কেবল একজনই কন্যা হয়, তবে তার জন্য অর্ধেক...' *(নিসা ৪/১১-১২)*। আল্লাহ তা'আলা নারী-পুরুষের জন্য বণ্টননামা করে দেওয়ার পর বলেন, 'এগুলি হ'ল আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমা...' *(নিসা ৪/১৩-১৪)*।

উল্লেখ্য যে, ইসলাম সমতা নয় বরং ন্যায্যতার ভিত্তিতে সম্পত্তি বণ্টন করেছে। যেহেতু ইসলাম নারীকে আর্থিক দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়েছে এবং পুরুষকে এই দায়িত্ব পালনে নির্দেশনা দিয়েছে, সেজন্য সম্পদের বণ্টননীতিতে প্রয়োজনমাফিক (Need-based) কখনও কম-বেশী করা হয়েছে, আবার কখনও সমানও দেয়া হয়েছে। যেমন- সন্তানের সম্পত্তি বণ্টনের সময় জীবিত পিতা-মাতাকে সমানভাবে এক-ষষ্ঠাংশ প্রদান করা হয়েছে *(নিসা ৪/১১)*। এছাড়া যদি এমন ব্যক্তি মারা যায় যার না আছে সন্তান, না আছে পিতা-মাতা এবং তার এক ভাই বা এক বোন থাকে, তবে প্রত্যেককে ছয় ভাগের এক ভাগ দেয়া হয়েছে *(নিসা ৪/১২)*। এখানে ভাই ও বোন উভয়কেই সমান অংশ দেয়া হয়েছে। সুতরাং নারীরা সব সময় পুরুষের অর্ধেক মীরাছ পায়, এ ধারণা সঠিক নয়। বরং কিছু ক্ষেত্রে নারী যেমন কম পায় (যেমন ভাই-বোনের ক্ষেত্রে), তেমনি কিছু ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ সমান পান (যেমন সন্তানের ক্ষেত্রে)। আবার কিছু ক্ষেত্রে নারী পুরুষের চেয়ে বেশীও পায় (যেমন, মৃত ব্যক্তির একমাত্র মেয়ে থাকলে সে পায় অর্ধেক, কিন্তু তার এক ভাই একা থাকলে সে সাধারণতঃ সম্পদের অর্ধেক পরিমাণ পায় না)। তাছাড়া বিয়ের সময় নারীকে মোহরানা প্রদান করা বাধ্যতামূলক, কিন্তু পুরুষকে মোহরানা প্রদানের কোন বিধান নেই।

প্রশ্ন (৪/৩৬৪) : আমি আগে পুলিশে চাকরি করতাম, এখন অবসরপ্রাপ্ত। অবসরকালীন সময়ে সরকার থেকে যে ১০/১২ লাখ টাকা এককালীন পেয়েছি, সেই টাকা কি হালাল? এছাড়াও অবসরভাতা বা মাসিক যে টাকা পাচ্ছি, তা কি হালাল?

-রবীউল ইসলাম, ঢাকা।

উত্তর : সরকার কর্তৃক কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে প্রদত্ত বোনাস, ভাতা, অবসরভাতা, এককালীন ভাতা ইত্যাদি গ্রহণ করা বৈধ। কারণ এটা কর্মরত ব্যক্তিদের প্রতি সরকার বা প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত বৈধ সুবিধা *(উছায়মীন, আল-লিকাউশ শাহরী ৫৮/২২, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৮/১৭৫; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ২৩/৪৭৩; আব্দুল্লাহ ত্বাইয়ার, লিকাআতাশ-শায়খাইন, পৃ. ৬৬)*।

প্রশ্ন (৫/৩৬৫) : বিবাহের পূর্বে বাগদানের আংটি পরানোর বিধান কি?

-গোলাম রাব্বী, বরিশাল।

উত্তর : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ), ছাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈদের যুগে বাগদানের আংটি পরানো বা বিনিময় করার বিষয়ে কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। বরং এটা খৃষ্টানদের ধর্মীয় রীতি, যা তাদের মধ্যে চলমান রয়েছে *(উছায়মীন, আল-লিকাউশ শাহরী ১/৪৬; মাজমূ' ফাতাওয়া ১৮/১১২; ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ২/২২)*। আর মুসলমানদের জন্য অন্য ধর্মের রীতি অনুসরণ করা বৈধ নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি যে জাতির অনুকরণ করে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত' *(আবূদাউদ হা/৪০৩১; মিশকাত হা/৪৩৪৭, সনদ ছহীহ)*। তবে সাধারণভাবে মেয়ে দেখতে গিয়ে পসন্দ হ'লে বা না হ'লেও হাদিয়া স্বরূপ যেকোন জিনিস, বই বা নগদ অর্থ দেওয়া যায় *(ইবনু তায়মিয়াহ, আল-ফাতাওয়াল কুবরা ৫/৪৭২)*। উল্লেখ্য যে, বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত পাত্র-পাত্রীর মধ্যে অবাধ আলাপচারিতা বৈধ নয় *(ছালেহ আল-ফাউযান, আল-মুনতাকা ৩/১৬৩)*।

প্রশ্ন (৬/৩৬৬) : বর্তমানে সমাজে কিছু হিজড়া সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও সাহায্যের নামে টাকা চায়। অনেক সময় তারা অপমানজনক ভঙ্গিতে, উচ্চৈঃস্বরে বা অশোভন আচরণে টাকা চেয়ে থাকে। এ অবস্থায় তাদেরকে সহযোগিতা করা জায়েয হবে কি?

-ফায়ছাল আহমাদ, নাটোর।

উত্তর : যদি তারা অশালীন আচরণ করে অশ্লীলতা ছড়ায়, তাহ'লে তাদেরকে সহযোগিতা করা যাবে না। কারণ এতে পাপের কাজে সহায়তা করা হবে, যা নিষিদ্ধ *(মায়েদাহ ৫/২)*। তবে সাধারণ হিজড়া যারা অশ্লীলতা ছড়ায় না বা চাঁদাবাজি করে না তাদেরকে সাহায্য করা যাবে এবং নিয়ত অনুযায়ী নেকীও পাওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ। উল্লেখ্য যে, বর্তমান সমাজে অনেক হিজড়া দলবদ্ধ হয়ে নাচ-গান, ভয়-ভীতি প্রদর্শন বা অশালীন আচরণের মাধ্যমে জোরপূর্বক চাঁদা আদায় করে থাকে। এদের এই উপার্জন হারাম। একান্ত বাধ্যগত অবস্থা ব্যতীত এদেরকে স্বেচ্ছায় চাঁদা দেয়া যাবে না। আল্লাহ বলেন, তোমরা পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো না' *(মায়েদাহ ৫/২)*। প্রয়োজনে প্রশাসনের হস্তক্ষেপের মাধ্যমে এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। উল্লেখ্য যে, দেশের সরকার ও প্রশাসনের উচিত এদের বিষয়ে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা ও এদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা।

প্রশ্ন (৭/৩৬৭) : অধিকাংশ ক্ষেত্রে গোসল করার সময় প্রস্রাবের চাপ অনুভূত হয় এবং অনিচ্ছাকৃতভাবে গোসল অবস্থায় প্রস্রাব বের হয়ে যায়। এক্ষেত্রে কি গোনাহগার হব?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর : অনিচ্ছকৃতভাবে প্রস্রাব বেরিয়ে গেলে পুনরায় গোসল করে পবিত্রতা অর্জন করবে *(শাওকানী, নায়লুল আওতার ১/১১৪; উছায়মীন, লিকাউল বাবিল মাফতূহ ৩০/১৮৬)*। উল্লেখ্য, গোসল করার সময় অযাচিত প্রস্রাবের চাপ বা প্রস্রাব বের হয়ে যাওয়া এক ধরনের রোগ। এতে গোনাহের কোন কারণ নেই।

প্রশ্ন (৮/৩৬৮) : নারীরা পুরুষদের উপর তলায় অবস্থান করে ছালাত আদায় করলে নারী-পুরুষ উভয়ের ছালাত কবুল হয় না। একথার কোন সত্যতা আছে কি?

-আব্দুল আউয়াল, যশোর।

উত্তর : উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। কারণ আড়াল থাকলে ইমামের অনুসরণে মসজিদের যেকোন অংশে নারীরা ছালাত আদায় করতে পারে। অতএব নীচ তলায় ইমাম ও পুরুষ মুছল্লী এবং উপরের তলায় নারী মুছল্লীরা ছালাত আদায় করতে পারে *(বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১২/২১৩)*।

প্রশ্ন (৯/৩৬৯) : ছিয়াম অবস্থায় ভুল করে ঝগড়ায় জড়িয়ে পড়েছিলাম। পরে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ্র কাছে তওবা করেছি। এক্ষেত্রে কি আমার ছিয়াম ভঙ্গ হয়ে গেছে? কাফফারা বা কাযা করতে হবে কি?

-তুহিন, নাটোর।

উত্তর : ছিয়াম অবস্থায় ঝগড়ায় জড়িয়ে পড়া গুনাহের কাজ এবং ছিয়ামের ছওয়াব কমে যাওয়ার কারণ *(শাওকানী, নায়লুল আওতার ৪/২৪৬)*। তবে এতে ছিয়াম ভঙ্গ হবে না। কারণ এটি ছিয়াম ভঙ্গের কারণ নয় *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১০/৩৩২-৩৩৩)*।

প্রশ্ন (১০/৩৭০) : নিজের পরিচালিত মাদ্রাসায় যাকাতের অর্থ দান করা যাবে কি?

-মুজাহিদুর রহমান, নরসিংদী।

উত্তর : 'ফি সাবীলিল্লাহ' খাত বিবেচনায় নিজ পরিচালিত মাদ্রাসায়ও যাকাত দেয়া যেতে পারে। কারণ দ্বীনী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো দ্বীন প্রচারের লক্ষ্যে যাকাতের হকদার, বিশেষত যেসব মাদ্রাসায় সরকারীভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করা হয় না *(উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৮/৩৯২)*।

প্রশ্ন (১১/৩৭১) : জনৈক ব্যক্তি অনেক জমি-জায়গার মালিক। কিন্তু নগদ অর্থ অল্প থাকায় তিনি নিজেকে গরীব হিসাবে গণ্য করেন। এক্ষণে তাকে দরিদ্র হিসাবে যাকাতের অর্থ দেয়া যাবে কি?

-আমীনুল ইসলাম, হাজীগঞ্জ, চাঁদপুর।

উত্তর : এমন ব্যক্তি যাকাতের হকদার নয়। কারণ সূরা তওবায় আল্লাহ তা'আলা স্পষ্টভাবে যাকাতের হকদারদের বিষয়ে আলোচনা করেছেন *(তওবা ৯/৬০)*। যার স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি আছে সে ধনী হিসাবেই গণ্য হবে। আর ধনীর জন্য

যাকাত গ্রহণ করা হারাম *(আবুদাউদ হা/১৬২৬; ছহীহাহ হা/৪৯৯)*।

প্রশ্ন (১২/৩৭২) : আমার শাশুড়ি মারা গেলে শ্বশুর আরেকটি বিবাহ করেন। এক্ষণে নতুন শাশুড়িকে কি আমার থেকে পূর্ণ পর্দা করে চলতে হবে?

-ড. আব্দুল মোমেন, ঢাকা।

উত্তর : স্ত্রীর সৎ মা তথা শ্বশুরের দ্বিতীয় স্ত্রী মাহরাম নয়। সুতরাং প্রথম পক্ষের মেয়ের জামাই থেকে তাকে পূর্ণ পর্দা করে চলতে হবে *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১৭/৩৬৫-৩৬৬; বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ২১/১৫; ফাতাওয়া ইসলামিয়া ৩/১৩২)*।

প্রশ্ন (১৩/৩৭৩) : আমার মা তার সম্পত্তি তার ভাই তথা আমার মামাদের দিয়ে দিলে তিনি কি সন্তানদের বঞ্চিত করার অপরাধে অপরাধী হবেন?

-মুহাম্মাদ নাসীম মিয়াঁ, ভাঙ্গা, ফরিদপুর।

উত্তর : কাউকে এককভাবে সম্পত্তি লিখে দেয়া উচিৎ নয়, বিশেষ করে অন্য ওয়ারিছরা যদি দরিদ্র হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সন্তানদের স্বাবলম্বী করে রেখে যেতে উৎসাহিত করেছেন। তিনি বলেন, 'তুমি যদি তোমার উত্তরসূরীদের ধনী করে রেখে যাও, এটা উত্তম এ অপেক্ষা যে, তুমি তাদের দরিদ্র করে রেখে যাও, আর তারা মানুষের কাছে হাত পাতে' *(বুখারী হা/১২৯৫; মিশকাত হা/৩০৭১)*। এছাড়া কা'ব বিন মালেক (রাঃ) তওবা কবূল পরবর্তী সময়ে তার পুরো সম্পত্তি দান করে দিতে চাইলে রাসূল (ছাঃ) তাকে নিজের জন্য কিছু রেখে দান করতে বলেন *(বুখারী হা/২৭৫৭; মিশকাত হা/৩৪৩৪)*। আর যদি এর মাধ্যমে অন্য ওয়ারিছদের বঞ্চিত করার উদ্দেশ্য থাকে, তবে তা আল্লাহ্র হুকুম লংঘন করা হবে। কেননা আল্লাহ প্রত্যেক ওয়ারিছের জন্য অংশ নির্ধারন করে দিয়েছেন *(নিসা ৪/৭)*। উল্লেখ্য যে, সাধারণভাবে একজন ব্যক্তি তার জীবিত ও সুস্থ অবস্থায় যে কোন পরিমাণ সম্পত্তি দান করতে পারে। যেমন আবুবকর (রাঃ) তাবুকের যুদ্ধে যাবতীয় সম্পদ দান করে দিয়েছিলেন *(আবুদাউদ হা/১৬৭৮; মিশকাত হা/৬০২১, সনদ হাসান)*। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন এর মাধ্যমে ওয়ারিছদের বঞ্চিত করার উদ্দেশ্য না থাকে।

প্রশ্ন (১৪/৩৭৪) : হজ্জ জীবনে একবার ফরয। কিন্তু হজ্জ কবুল হয়েছে কি-না তা তো বুঝার কোন সুযোগ নেই। সেক্ষেত্রে সামর্থ্যবান ব্যক্তি প্রতিবছর হজ্জ করবেন কী?

-হাসীবুর রশীদ, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : একবার হজ্জ করলে হজ্জের ফরযিয়াত আদায় হয়ে যাবে। আর কবুলের বিষয়টি আল্লাহ্র হাতে। তাই আশা ও ভয় দু'টিই থাকতে হবে। তবে সামর্থ্যবানদের জন্য প্রতি পাঁচ বছর অন্তর একবার হজ্জ করা মুস্তাহাব। রাসূল (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, আমি আমার এক বান্দার শরীর সুস্থ রাখলাম এবং তার জীবিকা প্রশস্ত করে দিলাম, তবুও তার উপর পাঁচ বছর কেটে গেল, অথচ সে আমার কাছে (হজ্জ কিংবা ওমরার উদ্দেশ্যে) আগমন করল না তাহ'লে সে তো বঞ্চিত' *(ছহীহাহ হা/১৬৬২)*। সেজন্য সালাফগণ সামর্থ্য থাকলে প্রতি পাঁচ বছর পরপর হজ্জ সম্পাদন করাকে পসন্দ করতেন *(ছহীহুত তারগীব হা/১১৬৬)*।

প্রশ্ন (১৫/৩৭৫) : আমার শ্বশুর মিথ্যা বলে আমার স্ত্রীকে তার বাড়িতে নিয়ে গেছে এবং মেয়েকে সংসার করতে দিবে না জানিয়ে দিয়েছে। উক্ত বিয়েতে দেনমোহর ছিল ৫২ হাযার টাকার সমপরিমাণ স্বর্ণ গহনা, যার মধ্যে ২১ হাযার টাকার গহনা মেয়ের কাছে এবং ৩১ হাযার টাকার গহনা আমার কাছে আছে। এখন তারা ৫০ হাযার টাকা দাবী করছে, অথচ কাবিনে পরিশোধের শর্ত ছিল স্বর্ণের গহনা। এক্ষণে আমার করণীয় কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, রাজশাহী।

উত্তর : স্বামীর অসম্মতিতে স্ত্রী বা তার পরিবার সংসার বিচ্ছিন্ন করতে চাইলে মোহরানা ফেরত দিয়ে খোলা' তথা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। খোলা' তথা বিবাহ বিচ্ছেদ যা নারীর পক্ষ থেকে হয় স্বামী থেকে প্রাপ্ত মোহর বা মোহরের অংশবিশেষ ফিরিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে। সেজন্য এখানে রাজ'আতের কোন ব্যবস্থা নেই *(ইবনু কুদামাহ, মুগনী ৮/১৮১; শাওকানী, নায়লুল আওত্বার ৬/২৯৫; উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ১২/৪৬৭-৭০)*। এক্ষণে স্ত্রীর পরিবারের উচিৎ মোহরানা দাবী না করে বরং পারিবারিকভাবে সমাধান করে নেওয়া এবং উভয়ের পথ উন্মুক্ত করে দেওয়া।

প্রশ্ন (১৬/৩৭৬) : রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবীদের যুগে চেয়ার থাকা সত্ত্বেও তাঁরা কেউ চেয়ারে বসে ছালাত পড়েছেন কি? বরং অসুস্থদের জন্য মাটিতে বসে বা ইশারায় ছালাতের কথা বলা হয়েছে। সে হিসাবে বর্তমান যুগে চেয়ারে বসে ছালাত পড়া বিদ'আত হবে কি?

-মাহিন ভুইয়া, ঢাকা কলেজ।

উত্তর : রাসূল (ছাঃ) অসুস্থ ব্যক্তিদের বসে ছালাত আদায় করার নির্দেশনা দিয়েছেন। কিন্তু বসার উপকরণের কথা বলেননি। সেজন্য মুছল্লীরা মাটিতে কিংবা চেয়ারে বা অন্য কোন আসনে বসে ছালাত আদায় করতে পারেন। এক্ষণে রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে চেয়ার থাকা সত্ত্বেও তার ছালাত আদায় না করার কারণ হচ্ছে, প্রথমত তার প্রয়োজন হয়নি। দ্বিতীয়তঃ তৎকালীন সময়ে আরবে চেয়ারের ব্যবহার বহুল প্রচলিত ছিল না। যা ছিল তাও তেমন বহনযোগ্য ছিল না *(মুসলিম হা/৮৭৬)*। তবে কিছু ক্ষেত্রে তাৎকালীন সময়েও মসজিদে চেয়ার ব্যবহারের নমুনা পাওয়া যায়। আবু ওয়ায়েল বলেন, আমি কা'বার মধ্যে চেয়ারের ওপর শায়বা (চাবি রক্ষক)-এর সাথে বসে ছিলাম। তখন তিনি বললেন, এই স্থানে হযরত ওমর (রাঃ) বসেছিলেন এবং বলেছিলেন, আমার মন চাচ্ছে কা'বার মধ্যে যত স্বর্ণ বা রৌপ্য আছে, সবই আমি আল্লাহ্র রাস্তায় বণ্টন করে দিই, কিছুই রেখে না যাই। আমি বললাম, আপনার দুই সঙ্গী (আবুবকর ও রাসূল) তো তা করেননি। তখন ওমর (রাঃ) বললেন, তাঁরা হ'লেন দুইজন আদর্শবান ব্যক্তি আমি তাঁদেরই অনুসরণ করি *(বুখারী হা/১৫৯৪; মুসনাদুল ফারূক ১/৩২১)*। অতএব দাঁড়িয়ে ছালাত আদায়ে অক্ষম ব্যক্তিদের জন্য চেয়ারে বসে ছালাত আদায়ে কোন দোষ নেই *(আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়াহ ৬/২১; বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১২/২৪৫-৪৬; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৬/৩৬৬-৬৭)*।

প্রশ্ন (১৭/৩৭৭) : শরীরে ট্যাটু করা হারাম। কিন্তু শ্বেতী রোগ এর চিকিৎসা হিসাবে ট্যাটুর মত কালার করার মাধ্যমে ত্বকের পূর্বের রং ফিরিয়ে আনা জায়েয হবে কি?

*-*নীরব, রাজশাহী।*

**[আরবীতে সুন্দর ইসলামী নাম রাখুন (স.স.)]।*

উত্তর : যেকোন হালাল পদ্ধতিতে চিকিৎসা করা যায়। শরীরে ট্যাটু অংকনের উদ্দেশ্য ছাড়া এমনিতে ত্বকের কালার ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে অনুরূপ কোন ব্যবস্থা নেয়া যাবে। তবে তা যেন কোন ধর্মের সাদৃশ্য না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা রোগও নাযিল করেছেন, ওষুধও নাযিল করেছেন এবং প্রত্যেক রোগের জন্যই ওষুধ নির্ধারণ করেছেন। সুতরাং তোমরা চিকিৎসা গ্রহণ কর, কিন্তু হারাম জিনিস দিয়ে চিকিৎসা করো না *(আবুদাউদ হা/৩৮৭৪; মিশকাত হা/৪৫৩৮)*।

প্রশ্ন (১৮/৩৭৮) : আশূরা উপলক্ষে শী'আরা বিশেষ খাবার রান্না করে এবং বলে যে, এই খাবার আল্লাহ্র জন্য, কিন্তু এর ছওয়াব হুসাইন (রাঃ)-এর জন্য। এটা খাওয়া কি জায়েয হবে?

-রবীউল ইসলাম, ঢাকা।

উত্তর : আশূরা উপলক্ষে ফেরাউনের কবল থেকে নাজাতে মূসার শুকরিয়ার নিয়তে দু'দিন নফল ছিয়াম রাখা ব্যতীত আর সকল কর্মই বিদ'আত। অতএব এ উপলক্ষে শী'আ বা সুন্নীদের যেকোন অনুষ্ঠান বা খাদ্য ভক্ষণ সবই নাজায়েয *(দ্রঃ 'আশূরায়ে মুহাররম ও আমাদের করণীয়' পুস্তিকা)*।

প্রশ্ন (১৯/৩৭৯) : আমি ১৪ বছর বয়স থেকে মেয়েদের প্রতি আকর্ষণ হারিয়ে ছেলেদের প্রতি আকৃষ্ট হই। এখনো এই অবস্থা রয়েছে। আমি চাই স্বাভাবিক পুরুষের মতো বাঁচতে, কিন্তু পারছি না। কখনও আত্মহত্যার কথাও মনে হয়। আমি কিভাবে এই অবস্থা থেকে মুক্তি পাব?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, বগুড়া।

উত্তর : এটা একটি মানসিক রোগ। প্রথমেই এর জন্য চিকিৎসা গ্রহণ করতে হবে। বিশেষত হরমোনগত ত্রুটি আছে কি-না তা পরীক্ষা করে যথাযথ চিকিৎসা নিতে হবে।

এছাড়া আরো কিছু করণীয় রয়েছে। যেমন- (১) এটা জানা যে সমকামিতা যেনা অপেক্ষা মহাপাপ। খালেছভাবে তওবা করা এবং আল্লাহ্র কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা। দিনে বহুবার নিম্নের দো'আটি পাঠ করা যায়।- *আল্লা-হুম্মাগফির যানবী ওয়া তাহহির ক্বালবী ওয়া হাছছিন ফারজী* (হে আল্লাহ! তুমি আমার গুনাহ ক্ষমা কর, আমার হৃদয়কে পবিত্র কর এবং আমার লজ্জাস্থানকে হেফাযত কর)। রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এক যুবক যেনা করার অনুমতি চাইলে তিনি তাঁর জন্য এই দো'আ করেন *(আহমাদ, ছহীহাহ হা/৩৭০)*।

(২) প্রবৃত্তি ও শয়তানের প্রতারণা থেকে থেকে নিজেকে হেফাযত করা এবং আল্লাহ্র রহমত ও অনুগ্রহের প্রত্যাশা করা। আল্লাহ বলেন, 'হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজেদের ওপর সীমালঙ্ঘন করেছ, আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না' *(যুমার ৩৯/৫৩)*। (৩) পরিবেশ বদলানো ও সঙ্গ পরিবর্তন করা এবং এমন বন্ধুর সাহচর্যে থাকা, যারা আল্লাহকে ভয় করে। যার প্রতি আকর্ষণ হয় তার সাথে যোগাযোগ বন্ধ রাখা। গুনাহে প্ররোচক সামাজিক মিডিয়া বা ছবি সম্পূর্ণ বর্জন করা। (৪) সমাজকল্যাণমূলক কাজে নিজেকে যুক্ত করা : আল্লাহ্র প্রতি দাওয়াত দেয়া, দ্বীনী সংগঠনে যুক্ত থাকা, সমাজসেবা মূলক কাজ করা, কুরআন শিক্ষা, খেলাধুলা, শরীরচর্চা ইত্যাদিতে মনোযোগ দেয়া, যা খারাপ চিন্তা হ্রাস করে। (৫) দ্বীনদার মেয়েকে বিবাহ করা। এটা সমকামিতার মনোভাব থেকে বাঁচার একটা বড় মাধ্যম। স্ত্রীর সাথে বেশী বেশী একান্ত সময় কাটানো, যাতে অন্যায়ের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি না হয়। আশা করি উপরোক্ত নিয়মগুলো পালন করলে সমকামিতার মত নিকৃষ্ট হারাম প্রবণতা থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ।

প্রশ্ন (২০/৩৮০) : টাকা কুড়িয়ে পেলে খরচ করা জায়েয নয়। সেক্ষেত্রে অন্যের গাছের আম কুড়িয়ে পেলে খাওয়া জায়েয হবে কি?

-আশরাফুল ইসলাম, নাটোর।

উত্তর : কিছু শর্ত সাপেক্ষে গাছের নীচে পড়ে থাকা ফল গ্রহণ এবং খাওয়া জায়েয। যেমন- ১. যদি স্থানীয়ভাবে স্বীকৃতি থাকে, যেমন বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এটা স্বাভাবিকভাবে দেখা হয়। ২. বাগান মালিকের পক্ষ থেকে বাগান প্রাচীর দিয়ে সুরক্ষিত না থাকা। ৩. মালিক বা মালিকের পক্ষ থেকে বাগানের প্রহরার জন্য লোক উপস্থিত না থাকা। উল্লেখ্য যে, স্থানীয়ভাবে গাছের নীচে পড়ে থাকা ফল খাওয়া এবং বহন করার প্রচলন থাকলে খাওয়া এবং কুড়িয়ে বাড়ি নিয়ে যাওয়া উভয়টি জায়েয। আর স্থানীয়ভাবে অনুমতি না থাকলে কেবল খেতে পারবে কিন্তু বহন করে বাড়ি নিয়ে যেতে পারবে না *(ইবনু কুদামাহ, মুগনী ৯/৩৩২; উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ৬/৩৩৯)*। নবী করীম (ছাঃ)-কে গাছে ঝুলানো খেজুর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, যদি নিয়ে যাওয়ার জন্য আঁচলে না বেঁধে কেবল প্রয়োজন মিটানোর জন্য খায়, তবে তাতে কোন দোষ নেই' *(আবুদাউদ, নাসাঈ, বুলূগুল মারাম হা/১২৬৩ 'চুরির শাস্তি' অধ্যায়)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি কোন বাগানে প্রবেশ করে, সে যেন কেবল (ক্ষুধা নিবারনের উদ্দেশ্যে) খায়, যেন কিছু নিয়ে বাড়ি না যায় *(তিরমিযী হা/১২৮৭; মিশকাত হা/২৯৫৪, সনদ ছহীহ)*। তিনি আরো বলেন, যখন তুমি কোন (ফলপূর্ণ) বাগানের প্রাচীরঘেরা স্থানে পৌঁছাও, তখন বাগানের মালিককে তিনবার ডাকবে। যদি সে সাড়া দেয়, তাহ'লে তার অনুমতি নিয়ে খাবে। আর যদি সাড়া না দেয়, তাহ'লে (ক্ষুধা মেটানোর জন্য) খেতে পারে, তবে কিছু নষ্ট করা যাবে না *(ইবনু মাজাহ হা/২৩০০; ছহীহাহ হা/৩১২১)*।

প্রশ্ন (২১/৩৮১) : হতাশা-দুশ্চিন্তা থেকে পরিত্রাণের জন্য শরী'আতে কি কি নির্দেশনা দেয়া হয়েছে?

-আ'রাফ, মহাদেবপুর, নওগাঁ।

উত্তর : হতাশা-দুশ্চিন্তা থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্য নিম্নোক্ত আমলগুলো করা যেতে পারে। যেমন– ১. আল্লাহ্র উপর পূর্ণ ভরসা রাখা। আল্লাহ বলেন, যে আল্লাহ্র উপর ভরসা করে,

তাঁর জন্য তিনিই যথেষ্ট *(তালাক ৬৫/৩)*। ২. ছালাত ও ধৈর্যের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করা *(বাক্বারাহ ২/৪৫)*। ৩. আল্লাহ্র যিকির করা। আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্র যিকিরেই অন্তরসমূহ প্রশান্ত হয়' *(রা'দ ১৩/২৮)*। ৪. বিশেষ দো'আর মাধ্যমে শয়তানের ধোঁকা, প্ররোচনা, হতাশা থেকে বাঁচার চেষ্টা করা। রাসূল (ছাঃ) দো'আয় বলতেন, *আল্ল-হুম্মা ইন্নী আ'ঊযুবিকা মিনাল হাম্মে ওয়াল হাযানে, ওয়াল 'আজঝে ওয়াল কাসালে, ওয়াল জুব্‌নে ওয়াল বুখলে, ওয়া যালা'ইদ দায়নে ওয়া গালাবাতির রিজা-ল'* (হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকটে আশ্রয় প্রার্থনা করছি দুশ্চিন্তা ও দুঃখ-বেদনা হ'তে, অক্ষমতা ও অলসতা হ'তে, ভীরুতা ও কৃপণতা হ'তে এবং ঋণের বোঝা ও মানুষের যবরদস্তি হ'তে' *(বুখারী হা/২৮৯৩; মিশকাত হা/২৪৫৮)*। ৫. তাকদীরে দৃঢ় বিশ্বাস রাখা ও হতাশ না হওয়া। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমার প্রতি যা ঘটেছে, তা তোমার ভুলের জন্য ছিল না; আর যা তোমার ভুলের জন্য হয়েছে, তা তোমার ভাগ্যে ছিল না' *(আবূদাঊদ হা/৪৬৯৯; মিশকাত হা/১১৫, সনদ ছহীহ)*। ৬. তাহাজ্জুদের সময় ইস্তিগফার ও কেঁদে আল্লাহকে নিজ কষ্টের কথা বলা *(যারিআত ৫১/১৮)*। ৭. সৎ সঙ্গী ও ভালো পরিবেশ বেছে নেওয়া। কারণ সৎ ব্যক্তির সাহচর্য হতাশাকে দূর করে এবং ঈমানকে জাগ্রত করে। ৮. নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত ও আমল করা। কারণ আল্লাহ বলেন, 'কুরআন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে শিফা (আরোগ্য) ও রহমত বা দয়া' *(ইসরা ১৭/৮২)*। (৯) বেশী বেশী ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ করা *(নাহল ৯৭)*। উপরোক্ত আমলগুলো নিয়মিত করলে আশা করা যায় হতাশা দূর হবে ইনশাআল্লাহ।

প্রশ্ন (২২/৩৮২) : চাচাতো, মামাতো, খালাতো, ফুফাতো ভাই-বোনদের মধ্যে দেখা হারাম হ'লে তাদের সাথে আত্মীয়তা কিভাবে বজায় থাকবে? পর্দা মানতে গিয়ে যদি সম্পর্ক আন্তরিক না হয়, তবে কি গুনাহ হবে?

-আকবর আলী, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তর : পর্দার বিধান মেনেও প্রয়োজনীয় আলাপ ও আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা সম্ভব। তাদের সাথে শারঈ পর্দা বজায় রেখেই আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করতে হবে। স্মর্তব্য যে, সম্পর্কের পবিত্রতা বজায় রাখার জন্যই এ ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা নারীদের মাঝে প্রবেশ করা থেকে বিরত থাকো। একজন আনছার ছাহাবী জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! দেবর সম্পর্কে কি বলবেন? তিনি বললেন, 'দেবর তো মৃত্যু (সমতুল্য)! *(বুখারী হা/৫২৩২; মুসলিম হা/২১৭২)*। অর্থাৎ সম্পর্কের ঘনিষ্টতা থাকা সত্ত্বেও গায়ের মাহরাম হওয়ার কারণে দেবররা নারীর জন্য অধিক ফিৎনার কারণ হ'তে পারে। অতএব সতর্কতা বজায় রেখেই আত্মীয়তার সম্পর্ক রাখতে হবে।

প্রশ্ন (২৩/৩৮৩) : জনৈকা মহিলার স্বামী প্রবাসে থাকে। কয়েক বছর পর পর মাস খানেকের জন্য দেশে আসে। সেই সময়টাতে মহিলাটি ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ঔষধ খেয়ে স্রাব বন্ধ রাখে। এভাবে ঔষধ খেয়ে স্রাব বন্ধ রেখে স্বামী সংসর্গ জায়েয হবে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর : এসময় সহবাস জায়েয। তবে শুধুমাত্র সহবাসের উদ্দেশ্যে হায়েয বন্ধ করা উচিৎ নয়। কারণ এতে একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করা হয় এবং সন্তান ধারণেও বাধার সৃষ্টি করে। অতএব এমনটি না করাই উত্তম। তবে যদি কোন নারী হজ্জ বা রামাযান মাসে ছিয়াম রাখার জন্য হায়েয বিলম্বিত করতে চায় এবং এটি তার স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর না হয়, তবে অনেক আলেম এটি অনুমোদন করেছেন। যেমন শায়খ বিন বায (রহঃ) বলেন, 'যদি কোন নারী হায়েয বিলম্বিত করার জন্য ওষুধ গ্রহণ করে এবং এটি তার স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর না হয়, তবে এতে কোন সমস্যা নেই' *(বাহূতী, কাশশাফুল কেনা' ১/২১৮; মাজমূ' ফাতাওয়া ১৫/২৭৭)*।

প্রশ্ন (২৪/৩৮৪) : বিভিন্ন ধরনের কয়েন যেমন বিটকয়েন, ইথিরিয়াম, বিএনবি ইত্যাদি ট্রেডিং বা ফিউচার ট্রেডিং হালাল না হারাম।

-তাজমিলুর রহমান, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর।

উত্তর : 'বিটকয়েন' 'ইথিরিয়াম' 'বিএনবি' ইত্যাদি হ'ল ক্রিপ্টোকারেন্সি বা এক ধরনের সাংকেতিক মুদ্রা। এর নিজস্ব কোন মূল্যমান নেই। বাস্তব কোন রূপ নেই। এর অস্তিত্ব কেবল ইন্টারনেটে। এজন্য একে ডিজিটাল, ভার্চুয়াল বা অনলাইন কারেন্সিও বলা হয়। বর্তমানে বিটকয়েনের অনুরূপ বিভিন্ন নামে হাযারো সাংকেতিক মুদ্রার আবির্ভাব ঘটেছে। এর লেনদেনের জন্য কোন নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন হয় না। ফলে এর কোন আইনসঙ্গত ভিত্তি নেই, কোন জওয়াবদিহিতাও নেই। প্রকৃত মুদ্রার বৈশিষ্ট্যও এতে নেই। ফলে এই মুদ্রার লেনদেন পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে নিষিদ্ধ রয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, বিটকয়েন ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠলেও এর মূল্য প্রধানত ফটকামূলক লেনদেন থেকে প্রাপ্ত। ফলে আন্তর্জাতিক মুদ্রার বিপরীতে এর দর মারাত্মক ওঠানামা করে। যেহেতু গোটা বিষয়টি অজ্ঞাত, অনিশ্চয়তাপূর্ণ ও প্রতারণার ঝুঁকিপূর্ণ, অতএব এরূপ অনিয়মিত ও অপ্রকৃত মুদ্রার আদান-প্রদানে জড়িত হওয়া জায়েয নয়।

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) 'হাছা' ও 'গারার' ব্যবসা হ'তে নিষেধ করেছেন' *(আহমাদ হা/৭৪০৫; বায়হাক্বী হা/১০৩৯০, সনদ ছহীহ)*। 'হাছা' ব্যবসা বলতে যখন বিক্রেতা ক্রেতার কাছে কাপড় বিক্রির সময় বলে, 'আমি আপনার কাছে তা-ই বিক্রি করব যার উপর আমার ছোড়া পাথরটি পড়বে'। অথবা 'আমি আপনাকে সেই জমিই বিক্রি করব যার উপর আমার ছোড়া পাথরটি পড়বে'। অর্থাৎ কোন দ্রব্যটি বিক্রি করা হচ্ছে তা জ্ঞাত নয়। ফলে এটি নিষিদ্ধ। আর 'গারার' হ'ল যা অনিশ্চিত বা অনুমাননির্ভর। অর্থাৎ হ'তেও পারে, নাও হ'তে পারে। এতে প্রতারণার ঝুঁকি রয়েছে। যেমন পানির মাছ বিক্রি করা, গরুর বাঁটের দুধ বিক্রি করা কিংবা গর্ভবতী পশুর গর্ভে যা আছে তা বিক্রি করা ইত্যাদি।

সুতরাং ডিজিটাল কারেন্সির উৎস যেহেতু অজ্ঞাত এবং এতে

গারার বা অস্পষ্টতা রয়েছে, আর জুয়ারও সম্পর্ক রয়েছে, অতএব এর ক্রয়-বিক্রয় বৈধ নয়। সমকালীন বিভিন্ন সংস্থার ফৎওয়া বিভাগ ক্রিপ্টোকারেন্সিকে নাজায়েয বলেছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'হালাল স্পষ্ট, হারামও স্পষ্ট। এর মধ্যবর্তী বিষয়সমূহ অস্পষ্ট, যা অনেক মানুষ জানে না। অতএব যে ব্যক্তি সন্দিগ্ধ বস্তুসমূহ থেকে বেঁচে থাকবে, সে ব্যক্তি তার দ্বীন ও সম্মানকে পবিত্র রাখল। আর যে ব্যক্তি সন্দিগ্ধ কাজে লিপ্ত হ'ল, সে হারামে পতিত হ'ল' *(বুখারী হা/২০৫১; মুসলিম হা/১৫৯৯; মিশকাত হা/২৭৬২)*।

প্রশ্ন (২৫/৩৮৫) : সরকারী তদন্ত দলের সংশ্লিষ্ট সদস্যরা কোন প্রতিষ্ঠানের আর্থিক তদন্তে গিয়ে প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে আপ্যায়ন বা উপহার গ্রহণ করতে পারবেন কি?

**-রুবেল ইসলাম, ঢাকা।*
**[আরবীতে সুন্দর ইসলামী নাম রাখুন (স.স.)]*

উত্তর : মেহমান হিসাবে যেকোন আগন্তুক বা দায়িত্বশীলকে আপ্যায়ন করানো এবং তদন্ত কর্মকর্তাদের পক্ষে তা গ্রহণ করা জায়েয *(বুখারী হা/৬০১৮; মিশকাত হা/৪২৪৩)*। তবে হাদিয়া প্রদান এবং গ্রহণ দুটোই সংশয়যুক্ত। কারণ হাদিয়ার মাধ্যমে কর্মকর্তাদের অন্যায় কর্মে প্রভাবিত করার সম্ভাবনা রয়েছে। বরং এরূপ ক্ষেত্রে সেটা হাদিয়া নয় বরং ঘুষ হিসাবে গণ্য হবে যা সর্বাবস্থায় হারাম। রাসূল (ছাঃ) বলেন, আমরা যখন কাউকে সরকারি পদে নিযুক্ত করি, তখন তার জীবিকা (আহার) ব্যবস্থাও আমাদের দায়িত্বে থাকে। অতঃপর সে যদি এর অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করে, তবে তা হবে আত্মসাৎ' *(আবুদাউদ হা/২৯৪৩; ছহীহুত তারগীব হা/৭৭৯)*।

প্রশ্ন (২৬/৩৮৬) : জনৈক বাংলাদেশী ইয়ালামলাম পাহাড়ে হজ্জে তামাত্তু'র ইহরাম বেঁধে মক্কায় গিয়ে ওমরা সম্পাদন করেছেন। ওমরা শেষে তিনি মদীনায় গিয়েছেন। এক্ষণে প্রশ্ন হচ্ছে হজ্জের জন্য মক্কায় ফেরার পথে আবার ইহরাম বাঁধতে হবে কি?

-ওয়ালিউল্লাহ, বাঘা, রাজশাহী।

উত্তর : এ ব্যাপারে বিদ্বানগণের মাঝে মতপার্থক্য থাকলেও বিশুদ্ধ মত হচ্ছে পুনরায় ইহরাম বাঁধতে হবে না। কারণ ইহরাম অবস্থায় প্রয়োজনে মক্কার বাইয়ে গেলে পূর্বের ইহরাম বিনষ্ট হয় না। তবে কেউ আরেকটি ওমরা করার নিয়তে মক্কার বাইরে গেলে মক্কায় ফেরার পথে মীক্বাত থেকে ইহরাম বেঁধে ওমরা পালন করবে *(বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৭/৯৬; উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ২২/৭৮; ফাতাওয়া ইসলামিয়া ২/২০৮)*।

প্রশ্ন (২৭/৩৮৭) : আমার পিতা বাড়ি কেনার জন্য কিছু ঋণ নিয়েছেন ব্যাংক ও আত্মীয়দের কাছ থেকে। ব্যাংকের কিস্তি বেতনে কাটা হয়, আত্মীয়রা তাগাদা দেন না। পিতার হাতে এখন কিছু টাকা আছে, যা কুরবানীর নিছাব পরিমাণ। ঋণ থাকায় তিনি কুরবানী করতে চান না। তার ওপর কি কুরবানী ফরয?

-শাহরিয়ার রহমান, শেরপুর, বগুড়া।

উত্তর : কুরবানী করা সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ। আর ঋণ পরিশোধ করা ফরয। সেক্ষেত্রে ঋণ পরিশোধ অগ্রাধিকার পাবে। তবে বিলম্বে ঋণ পরিশোধের যদি সুযোগ থাকে এবং সেটা পরিশোধের অন্য উৎস বিদ্যমান থাকে, তাহ'লে কুরবানী দিতে পারেন। কারণ কুরবানী ইসলামের অন্যতম শে'আর বা নিদর্শন, যা বছরে মাত্র একবার করতে হয় *(উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ৮/৪৫৫; আল লিক্বাউশ শাহরী ৫৩/২৪)*।

প্রশ্ন (২৮/৩৮৮) : জুম'আর খুৎবায় ইমাম ছাহেব সবাইকে তালবিয়া পাঠ করিয়ে বলেন এটি পাঠে অনেক ছওয়াব রয়েছে। এটা সঠিক কি?

-আহসান হাবীব, বহরমপুর, রাজশাহী।

উত্তর : ইমাম খুৎবায় যেকোন বিষয়ে নছীহত করতে পারেন। হজ্জের ফযীলত বর্ণনা করার সময় তালবিয়া পাঠের ফযীলত বর্ণনা করতে পারেন। কিন্তু সেজন্য ফযীলত পাওয়ার আশায় এই তালবিয়া সব জায়গায় পাঠ করা যাবে না *(শাওকানী, নায়লুল আওতার ৪/৩৭৯)*।

প্রশ্ন (২৯/৩৮৯) : সান্ডা ও গুইসাপ খাওয়া জায়েয কি?

-শাহিদুল ইসলাম, কালিহাতী, টাংগাইল।

উত্তর : সান্ডা ও গুইসাপ এক জাতীয় প্রাণী নয়। সান্ডার আরবী প্রতি শব্দ *যব্ব*, যা তৃণভোজী এবং মরুভূমিতে বসবাস করে। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, খালিদ ইবনু ওয়ালিদ (রাঃ) তাঁকে বলেছেন, তিনি একবার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সঙ্গে উম্মুল মুমিনীন মায়মূনা (রাঃ)-এর ঘরে প্রবেশ করেন। তিনি ছিলেন খালিদ এবং ইবনু আব্বাস (রাঃ) দু'জনেরই খালা। তিনি সেখানে একটি ভুনা করা সান্ডা (ضَبٌّ) দেখতে পান। মায়মূনা (রাঃ) সান্ডাটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সামনে পরিবেশন করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তা খেতে গিয়ে হাত সরিয়ে নিলেন। এতে খালিদ (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সান্ডা কি হারাম? তিনি বললেন, না, তবে এটা আমার এলাকার খাবার ছিল না। তাই আমি এটিকে পসন্দ করি না। তখন খালিদ (রাঃ) বলেন, 'আমি সান্ডাটি টেনে নিয়ে খেলাম, আর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমার দিকে তাকিয়ে ছিলেন *(বুখারী হা/৫৩৯১; মিশকাত হা/৪১১১)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'সান্ডা আমি খাই না, তবে আমি তা হারামও বলি না *(বুখারী হা/৫৫৩৬)*। অতএব সান্ডা খাওয়া হালাল, তবে কেউ খেতে না চাইলে সেটি তার ব্যক্তিগত অপসন্দের রুচির ব্যাপার। তবে কেউ সান্ডার উপর ক্বিয়াস করে গুঁইসাপ খাওয়া জায়েয মনে করলে তা ভুল হবে। কারণ গুঁইসাপ সরিসৃপ প্রজাতির সর্বভোজী প্রাণী এবং এদের কিছু প্রজাতি আক্রমণাত্মক ও বিষধর। অতএব তা বর্জনীয়।

প্রশ্ন (৩০/৩৯০) : যুবক-যুবতী গোপনে বিবাহ করে গোপনেই তিন তালাক দিয়েছে। এক্ষণে তাদের বিবাহ বা তালাক গ্রহণযোগ্য হবে কি? যদি না হয় সেক্ষেত্রে তারা অলির অনুমতি সাপেক্ষে নতুনভাবে বিবাহ করতে পারবে কি?

-হাসান, ঢাকা।

উত্তর : প্রথমত যদি কোন যুবক-যুবতীর বিয়ে অলী ও দু'জন সাক্ষীর উপস্থিতিতে হয়ে থাকে, তাহ'লে সেই বিয়ে শারঈ

দৃষ্টিতে সঠিক এবং তাদের পরবর্তী তালাক শারঈ পন্থায় সংঘটিত হয়ে থাকলে তা কার্যকর হবে *(ছহীহুল জামে' হা/৭৫৫৭)*। **দ্বিতীয়ত** যদি বিয়েতে অলী ও সাক্ষী কিংবা কেবল অলী না থাকে, তাহ'লে বিয়েটি শরী'আতের দৃষ্টিতে বাতিল, ফলে তালাকেরও প্রশ্ন আসে না। **তৃতীয়ত** বিয়ে যদি রাষ্ট্রীয় কোন প্রতিনিধির মাধ্যমে যথাযথ পন্থায় হয়ে থাকে তাহ'লে তা শিবহে নিকাহ তথা বৈধ বিবাহের সাদৃশ্যপূর্ণ হিসাবে গণ্য হবে এবং তালাকের বিধান কার্যকর হবে। এক্ষণে প্রথম এবং তৃতীয় পন্থায় বিবাহ হয়ে থাকলে তা বৈধ বিবাহ হিসাবে গণ্য হবে। আর তিন মাসে তিন তালাক দিয়ে থাকলে তা কার্যকর হবে। এমতাবস্থায় তার সাথে সরাসরি বিবাহের সুযোগ নেই। আর দ্বিতীয় পন্থায় বিয়ে হয়ে থাকলে বা শরী'আত সম্মত পন্থায় এক বা দুই তালাক দিয়ে থাকলে এবং ইদ্দত অতিক্রম করলে বৈধ অলীর অনুমতি সাপেক্ষে নতুনভাবে বিবাহের মাধ্যমে সংসার করতে পারে *(ইবনুল ক্বাইয়িম, ই'লামুল মুআক্কিঈন ৪/৯০; উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ১২/৯৪)*।

প্রশ্ন (৩১/৩৯১) : অনেকে বলে থাকেন, মুহাররম মাসে বিবাহ-শাদী করা অশুভ ও বড় ক্ষতির কারণ। একথার সত্য কি?

-ফরীদা, বগুড়া।

উত্তর : মুহাররম মাসে বিবাহ-শাদীতে কোন ক্ষতি বা অশুভ লক্ষণ নেই। বরং শী'আ রাফেযীরা এই মাসে হুসাইন (রাঃ)-এর শাহাদত উপলক্ষে শোক প্রকাশার্থে বিবাহ-শাদী হারাম বা অপসন্দনীয় ঘোষণা করেছে। এটা সুস্পষ্ট অপসংস্কৃতি এবং সুন্নাহ বিরোধী ধারণা। যেমন জাহেলী যুগে শাওয়াল মাসে বিবাহ-শাদী করাকে অশুভ মনে করা হ'ত। হযরত আয়েশা (রাঃ) এই ধারণাকে খণ্ডন করেছেন এই মর্মে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে শাওয়াল মাসেই বিয়ে করেছেন এবং এ মাসেই আমার সাথে বাসর করেছেন। অথচ তাঁর অনুগ্রহ লাভে আমার চেয়ে অধিক সৌভাগ্যবতী স্ত্রী আর কে আছে? *(মুসলিম হা/১৪২৩; মিশকাত হা/৩১৪২; আল-বিদায়াহ ৩/২৫৩)*।

প্রশ্ন (৩২/৩৯২) : জনৈকা পাত্রী সব দিক দিয়ে ভালো। কিন্তু সে মূলত জারজ সন্তান। এরূপ নারীকে বিবাহ করা যাবে কি?

-আমীনুল ইসলাম, পটুয়াখালী।

উত্তর : জারজ নারীকে বিবাহ করা জায়েয। কারণ পিতা-মাতার পাপ সন্তানের উপর বর্তাবে না *(আন'আম ৬/১৬৪; ছহীহাহ হা/২১৮৬)*। এক্ষণে মেয়ে যদি তাক্বওয়াশীল হয়, তাহ'লে তাকে বিবাহ করায় কোন বাধা নেই *(ফাতাওয়া ইসলামিয়া ৩/১৬৬)*। উল্লেখ্য যে, অবৈধভাবে জন্ম নেওয়া নারীর অভিভাবক হবে তাক্বওয়াশীল স্থানীয় জনপ্রতিনিধি বা আদালত *(তিরমিযী হা/১১০২; মিশকাত হা/৩১৩১; ছহীহুল জামে' হা/২৭০৯)*।

প্রশ্ন (৩৩/৩৯৩) : প্রবাস থেকে মোবাইলে বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার পর কতদিন পর্যন্ত স্বামী স্ত্রী আলাদা থাকতে পারবে? তিনমাসের মধ্যে নির্জনবাস না হ'লে সম্পর্ক বাতিল হয়ে যাবে এরূপ কোন বিধান আছে কি?

-মুহাম্মাদ আরীফ, ঢাকা।

উত্তর : স্বামী-স্ত্রী যতদিন চাইবে ততদিনই বৈবাহিক সম্পর্ক বিদ্যমান থাকবে। কারণ বৈবাহিক সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য নির্জনবাস বা মিলন শর্ত নয় *(ইবনু কুদামাহ, মুগনী ৭/৩১১)*। উল্লেখ্য যে, কোন ব্যক্তির উচিৎ নয় দীর্ঘ দিন স্ত্রী-পরিবার হ'তে দূরে থাকা।

প্রশ্ন (৩৪/৩৯৪) : ঈদগাহ নির্মাণ কাজে যাকাতের টাকা ব্যবহার করা যাবে কি?

-ফাতেমা, মিরপুর, ঢাকা।

উত্তর : ঈদগাহ নির্মাণ কাজে যাকাতের টাকা ব্যবহার করা যাবে না। কারণ যাকাত বণ্টনের খাত নির্ধারিত। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যাকাতসমূহ কেবল (আট শ্রেণীর) লোকের জন্য। ফকীর, অভাবগ্রস্ত, যাকাত আদায়ের কর্মচারী, ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট ব্যক্তি, দাসমুক্তি, ঋণগ্রস্ত, আল্লাহ্র রাস্তায় এবং (দুস্থ) মুসাফিরদের জন্য। এটি আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে নির্ধারিত। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়' *(তওবা ৯/৬০)*। আর ঈদগাহ 'ফী সাবীলিল্লাহ' খাতের অন্তর্ভুক্ত নয় বরং এটি জনগণের দায়িত্ব। সুতরাং ঈদগাহ নির্মাণে যাকাতের টাকা দেওয়া যাবে না *(বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৪/২৯৪; আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়া ২৩/৩২৯)*।

প্রশ্ন (৩৫/৩৯৫) : দেশের বিভিন্ন এলাকায় দোকানে বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে সকাল-সন্ধ্যায় আগরবাতি জ্বালানোর প্রচলন রয়েছে। শারঈ দৃষ্টিকোন থেকে বিষয়টি বৈধ কি?

-মাযহারুল ইসলাম, মিরপুর, ঢাকা।

উত্তর : সাধারণভাবে এতে কোন দোষ নেই। কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্যে অধিক লাভ বা কল্যাণের উদ্দেশ্যে এরূপ আগরবাতি জ্বালালে তা অবশ্যই শিরক হবে। দোকান, বাড়ী বা নিজেকে সুগন্ধিময় রাখা উত্তম অভ্যাসের অন্তর্ভুক্ত। মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, দুনিয়ার তিনটি বস্তু রাসূল (ছাঃ)-এর পসন্দ ছিল। যার দু'টি তিনি পেয়েছিলেন, একটি পাননি। তিনি নারী ও সুগন্ধি লাভ করেছিলেন। কিন্তু খাদ্য অর্জন করতে পারেননি *(আহমাদ, মিশকাত হা/৫২৬০ 'রিক্বাক্ব' অধ্যায়, 'দারিদ্রের ফযীলত ও নবী করীম (ছাঃ)-এর জীবন যাপন' অনুচ্ছেদ)*। অন্য এক বর্ণনায় রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আমার নিকট পসন্দনীয় হচ্ছে সুগন্ধি, নারী ও ছালাত, যে ছালাতকে আমার চোখের জন্য শীতল করে দেওয়া হয়েছে *(নাসাঈ, মিশকাত হা/৫২৬১, সনদ হাসান)*।

প্রশ্ন (৩৬/৩৯৬) : আমি আমার স্বামীর দোষ-ত্রুটি সন্তানদের সামনে বা সন্তানদের দোষ-ত্রুটি স্বামীর সামনে আলোচনা করি। এগুলো কি গীবত হিসাবে গণ্য হবে?

-নাজমা বেগম, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তর : এগুলো যদি সংশোধনের উদ্দেশ্যে না হয়, তবে গীবত হিসাবে গণ্য হবে। বরং বাইরের কারো সমালোচনা অপেক্ষা আত্মীয়ের সমালোচনা বেশী গুনাহের কারণ হবে *(বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ৫/৪২১)*। আল্লাহ বলেন, তোমাদের কেউ যেন অন্যের গীবত না করে *(হুজুরাত ৪৯/ ১২)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, গীবত হচ্ছে, 'তুমি তোমার ভাই সম্পর্কে এমন কিছু বল, যা সে অপসন্দ করে। তখন ছাহাবীরা বললেন,

‘যদি সে কথাটি তার মধ্যে থাকে? রাসূল (ছাঃ) বললেন, যদি তার মধ্যে থাকে, তবে তুমি গীবত করেছ। আর যদি না থাকে, তবে তুমি অপবাদ দিয়েছ *(মুসলিম হা/২৫৮৯; মিশকাত হা/৪৮২৮)*। অতএব গীবতের সংজ্ঞায় আপনজন কিংবা পর, সবাই সমান। গীবত হ’ল, যে কারও অনুপস্থিতিতে এমন কিছু বলা, যা সে অপসন্দ করে।

প্রশ্ন (৩৭/৩৯৭) : জনৈক আলেম বলেন, পুরুষেরা কেবল আতর ব্যবহার করতে পারবে। তারা পারফিউম জাতীয় কিছু ব্যবহার করতে পারবে না। এটা সঠিক কি?

-নওশাদ আলী, তানোর, রাজশাহী।

উত্তর : উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। বরং কোন কিছু ব্যবহার জায়েয হওয়া নির্ভর করবে বস্তুটি হালাল নাকি হারাম। বস্তু যদি হালাল হয় তাহ’লে তা ব্যবহারে কোন দোষ নেই। তবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আতর ব্যবহার করতেন। তার অনুসরণ করে সরাসরি আতর ব্যবহার সুন্নাত এবং ছওয়াবের কাজ। এর অর্থ এই নয় যে অন্যান্য সুগন্ধি ব্যবহার করা যাবে না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, দুনিয়ার বস্তুসমূহের মধ্যে আমার কাছে প্রিয় করা হয়েছে নারী ও সুগন্ধি; আর আমার চোখের শীতলতা রাখা হয়েছে ছালাতে *(আহমাদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৫২৬১)*। জুম‘আর দিনেও তিনি সুগন্ধি ব্যবহার করতে উৎসাহিত করেছেন *(ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ হা/১৮১০)*। তবে এ্যালকোহল যুক্ত পারফিউমের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করাই উত্তম।

প্রশ্ন (৩৮/৩৯৮) : মসজিদে রক্তদান কর্মসূচী পালন করা যাবে কি?

-ছাবের, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : মসজিদ নির্মাণ করা হয় ইবাদতের জন্য। রাসূল (ছাঃ) বলেন, এই মসজিদগুলো এমন কিছু কাজের জন্য নির্মাণ করা হয়নি। যেমন পেশাব বা নাপাক কাজ। এগুলো শুধুই আল্লাহ্র যিকির, ছালাত এবং কুরআন তেলাওয়াতের জন্য নির্মাণ করা হয় *(মুসলিম হা/২৮৫)*। আর মানুষের রক্ত অপবিত্র যা মসজিদে পড়লে স্থান অপবিত্র হয়ে যাবে। সুতরাং রক্তদান কর্মসূচী জনকল্যাণমূলক হ’লেও তা মসজিদের বাইরে করতে হবে *(বাহূতী, কাশশাফুল কেনা‘ ২/৩৭০; শরহ মুখতাছারে খলীল ২/২৭৬)*।

প্রশ্ন (৩৯/৩৯৯) : কোন কোন দেশে কুরবানীর পশুর মাথায় গুলি করা হয় অতঃপর যবহ করা হয়। এই পদ্ধতি কি সুন্নাত সম্মত হচ্ছে?

-নূরুল ইসলাম, নাটোর।

উত্তর : পশুর প্রতি ইহসান করা ফরয। আর গুলি করে আহত করা তাকে কষ্ট দেওয়ার শামিল যা বৈধ নয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ে সদাচরণ ফরয করেছেন। সুতরাং তোমরা যখন যবহ করো তখন তা সুন্দরভাবে করো *(মুসলিম হা/১৯৫৫; মিশকাত হা/৪০৭৩)*। অতএব কুরবানীর পশুকে গুলি করে মাটিতে ফেলে দিয়ে যবহ করা শরী‘আতসম্মত নয়, যদি না বিশেষ প্রয়োজন থাকে। যেমন, পশু অতি হিংস্র যাকে নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না বা যবহকারীর জীবনের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে ইত্যাদি। সেক্ষেত্রে এমনভাবে গুলি করতে হবে যাতে পশু মারা না যায় এবং পূর্ণ যবহ করা সম্ভব হয় *(ইবনু কুদামাহ, মুগনী ৯/৩২২; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ২২/৪৫৫)*।

প্রশ্ন (৪০/৪০০) : মসজিদের মাইকে টিকাদান কর্মসূচীর ঘোষণা দেওয়া যাবে কি?

-নিযামুদ্দীন, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর : মসজিদে সমাজ কল্যাণমূলক যেকোন কাজের ঘোষণা দেওয়া যাবে। যেমন টিকাদান কর্মসূচী, দারসের ঘোষণা, মক্তবের শিক্ষার্থীদের আহ্বান, কারো সন্তান হারালে সেটি সন্ধানে ঘোষণা ইত্যাদি। তবে মসজিদে ব্যক্তি স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোন ঘোষণা দেওয়া যাবে না। যেমন হারানো বস্তু খোঁজা, ব্যবসায়িক কার্যক্রম, হজ্জ কাফেলার ঘোষণা ইত্যাদি *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৫/২৭০; উছায়মীন, লিক্বাউল বাবিল মাফতূহ ১০/১৫১; বিন বায, মাজমূ‘ ফাতাওয়া ৮/৪২৮)*।

আশূরায়ে মুহাররম : গুরুত্ব ও করণীয়

হিজরী সনের প্রথম মাস মুহাররমের ১০ম তারিখকে ‘আশূরা’ (يَوْمُ عَاشُورَاءَ) বলা হয়। এদিন আল্লাহ্র হুকুমে মিসরের অত্যাচারী সম্রাট ফেরাঊন সসৈন্যে নদীতে ডুবে মরেছিল এবং মূসা (আঃ) ও তাঁর সাথী বনু ইস্রাঈলগণ ফেরাঊনের কবল থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন। তাই আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে মূসা (আঃ) এদিন ছিয়াম রাখেন’ *(মুসলিম হা/১১৩০ (১২৮)*। সেকারণ এদিন নাজাতে মূসার শুকরিয়ার নিয়তে ছিয়াম রাখা মুস্তাহাব। যা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম নিয়মিতভাবে পালন করতেন।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, রামাযানের পর সর্বোত্তম ছিয়াম হ’ল মুহাররম মাসের ছিয়াম। অর্থাৎ আশূরার ছিয়াম’ *(মুসলিম হা/১১৬৩; মিশকাত হা/২০৩৯)*। তিনি বলেন, ‘আমি আল্লাহ্র নিকট আশা করি যে, আশূরার ছিয়াম বান্দার বিগত এক বছরের (ছগীরা) গোনাহ সমূহের কাফফারা হবে’ *(মুসলিম হা/১১৬২; মিশকাত হা/২০৪৪)*।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, লোকেরা বলল, ইহূদী-নাছারাগণ আশূরার দিনকে খুবই সম্মান দেয়। জবাবে রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘আগামী বছর ইনশাআল্লাহ আমরা ৯ই মুহাররম সহ ছিয়াম রাখব’। অন্য বর্ণনায় এসেছে, আগামীতে বেঁচে থাকলে আমি অবশ্যই ৯ই মুহাররম সহ ছিয়াম রাখব’। রাবী বলেন, কিন্তু পরের বছর মুহাররম মাস আসার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়ে যায়’ *(মুসলিম হা/১১৩৪)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, রাসূল (ছাঃ) আরও বলেন, ‘তোমরা আশূরার দিন ছিয়াম রাখ এবং ইহূদীদের খেলাফ কর। তোমরা আশূরার সাথে তার পূর্বের দিন অথবা পরের দিন ছিয়াম রাখ’ *(ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ হা/২০৯৫)*। আলবানী বলেন, হাদীছটি মওকূফ ছহীহ *(ঐ)*। তবে ৯ ও ১০ দু’দিন রাখাই উত্তম। কেননা রাসূল (ছাঃ) ৯ তারিখ ছিয়াম রাখতে চেয়েছিলেন।

'সূর্যাস্তের সাথে সাথেই ছায়েম ইফতার করবে' (বুখারী হা/১৯৫৪)। 'সর্বোত্তম আমল হ'ল আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা' (আবুদাউদ হা/৪২৬)।

সাহারী ও ইফতার সহ পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচী : জুলাই-আগস্ট ২০২৫ (ঢাকার জন্য)

খ্রিষ্টাব্দ	হিজরী	বঙ্গাব্দ	বার	ফজর	সূর্যোদয়	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
০১ জুলাই	০৫ মুহাররম	১৭ আষাঢ়	মঙ্গলবার	০৩:৪৭	০৫:১৫	১২:০২	০৩:২১	০৬:৫১	০৮:১৭
০৩ জুলাই	০৭ মুহাররম	১৯ আষাঢ়	বৃহস্পতি	০৩:৪৮	০৫:১৬	১২:০৩	০৩:২২	০৬:৫১	০৮:১৭
০৫ জুলাই	০৯ মুহাররম	২১ আষাঢ়	শনিবার	০৩:৪৯	০৫:১৬	১২:০৩	০৩:২২	০৬:৫১	০৮:১৭
০৭ জুলাই	১১ মুহাররম	২৩ আষাঢ়	সোমবার	০৩:৫০	০৫:১৭	১২:০৩	০৩:২৩	০৬:৫১	০৮:১৬
০৯ জুলাই	১৩ মুহাররম	২৫ আষাঢ়	বুধবার	০৩:৫১	০৫:১৮	১২:০৪	০৩:২৩	০৬:৫০	০৮:১৬
১১ জুলাই	১৫ মুহাররম	২৭ আষাঢ়	শুক্রবার	০৩:৫২	০৫:১৯	১২:০৪	০৩:২৪	০৬:৫০	০৮:১৫
১৩ জুলাই	১৭ মুহাররম	২৯ আষাঢ়	রবিবার	০৩:৫৪	০৫:২০	১২:০৪	০৩:২৫	০৬:৫০	০৮:১৫
১৫ জুলাই	১৯ মুহাররম	৩১ আষাঢ়	মঙ্গলবার	০৩:৫৫	০৫:২০	১২:০৪	০৩:২৫	০৬:৪৯	০৮:১৪
১৭ জুলাই	২১ মুহাররম	০২ শ্রাবণ	বৃহস্পতি	০৩:৫৬	০৫:২১	১২:০৫	০৩:২৬	০৬:৪৯	০৮:১৩
১৯ জুলাই	২৩ মুহাররম	০৪ শ্রাবণ	শনিবার	০৩:৫৭	০৫:২২	১২:০৫	০৩:২৬	০৬:৪৮	০৮:১২
২১ জুলাই	২৫ মুহাররম	০৬ শ্রাবণ	সোমবার	০৩:৫৮	০৫:২৩	১২:০৫	০৩:২৭	০৬:৪৭	০৮:১১
২৩ জুলাই	২৭ মুহাররম	০৮ শ্রাবণ	বুধবার	০৪:০০	০৫:২৪	১২:০৫	০৩:২৭	০৬:৪৭	০৮:১০
২৫ জুলাই	২৯ মুহাররম	১০ শ্রাবণ	শুক্রবার	০৪:০১	০৫:২৫	১২:০৫	০৩:২৮	০৬:৪৬	০৮:০৯
২৭ জুলাই	০১ ছফর	১২ শ্রাবণ	রবিবার	০৪:০২	০৫:২৬	১২:০৫	০৩:২৮	০৬:৪৫	০৮:০৮
২৯ জুলাই	০৩ ছফর	১৪ শ্রাবণ	মঙ্গলবার	০৪:০৪	০৫:২৭	১২:০৫	০৩:২৮	০৬:৪৪	০৮:০৬
৩১ জুলাই	০৫ ছফর	১৬ শ্রাবণ	বৃহস্পতি	০৪:০৫	০৫:২৮	১২:০৫	০৩:২৯	০৬:৪৩	০৮:০৫
০১ আগস্ট	০৬ ছফর	১৭ শ্রাবণ	শুক্রবার	০৪:০৫	০৫:২৮	১২:০৫	০৩:২৯	০৬:৪২	০৮:০৪
০৩ আগস্ট	০৮ ছফর	১৯ শ্রাবণ	রবিবার	০৪:০৭	০৫:২৯	১২:০৫	০৩:২৯	০৬:৪১	০৮:০২
০৫ আগস্ট	১০ ছফর	২১ শ্রাবণ	মঙ্গলবার	০৪:০৮	০৫:৩০	১২:০৪	০৩:২৯	০৬:৪০	০৮:০১
০৭ আগস্ট	১২ ছফর	২৩ শ্রাবণ	বৃহস্পতি	০৪:০৯	০৫:৩১	১২:০৪	০৩:২৯	০৬:৩৮	০৭:৫৯
০৯ আগস্ট	১৪ ছফর	২৫ শ্রাবণ	শনিবার	০৪:১০	০৫:৩২	১২:০৪	০৩:২৯	০৬:৩৭	০৭:৫৭
১১ আগস্ট	১৬ ছফর	২৭ শ্রাবণ	সোমবার	০৪:১২	০৫:৩৩	১২:০৪	০৩:২৯	০৬:৩৬	০৭:৫৫
১৩ আগস্ট	১৮ ছফর	২৯ শ্রাবণ	বুধবার	০৪:১৩	০৫:৩৩	১২:০৩	০৩:২৯	০৬:৩৪	০৭:৫৩
১৫ আগস্ট	২০ ছফর	৩১ শ্রাবণ	শুক্রবার	০৪:১৪	০৫:৩৪	১২:০৩	০৩:২৯	০৬:৩২	০৭:৫২

যেলা ভিত্তিক সময়সূচী [ঢাকার আগে (-) ও পরে (+)]

আরবী তারিখ চন্দ্র উদয়ের উপর নির্ভরশীল

ঢাকা বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
নরসিংদী	−২	−১	−১	−১	−১
গাযীপুর	−১	০	+১	+১	+১
শরীয়তপুর	+২	+১	−১	−১	−১
নারায়ণগঞ্জ	০	০	−১	+১	−১
টাঙ্গাইল	০	+২	+৩	+৩	+৩
কিশোরগঞ্জ	−৪	−১	০	০	০
মানিকগঞ্জ	+১	+২	+২	+২	+২
মুন্সিগঞ্জ	০	০	−১	−১	−১
রাজবাড়ী	+৩	+৩	+৩	+৫	+৩
মাদারীপুর	+২	+১	−১	০	−১
গোপালগঞ্জ	+৪	+৩	০	+১	০
ফরিদপুর	+৩	+৩	+২	+২	+২

ময়মনসিংহ বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
শেরপুর	−২	+২	+৫	+৪	+৫
ময়মনসিংহ	−৩	০	+৩	+২	+৩
জামালপুর	−২	+২	+৫	+৫	+৫
নেত্রকোণা	−৫	−১	+২	+১	+২

খুলনা বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
যশোর	+৬	+৫	+৩	+৪	+৩
সাতক্ষীরা	+৮	+৬	+৩	+৪	+২
মেহেরপুর	+৭	+৮	+৭	+৮	+৭
নড়াইল	+৫	+৪	+২	+৩	+২
চুয়াডাঙ্গা	+৭	+৭	+৬	+৬	+৬
কুষ্টিয়া	+৫	+৬	+৬	+৬	+৬
মাগুরা	+৫	+৪	+৩	+৪	+৩
খুলনা	+৬	+৪	+১	+২	+১
বাগেরহাট	+৬	+৩	০	+১	−১
ঝিনাইদহ	+৫	+৫	+৪	+৫	+৪

বরিশাল বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
ঝালকাঠি	+৪	+১	−২	−১	−৩
পটুয়াখালী	+৪	+১	−৩	−২	−৪
পিরোজপুর	−৬	−৩	−৬	০	−২
বরিশাল	+৩	+১	−৩	−২	−৩
ভোলা	+২	−১	−৪	−৩	−৪
বরগুনা	+৬	+২	−৩	−২	−৪

রাজশাহী বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
সিরাজগঞ্জ	+১	+৩	+৫	+৪	+৫
পাবনা	+৪	+৫	+৫	+৬	+৫
বগুড়া	+১	+৫	+৭	+৭	+৭
রাজশাহী	+৫	+৮	+৯	+৮	+৯
নাটোর	+৪	+৬	+৮	+৭	+৮
জয়পুরহাট	+১	+৬	+৯	+৯	+১০
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	+৬	+৯	+১১	+১১	+১১
নওগা	+৩	+৬	+৯	+৮	+৯

রংপুর বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
পঞ্চগড়	−১	+৮	+১৪	+১৩	+১৫
দিনাজপুর	+১	+৭	+১২	+১১	+১৩
লালমণিরহাট	−৩	+৪	+১০	+৯	+১০
নীলফামারী	−১	+৭	+১২	+১১	+১৩
গাইবান্ধা	−১	+৪	+৮	+৭	+৮
ঠাকুরগাঁও	+১	+৮	+১৪	+১৩	+১৫
রংপুর	−২	+৫	+১০	+৯	+১১
কুড়িগ্রাম	−৩	+৩	+৯	+৭	+৯

চট্টগ্রাম বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
কুমিল্লা	−২	−৩	−৪	−৩	−৪
ফেনী	−২	−৪	−৬	−৫	−৬
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	−৪	−২	−২	−২	−২
রাঙ্গামাটি	−৪	−৭	−১০	−৯	−১০
নোয়াখালী	০	−২	−৫	−৪	−৫
চাঁদপুর	+১	০	−২	−২	−৩
লক্ষ্মীপুর	+১	−১	−৪	−৩	−৪
চট্টগ্রাম	−২	−৫	−৯	−৮	−১০
কক্সবাজার	০	−৬	−১৩	−১০	−১৩
খাগড়াছড়ি	−৪	−৬	−৮	−৯	−৮
বান্দরবান	−৩	−৭	−১১	−১০	−১২

সিলেট বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
সিলেট	−৯	−৫	−৩	−৩	−২
মৌলভীবাযার	−৮	−৫	−৩	−৪	−৩
হবিগঞ্জ	−৬	−৪	−২	−২	−২
সুনামগঞ্জ	−৮	−৪	০	−১	০

সূত্র: বাংলাদেশ আবহাওয়া বিভাগ (www.bmd.gov.bd), মুসলিম প্রো (www.muslimpro.com), গণনা পদ্ধতি : University of Islamic Sciences, Karachi.

ছালাতের সময় নির্ধারণী স্থায়ী ক্যালেণ্ডার
(সাহারী ও ইফতার সহ)

বৈশিষ্ট্যসমূহ

- আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত নীতিমালা এবং বাংলাদেশ আবহাওয়া বিভাগ ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক ইসলামী সংস্থাগুলির প্রদত্ত ঢাকাসহ সকল যেলাসমূহের সময়সূচী অনুযায়ী প্রস্তুতকৃত।
- প্রত্যেক যেলার জন্য পৃথক পৃথকভাবে প্রণীত। ফলে ঢাকার সময়ের সাথে যোগ-বিয়োগ করার প্রয়োজন হবে না এবং সময়সূচী আরও সূক্ষ্ম ও সঠিকভাবে জানা যাবে।
- সারা বছরের সাহারী ও ইফতারের সময়সূচী জানা যাবে।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী, মোবাইল : ০১৭৭০-৮০০৯০০

Reg. No. Raj-164, Monthly At-Tahreek, Vol. 28, Issue 10, July 2025